৩য় অধ্যায়ঃ ব্যক্তিগতভাবে করণীয় ফরজসমূহ

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন আদর্শ। ইসলামের কিছু বিষয়াদি হলো আন্তরিক ও আদর্শিক, যা অন্তরে লালন করতে হয় এবং আদর্শ হিসেবে জীবন ভর পালন করতে হয়। ইসলামী রীতিনীতিতে এসব বিষয়াদিকে আমাদের ঈমানের অংশ হিসেবে দেখা হয়। ইসলামে এগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম। কারণঃ কোনো মুসলিম যদি এসব বিষয়াদির কোনো একটি থেকেও বিচ্যুত হয়ে যায় তবে সে আর মুঅমিন থাকতে পারে না বরং তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে যায় আর সে হয়ে যায় আদর্শচ্যুত মুনাফিক।

অন্যদিকে ইসলাম গ্রহণ করার পর মুসলিম হিসেবে আমাদের জন্য বেশকিছু করণীয় নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে, এ সব করণীয়সমূহকে বলা হয় আ'মাল। আ'মালের আবার কয়েকটি ক্ষেত্র রয়েছে। কিছু আ'মাল আমাদের ব্যক্তি জীবনের সাথে সম্পর্কিত আর কিছু আ'মাল আমাদের পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, জাতীয় জীবন এবং আন্তর্জাতিক জীবনের সাথে সম্পৃক্ত। কিছু আ'মাল আবার আমাদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় ভাবে পালনীয় আর কিছু ঐচ্ছিক।

একজন মুসলিম হিসেহে ব্যক্তিগতভাবে আমাদের জন্য যেসব অত্যাবশ্যকীয় করণীয় রয়েছে এসব নিয়েই আমাদের এ অধ্যায়কে সাজানো হয়েছে। বুঝার সুবিধার্থে এ অধ্যায়টিকে আমরা কয়েকটি অনুচ্ছেদে বিন্যস্ত করেছি। যেমন..

অনুচ্ছেদঃ ১. শাহাদাৎ বা সাক্ষ্য দান
অনুচ্ছেদঃ ২. বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামী বিধিবিধান মেনে চলাকে নিজের উপর অবধারিত করে নেওয়া
অনুচ্ছেদঃ ৩. ইসলাম মানতে গিয়ে হানীফ পদ্ধতি অবলম্বন করা
অনুচ্ছেদঃ ৪. বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সকল বিষয়ে শুধুমাত্র আল্লাহর বিধান মেনে চলা
অনুচ্ছেদঃ ৫. আ'মাল ও ইবাদাতকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করা
অনুচ্ছেদঃ ৬. দ্বীন পালনে (ঈমান, আ'মাল ও নিয়তের বেলায়) ভেজালমুক্ত থাকা
অনুচ্ছেদঃ ৭. রামাদ্বান মাসে সাওম পালন বা সিয়াম সাধন
অনুচ্ছেদঃ ৮. ওয়াদা ও অঙ্গীকার পূর্ণ করা
অনুচ্ছেদঃ ৯. কাফফারাহ ফরজ হলে যথাযথভাবে আদায় করা
অনুচ্ছেদঃ ১০. বিয়ের মোহর আদায় করা
অনুচ্ছেদঃ ১১. অধীনস্তদের প্রতি ন্যায়সঙ্গতভাবে দায়িত্ব পালন করা
অনুচ্ছেদঃ ১২. তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর ইদ্দত পালন করা তথা অন্যত্র বিয়ের আগে অপেক্ষাকাল পূর্ন করা
অনুচ্ছেদঃ ১৩. স্বামী মারা গেলে স্ত্রীর ইদ্দত পালন করা তথা অন্যত্র বিয়ের আগে অপেক্ষাকাল পূর্ন করা
অনুচ্ছেদঃ ১৪. আত্মীয়তা রক্ষা করা
অনুচ্ছেদঃ ১৫. যৌনাঙ্গের হেফাজত করা
অনুচ্ছেদঃ ১৬. সতর ঢেকে রাখা
অনুচ্ছেদঃ ১৭. হিজাব করা
অনুচ্ছেদঃ ১৮. প্রয়োজনের সময় পবিত্রতা অর্জন করা
অনুচ্ছেদঃ ১৯. প্রয়োজনের সময় অযু করা
অনুচ্ছেদঃ ২০. প্রয়োজন হলে গোসল
অনুচ্ছেদঃ ২১. অযু গোসলে সক্ষম না হলে তায়াম্মুম করা
অনুচ্ছেদঃ ২২. নাজাসাত থেকে পবিত্র থাকা
অনুচ্ছেদঃ ২৩. হাইদ্ব ও নিফাসের বিধিবিধান মেনে চলা

অনুচ্ছেদঃ ১. শাহাদাহ

সবার জন্য ব্যক্তিগতভাবে করণীয় অন্যতম প্রধান ফরজ কাজ হচ্ছে শাহাদাহ বা সাক্ষ্য দান। শাহাদাহ অর্থ সাক্ষ্য দেওয়া। ইসলাম গ্রহণ করতে হলে সর্ব প্রথম দুটি মৌলিক ঘোষণা দিতে হয়, ইসলামী পরিভাষায় এ ঘোষণা দুটিকে বলা হয় শাহাদাহ বা সাক্ষ্য দান। এর মাঝে..

১ম সাক্ষ্যটি হলঃ "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" (আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। মানে বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে ও সকল বিষয়ে এক আল্লাহর প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে নেওয়া, মেনে চলা, প্রতিষ্ঠিত করা এবং আল্লাহর বিধান মেনে চলাকে নিজের উপর অবধারিত করে নেওয়া)

২য় সাক্ষ্যটি হলঃ "মুহাম্মাদ আবদুহু ওয়া রাসূলুহু" (মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল, মানে মুহাম্মাদ সা.কে আল্লাহর প্রেরিত প্রতিনিধি হিসেবে মেনে নেওয়া এবং সামাজিক, রাজনৈতিকসহ জীবনের সকল বিষয়ে মুহাম্মাদ সা.র আনুগত্য ও অনুকরনকে একমাত্র আদর্শ হিসেবে মেনে নেওয়া ও মেনে চলা)

১ম সাক্ষ্যটি আদম আ. থেকে মুহাম্মাদ সা. পর্যন্ত সকল নবী, রাসূল এবং সকল উম্মতকে একইভাবে দিতে হয়েছে। আর ২য় সাক্ষ্যটি সকল রাসূলের সময় পরিবর্তিত হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে..

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ۚ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (18)

আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেনঃ নেই কোনো ইলাহ আল্লাহ ছাড়া, ফিরিস্তাগণ এবং জ্ঞান সম্পন্ন লোকেরাও ন্যায়ের উপর অবিচল থেকে (একই সাক্ষ্য দিচ্ছেন) "নেই কোনো ইলাহ আল্লাহ ছাড়া" তিনি মহাপরাক্রমশালী, আল-হা'কীম (হুকুমের মালিক, বিচার ও শাসনের মালিক, আইন প্রনয়ন ও নীতিনির্ধারনের একমাত্র মালিক, মহাকৌশলী।) (৩ আ-ল ই'মরানঃ ১৮)

হাদীছে বর্নিত হয়েছে..

عن ابن عمر رضي الله عنهما **أن رسول الله ﷺقال :بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده، ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان** .متفق عليه.

ইবনু উ'মার রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেনঃ ৫টি বিষয়ের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে।

- (এই মর্মে) সাক্ষ্য দেওয়া যে "আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল"
- সালাত কায়েম করা
- যাকাত আদায় করা
- বাইতুল্লাহর হাজ্জ করা
- রামাদ্বানে সিয়াম সাধন করা (বুখারী ও মুসলিম)

বিঃ দ্রঃ = শাহাদাহ হল ইসলামের প্রবেশ দ্বার। ইসলামে প্রবেশকালে সর্ব প্রথম শাহাদাহ দিতে হয় এবং এটা দিতে হয় মুখ ও অন্তরের সমন্বয়ে, শুধু মুখের কথায় শাহাদাহ পূর্ণ হয় না। মুনাফিকুনের ১ম আয়াতে মহান আল্লাহ তায়া'লা বলেছেন..

إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ (1)

(হে নবী!) মুনাফিকরা যখন তোমার কাছে আসে তখন বলেঃ "আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি আল্লাহর রাসূল" আল্লাহও জানেন যে তুমি তাঁর রাসূল। তবে আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যুক। (কারণঃ সাক্ষ্যটি তারা শুধু মুখ দিয়ে দেয়, অন্তর দিয়ে নয়। মুনাফিকূনঃ ১) তবে শাহাদাহ হিসেবে আমরা যে দুটি সাক্ষ্য দিয়ে থাকি এ দুটি সাক্ষ্যে ব্যবহৃত শব্দগুলো এভাবে একত্রে সাজিয়ে আল-কুরআনে উল্লেখ করা হয়নি। যদিও এর শব্দগুলো কুরআনের নানা জায়গায় ছড়িয়ে রয়েছে। তবে সালাতের শেষ ভাগে আমরা যে তাশাহহুদ (আত্তাহিয়্যাতু...) পাঠ করি এর শেষ অংশে দুটি শাহাদাহই স্পষ্ট করে বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদঃ ২. বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর দ্বীন মেনে চলা

ইসলাম গ্রহণের পর আমাদের জন্য পরবর্তী ফরজ হলো বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সকল বিষয়ে ইসলামী বিধিবিধানকে নৈতিকভাবে মেনে নেওয়া এবং বাস্তবে মেনে চলা।

ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, জাতীয় জীবন ও আন্তর্জাতিক জীবন তথা মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং প্রতিটি বিষয়েই আল্লাহর দ্বীন মেনে নেওয়া এবং মেনে চলা আমাদের ফরজ দায়িত্ব। কিন্তু..

- বর্তমান বিশ্বে সামাজিক, রাজনৈতিক ও জাতীয়ভাগে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত না থাকার কারণে
- যুগ যুগ ধরে এ অবস্থা চলমান থাকার কারণে
- সমাজে সামাজিক ও আদর্শিকভাবে স্যাকুলারিজম প্রতিষ্ঠিত থাকার কারনে

আমরা শুধু ব্যক্তি জীবনের কয়েকটি বিষয়ের সাথে ইসলামকে আবদ্ধ করে ফেলেছি এবং এটাকেই দ্বীন পালন মনে করে নিজেকে একজন মুসলিম হিসেবে জান্নাতের অধিকারী ভেবে আত্ম প্রতারনায় মেতে আছি।

এখন ইচ্ছা করলেও এ অবস্থা থেকে বের হতে পারছি না এবং পরিপূর্ণভাবে ইসলামী বিধিবিধান মেনে চলতে পারছি না। তাই এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য আমাদেরকে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে, সংগ্রাম করতে হবে। আর এটাও আমাদের একটা ফরজ দায়িত্ব।

আসলে ইসলাম তথাকথিত কোনো ধর্ম নয়। ইসলাম হলো পরিপূর্ণ জীবন আদর্শ। ইসলাম সর্বকালীন এবং সার্বজনীন। বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সকল বিষয়েই মূলনীতি ও বিধিবিধান ঠিক করে দিয়েছে ইসলাম।

ইসলামে যেমন ধর্ম এবং ধর্মীয় বিষয়াদি রয়েছে, তেমনি রয়েছে সমাজনীতি, অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও ব্যাংকিং নীতিমালা, শিক্ষানীতি, প্রতিরক্ষানীতি, যুদ্ধনীতি বা সমরনীতি, দেশ জাতি ও সমাজ গঠন এবং পরিচালনার নীতিমালা, আইন বিচার ও শাসন, চুক্তি ও শপথের নীতিমালা, শ্রমনীতি, প্রবাসনীতি, শরণার্থীনীতি, ইত্যাদি সবকিছু। তাই..

- আল্লাহ আদেশ করেছেন যেন আমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করি অর্থাৎ বাস্তব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং প্রতিটি বিষয়ে ইসলামী বিধিবিধান ও রীতিনীতি নৈতিকভাবে মেনে নেই এবং বাস্তবে মেনে চলি। (দেখুন বাক্বারাহঃ ২০৮)
- আমরা যেন মানবরচিত ও মনগড়া সবকিছুকে বিসর্জন দিয়ে বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সকল বিষয়ে শুধুই ইসলামী বিধান ও রীতিনীতি মেনে নেই ও মেনে চলি। (দেখুন সূরাহ নাহ'লঃ ১২৩)
- বাস্তব জীবনের যে কোনো ক্ষেত্রে বা যে কোনো বিষয়ে মেনে চলার জন্য ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দর্শন, মতাদর্শ, মতবাদ, নীতিমালা বা আদর্শের অনুসন্ধানকেও চরম অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করেছে আল-কুরআন। (দেখুন সূরাহ আ-ল ই'মরানঃ ৮৫)

- আল্লাহর বিধানের বিপরীতে মানব রচিত ও মনগড়া কোনোকিছুর অনুকরণকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন স্বয়ং রাব্বু-ল-আ'লামীন। (দেখুন সূরাহ মা-ইদাহঃ ৭৭)
- বাস্তব জীবনে ইসলাম আর কুফরকে একত্রে মিশ্রিত করতেও নিষেধ করে দিয়েছে আল-কুরআন। (দেখুন সূরাহ বাক্বারাহঃ ৪২)
- যে বা যারা তাদের বাস্তব জীবনে আল্লাহ প্রদত্ব বিধানের সাথে অন্যকিছু মিশ্রিত করে ফেলবে তাদের ব্যাপারে কঠিন হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন মহান আল্লাহ্। (দেখুন বাক্বারাহঃ ৮৫)

সুতরাং ইসলাম গ্রহণের পর যে ব্যক্তি তার জীবনের কিছু বিষয়ে ইসলাম আর কিছু বিষয়ে অন্য নীতি আদর্শ, অন্য কোনো মতবাদ বা দর্শন মেনে নিবে বা মেনে চলবে তার ইসলাম গ্রহণ মূল্যহীন হয়ে যাবে এবং সে হয়ে যাবে চির জাহান্নামী মুনাফিক।

আমাদের মনে রাখতে হবে ইসলাম গ্রহণের পর প্রতিটি মুসলিমের উপর কিছু দায়দায়িত্ব এসে যায় যা অত্যাবশ্যকীয়ভাবে পালন করতে হয় এবং পালন করাকে নিজের উপর অবধারিত করে নিতে হয়। আর এ সবের মাঝে অন্যতম হল..

- ইসলাম সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করা
- বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সকল বিষয়ে আল্লাহর বিধান মেনে নেওয়া ও মেনে চলা
- অন্যের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়া
- আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন কায়েমে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা।

অনুচ্ছেদঃ ৩. সঠিক পদ্ধতিতে তথা হানীফ পদ্ধতিতে একনিষ্ঠভাবে দ্বীন পালন করা

আমাদের দ্বীন তথা জীবন আদর্শ যেমন আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত, ঠিক তেমনিভাবে দ্বীন পালনের পদ্ধতিও আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত। আল্লাহর নির্ধারিত পদ্ধতি ছাড়া অন্যকোনো তরিকা বা পদ্ধতিতে দ্বীন পালন করা হলে এটা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না।

আল্লাহর দ্বীন পালনের একমাত্র সঠিক পদ্ধতির নাম "হানীফ পদ্ধতি"। তাই আমাদের উপর আরো একটি ফরজ হচ্ছে সঠিক পদ্ধতিতে দ্বীন পালন করা আর মহান আল্লাহ মনোনিত দ্বীন পালনের একমাত্র সঠিক পদ্ধতির নাম "হানীফ পদ্ধতি"। সুতরাং বাস্তব জীবনে আল্লাহর দ্বীন পালন করতে গিয়ে শুধুই "হানীফ পদ্ধতি" অবলম্বন করতে হবে। এটাই আমাদের প্রতি আল্লাহর আদেশ। মুহাম্মাদ সা.কে আদেশ দিয়ে আল-কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে..

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (123)

(হে নবী!) অতঃপর আমি তোমার কাছে ওহী পাঠিয়েছি (এবং এ ওহীর মাধ্যমে অন্যান্য নবীদের মত তোমাকে আদেশ দিচ্ছি) তুমিও "হানীফ পদ্ধতিতে" ইবরাহীমের আদর্শ অনুকরণ করবে আর (শোনো!) সে মুশরিকদের দলভুক্ত ছিল না। (১৬ নাহ'লঃ ১২৩)

অন্যত্র বলা হচ্ছে

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا (125)

তার চেয়ে উত্তম দ্বীনদার আর কে হতে পারবে? যে ব্যক্তি..

- আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করল,
- ইহসান (তথা নিজের ঈমান, ইসলাম, ইবাদাত, কাজকর্ম, আচার-ব্যবহার এবং কথা-বার্তাকে সুন্দর) করল
- আর হানীফ পদ্ধতিতে ইবরাহীমী আদর্শের অনুকরণ করল? (কারণ ইবরাহীম ছিল উত্তম আদর্শের অধিকারী। তাই) আল্লাহ ইবরাহীমকে খালীল বানিয়েছেন। (৪ নিসাঃ ১২৫)

উল্লেখ্য আল্লাহর দ্বীনই হলো মানব জাতির জন্য একমাত্র সঠিক দ্বীন তথা সঠিক জীবন আদর্শ। আল্লাহর দ্বীন ছাড়া অন্য সকল দর্শন, আদর্শ, মতবাদ, নীতিমালা ও বিধানকে বিসর্জন দিয়ে জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সকল বিষয়ে শুধুমাত্র ইসলামী রীতিনীতি ও বিধিবিধান মেনে নেওয়ার ও মেনে চলার নাম হানীফ পদ্ধতিতে দ্বীন পালন করা। আর এটাই আমাদের উপর ফরজ করা হয়েছে।

সুতরাং যে বা যারা ইসলামের সাথে অন্যকোনো দর্শন, আদর্শ, মতবাদ, নীতিমালা ও বিধানকে সংযুক্ত করে মিশ্রিত জীবন যাপন করল, যারা ইসলাম ও কুফরের সমন্বয়ে জীবনের নতুন পথ বানিয়ে নিল তারা অবশ্যই বিভ্রান্ত হয়ে গেল। ইরশাদ হচ্ছে..

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا (150) أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا (151)

যারা আল্লাহ ও রাসূলের সাথে কুফর করল (তথা আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্য হয়ে গেল,)

- যারা আল্লাহ ও রাসূলের মাঝে বিভাজন তৈরি করল (তথা রাসূলের হাদীছকে আল্লাহর কিতাবের বিপরীতে দাঁড় করাল অথবা কুরআন মানল তবে হাদীছ মানল না)

- যারা বলল (ইসলামী আইনের) কিছু মানি আর কিছু মানি না
- যারা ঈমান ও কুফরের সমন্বয়ে নতুন পথ বানিয়ে নিল,

এরা হল আসল কাফির। এসব কাফিরদের তরে তৈরি করেছি (জাহান্নামে) যন্ত্রণাদায়ক আযাব। (৪ নিসাঃ ১৫০-১৫১)

ঈমান ও আক্বীদাহঃ মুঅমিন হতে হলে পরিপূর্ণভাবে ইসলাম মেনে চলতে হয়। বাস্তব জীবনের কিছু ক্ষেত্রে ইসলাম আর কিছু ক্ষেত্রে অন্যথা করলে মুঅমিন হওয়া যায় না। ইসলামের সাথে অন্য নীতি, আদর্শ, দর্শন, মতবাদ, ধর্ম বা সংস্কৃতি মিশ্রিত করে সমন্বিত নতুন পথ তৈরী করা কুফর, ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। কোনো মুসলিম এমন করলে সে মুনাফিক হয়ে যায়। মুনাফিক চির জাহান্নামী। মুনাফিক জাহান্নামের নিম্নতম গহ্বরে পতিত হবে। মুনাফিক মারা গেলে তাদের জানাযা পড়া বা তাদের জন্য দোয়া করাও নিষিদ্ধ। (দেখুন সূরাহ তাওবাহঃ ৮৪) মুনাফিকের জন্য শাফায়া'ত করতেও কাউকে অনুমতি দেয়া হবে না। (মুসলিম ৩ প্রকার মুঅমিন, ফাসিক ও মুনাফিক। দেখুন বাকারাহঃ ৭)

অনুচ্ছেদঃ ৪. এক আল্লাহর ইবাদাত করা

আমাদের উপর অন্যতম আরো একটি ফরজ দায়িত্ব হলো শুধুমাত্র এক আল্লাহর ইবাদাত করা তথা বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে ও সকল বিষয়ে শুধুমাত্র মহান আল্লাহ প্রদত্ব নীতি-আদর্শ ও বিধিবিধান মেনে নেওয়া ও মেনে চলা। প্রতিটি জিন্ন ও ইনসানের উপর এটা ফরজ। সবাই তার ব্যক্তি জীবন থেকে আন্তর্জাতিক জীবন পর্যন্ত বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সকল বিষয়ে শুধুই আল্লাহর ইবাদাত করবে। ইরশাদ হচ্ছে..

আমি জিন্ন ও ইনসান সৃষ্টি করেছি শুধুই আমার ইবাদাতের জন্য (৫১ যারিয়াতঃ ৫৬)	وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

ইবাদাত পরিচিতিঃ ইবাদাত অর্থ দাসত্ব করা, উপাসনা করা। এক আল্লাহর ইবাদাত করতে হলে প্রথমে..

- আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয় (আর ইসলামী পরিভাষায় একে বলা হয় ইসলাম গ্রহণ)
- তারপর ঈমান আনতে হয় আর ঈমানের দুটি দিক রয়েছে। যথা..
  ১. আল্লাহ থেকে আগত যাবতীয় তথ্যের উপর অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস রাখা এবং এর বিপরীতে কোনোকিছু বিশ্বাস না করা।
  ২. আল্লাহ থেকে আগত সকল বিধিবিধানকে নোইতিক ও আদর্শিকভাবে মেনে নেওয়া এবং এর বিপরীতে কোনোকিছু না মানা। (আর ইসলামী পরিভাষায় একে বলা হয় ঈমান)
- বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে ও সকল বিষয়ে আল্লাহ প্রদত্ব বিধিবিধান মেনে চলা। (ইসলামী পরিভাষায় এর নাম আ'মাল বা কর্ম)

অর্থাৎ মহান আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করার পর এক আল্লাহর প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে নিয়ে তথা পরিপূর্ণভাবে ঈমান গ্রহণ করে বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সকল বিষয়ে মহান আল্লাহর দেওয়া রীতিনীতি ও বিধিবিধান মেনে নেওয়ার ও মেনে চলার নাম আল্লাহর ইবাদাত করা। ইসলাম আল্লাহর মনোনীত দ্বীন একমাত্র জীবন আদর্শ। সুতরাং আল্লাহর ইবাদাত করতে হলে বাস্তব জীবনে ইসলামী আদর্শ ও বিধান মেনে চলতে হবে।

ই'বাদাত হবে শুধুই আল্লাহর। আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদাত করলে শিরক হয়। আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে বা অন্য কিছুকে অংশীদার বানালেও শিরক হয়। আল্লাহর বিধানের বিপরীতে অন্যের দাসত্ব মেনে নিলেও শিরক হয়। আল্লাহর কোনো বৈশিষ্ট্যে অন্যকে বিশেষিত করলেও শিরক হয়। ইরশাদ হচ্ছে..

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

(হে মানুষ ও জিন্ন জাতি!) তোমরা ই'বাদাত করবে শুধুই আল্লাহর, অন্যকাউকে /অন্যকিছুকে আল্লাহর শরীক বানাবে না। আর বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন, নিকটতম প্রতিবেশী, পার্শ্ববর্তি প্রতিবেশী, পার্শ্ববর্তি সঙ্গী (সফর সঙ্গী /জীবন সঙ্গী) পথিক এবং অধীনস্থ সকলের সাথে উত্তম ব্যবহার করবে। (তোমরা দম্ভ করবে না। কারণ) কোনো অহংকারী দাম্ভিককে আল্লাহ পছন্দ করেন না। (৪ নিসা ৩৬)

ঈমান ও আক্বীদাহঃ আল্লাহর বিধানের বিপরীতে অন্যের দাসত্ব বা আনুগত্য করা শিরকের শামিল। শিরক ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। শিরক করলে ঈমান নষ্ট হয়ে সকল আ'মাল বরবাদ হয়ে যায়।

শিরক পরিচিতিঃ শিরক অর্থ শরীক করা, অংশীদার বানানো। আল্লাহর জাতিস্বত্বা বা কোনো বৈশিষ্ট্যে অন্য কাউকে বা অন্য কিছুকে আল্লাহর শরীক বা সমকক্ষ বানানো অথবা আল্লাহর ইবাদাত করতে যা করা হয় অন্যের জন্য এমন কিছু করার নাম শিরক। শিরক নানা ভাবে হয়ে থাকে। যেমন..

- আল্লাহর ছেলে আছে, মেয়ে আছে বা পরিবার আছে মনে করলে আল্লাহর জাতিসত্বায় শিরক হয়
- আল্লাহর ইবাদত করতে যা করা হয় অন্যের জন্য এমন কিছু করলে ইবাদাতে শিরক হয়
- আল্লাহর প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্বে অন্যকে আল্লাহর মত মনে করলে উলুহিয়্যাতে শিরক হয়
- আল্লাহর বিধানের বিপরীতে অন্যকারো বানানো আইন বা বিধান মেনে নিলে রুবুবিয়্যাতে শিরক হয়
- আল্লাহর বিচার ও শাসননীতির বিপরীতে অন্যের বিচার বা শাসন নীতি মেনে নিলে আল্লাহর হাকিমিয়্যাতে শিরক হয়।

- কোনো বৈশিষ্ট্যে অন্যকে আল্লাহর সমান বা সমকক্ষ মনে করলে বৈশিষ্ট্যে শিরক হয়। উল্লেখিত শিরক সমূহ হচ্ছে বড় শিরক।
- আল্লাহ্ ছাড়া অন্য নামে কসম করলে শিরক হয়
- মানুষ থেকে প্রতিদান পাবার জন্য বা আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের সন্তুষ্টির জন্য কোনো সৎকাজ করলে রিয়া হয় এবং রিয়াও এক প্রকার শিরক, হাদীছে রিয়াকে শিরক খাফিয়্য বা গোপন শিরক বলা হয়েছে
- কুরআনের আয়াত (বা মাসনূন দোয়া) ছাড়া অন্যকিছু দিয়ে তাবিজ ঝুলালেও শিরক হয়। নীচের ৩টি হচ্ছে ছোট শিরক।

(শিরক সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে আমাদের ইসলাম শিক্ষা সিলেবাসের ৪র্থ বই "ঈমানের উপর অবিচল থাকা"র শিরক অধ্যায় দেখে নিন)

আল্লাহর অধিকারঃ শুধুই আল্লাহর ইবাদাত করা এবং আল্লাহর সাথে শিরক না করা বান্দার উপর আল্লাহর অধিকার আর শিরক না করলে বান্দাকে জাহান্নামে সাজা না দেওয়া আল্লাহর উপর বান্দার অধিকার।

উত্তম ব্যবহার আত্মীয়-অনাত্মীয়, ধনী-গরীব, পরিচিত-অপরিচিত সকলের অধিকার। তাই সকলের সাথে উত্তম ব্যবহার করতে হবে। অন্যথায় অধিকার নষ্টের অপরাধে অপরাধী হতে হবে তথা জালিম হিসেবে চিহ্নিত হবে।

বিঃ দ্রঃ আল্লাহর ইবাদাত ও দাসত্ব সম্পর্কে আরো স্ববিস্তারে জানতে আমাদের ইসলাম শিক্ষা শিলেবাসের ৬ষ্ঠ বই "দ্বীন বুঝার মৌলিক নীতিমালা"র ইবাদাত অধ্যায়টি দেখে নিন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনাঃ আ'মাল ও ইবাদাত

জীবনের লক্ষ্যঃ আমরা মানুষ। আমরা আল্লাহর দাস। আল্লাহ্ আমাদের রাব্ব, আমাদের মালিক, আমাদের সৃষ্টিকর্তা। মহান আল্লাহ মানুষ ও জিন্ন সৃষ্টি করেছেন শুধুই তাঁর দাসত্ব ও ইবাদাত করার জন্য। তাই আল্লাহর দাসত্ব ও ইবাদাত করাই মানুষ ও জিন্ন জাতির একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। ইরশাদ হচ্ছে..

আমি জিন্ন ও ইনসান সৃষ্টি করেছি শুধুই আমার ইবাদাতের জন্য। (৫১ যারিয়াতঃ ৫৬)	وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

আ'মাল ও ইবাদাত পরিচিতিঃ আ'মাল অর্থ কর্ম আর ইবাদাত অর্থ দাসত্ব ও উপাসনা, মহান আল্লাহর ইবাদাত করতে গিয়ে যেসব কর্ম সম্পাদন করা হয় এগুলোই আ'মাল।

জিন্ন ও ইনসানকে সৃষ্টিই করা হয়েছে শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করার জন্য। আর আল্লাহর ইবাদাত করতে হলে আমাদেরকে ৩টি ধাপে কাজ করতে হবে। যথা..

১ম ধাপঃ ইবাদাতের প্রস্তুতি তথা ইবাদাতের জন্য নিজেকে তৈরি করা

২য় ধাপঃ আসল ইবাদাত

৩য় ধাপঃ ইবাদাতের ফল সংরক্ষণ

ইবাদাতের প্রস্তুতিঃ আল্লাহর ইবাদাতের প্রস্তুতি হিসেবে আমাদেরকে ৩টি কাজ করতে হবে। যথা..

১. নৈতিক ও আদর্শিকভাবে কুফর ও শিরকের পথ পরিত্যাগ করে আল্লাহর পথে ফিরে আসতে হবে। (যে কথা বলা হয়েছে সূরাহ আল-মা-ইদাহ এর ৭৪ তম আয়াতসহ আরো অনেক আয়াতে।) ইসলামের পরিভাষায় এর নাম তাওবাহ।

২. সকল প্রকার ত্বাগূতকে বর্জন করতে হবে। (যে কথা বলা হয়েছে সূরাহ নাহ'লঃ ৩৬, বাক্বারাহঃ ২৫৬, তাহ'রীমঃ ৮, আরো অনেক আয়াতে)
উল্লেখ্য আল্লাহ ও রাসূল তথা ইসলাম বিরোধী সকল ব্যক্তি, ব্যক্তিবর্গ ও অপশক্তিকে ত্বাগূত বলা হয়।

৩. আল্লাহর বিধানের কাছে সম্পূর্নরূপে আত্মসমর্পণ করতে হবে। (যে কথা বলা হয়েছে সূরাহ আল-বাক্বারাহঃ ২০৮সহ আরো অনেক আয়াতে।) ইসলামের পরিভাষায় একে বলা হয় পরিপূর্নভাবে ইসলামে প্রবেশ করা।

আসল ইবাদাতঃ আল্লাহর ইবাদাত করতে হলে আমাদেরকে ৩টি কাজ করতে হবে। যথা..

- প্রথমে পরিপূর্ণভাবে ঈমান আনা তথা আল্লাহ থেকে আগত যাবতীয় তথ্যসমূহে অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস রাখা এবং এর বিপরীতে কোনো কিছু বিশ্বাস না করা।
- আল্লাহর দেওয়া যাবতীয় আদর্শ, দর্শন, বিধিবিধান ও রীতিনীতিকে নৈতিক ও আদর্শিকভাবে মেনে নেওয়া এবং এর বিপরীতে অন্য কোনো আদর্শ, দর্শন, বিধিবিধান, রীতিনীতি বা মতবাদকে বর্জন করা।
- বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সকল বিষয়ে মহান আল্লাহ প্রদত্ব দর্শন, আদর্শ, নীতিমালা ও বিধিবিধান মেনে চলা।

ইবাদাতের পদ্ধতিঃ ইবাদাত করলেই তা গ্রহন করা হয় না, আল্লাহর ইবাদাত করার নির্ধারিত পদ্ধতি রয়েছে। আর তা হল..

- ইবাদাতকারী ব্যক্তি তার বিশ্বাসকে খাটি, বিশুদ্ধ তথা সকল প্রকার ভেজাল থেকে মুক্ত রাখবে
- ইবাদাতকারী ব্যক্তি তার নীতি আদর্শকে সকল প্রকার ভেজাল থেকে মুক্ত রাখবে। আর এ উভয় কাজকে একত্রে বলা হয় ভেজালমুক্ত ঈমান।
- ইবাদাতকারী ব্যক্তি তার আ'মাল তথা কর্মকে ভেজাল মুক্ত রাখবে
- ইবাদাতকারী ব্যক্তি তার নিয়ত তথা লক্ষ্য উদ্দেশ্যকে খাটি ও ভেজালমুক্ত রাখবে।
- এভাবে ভেজাল মুক্ত থাকাকে ইসলামের পরিভাষায় বলা হয় ইখলাস্ব।

ইবাদাতের ফল সংরক্ষণঃ ইবাদাতের ফল সংরক্ষণ করতে হলে আমাদেরকে ২টি মহাপাপ থেকে বিরত থাকতে হবে। কারণ এ দুটি পাপের কোনো একটিতে জড়িয়ে পড়লে ঈমান বিনষ্ট হয়ে যায় এবং সকল আ'মাল ও ইবাদাত নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়। এ ব্যাপারে ইরশাদ হচ্ছে..

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (65)

(হে নবী) তোমার কাছে এবং তোমার পূর্ববর্তী নবীদের কাছে এই মর্মে ওহী পাঠানো হয়েছে যে "যদি তুমি শিরক কর তবে তোমার সকল আ'মাল নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যাবে" এবং তুমি (চিরতরে) ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে যাবে। (৩৯ যুমারঃ ৬৫)

অন্য আয়াতে বলা হচ্ছে..

..আর যে ব্যক্তি ঈমান আনা সত্ত্বেও কুফর করল তার সকল আমল বরবাদ হয়ে গেল। আর আখেরাতে সে (চিরতরে) ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেল। (৫ মা-ইদাহঃ ৫)	وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

ঈমান ও আক্বীদাহঃ কুফর শিরক ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। যে কোনো ভাবে কুফর শিরকে জড়িয়ে পড়লে ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়। আর কোন মুসলিম এমন করলে সে হয়ে যায় চির জাহান্নামী মুনাফিক। মুনাফিক মারা গেলে তার জানাযা পড়তে এবং তাদের জন্য দোয়া করতে নিষেধ করা হয়েছে। (দেখুন সুরাহ তাওবাহঃ ৮৪)

সফলতা ও ব্যর্থতাঃ ইবাদাতের মূল বিষয় আনুগত্য ও অনুকরণ, মনগড়া কাজ ইবাদাত হিসেবে গন্য হয় না। আল্লাহর ইবাদাত করতে হয় একনিষ্ঠ ভাবে, সঠিক নিয়ম মেনে। যে ব্যক্তি একনিষ্ঠ ভাবে, সঠিক নিয়ম মেনে আল্লাহর ইবাদাত করল তার জীবন সফল। আর যে এর ব্যতিক্রম করল সে ব্যর্থ। ইরশাদ হচ্ছে..

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ (52)

যে বা যারা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করল, আল্লাহকে ভয় করল এবং আল্লাহর তাকওয়া অর্জন করল তারাই সফল। (২৪ নূরঃ ৫২)

তাকওয়া পরিচিতিঃ আল্লাহর ভয়ে কুফর শিরক ও পাপাচার থেকে বেঁচে থাকার নাম তাকওয়া। আর যে তাকওয়া অর্জন করে তাকে বলা হয় মুত্তাক্বী। তাকওয়ার ৩টি স্তর রয়েছে। যথা..

১ম স্তরঃ তাকওয়ার ১ম স্তর কুফর শিরক থেকে বিরত থাকা আর আমাদের সবাইকে অত্যাবশ্যকীয়ভাবে এতোটুকু তাকওয়া অর্জন করতেই হবে, কারন এতোটুকু তাকওয়া অর্জন করতে না পারলে মানুষ কুফর শিরকে জড়িয়ে মুনাফিক হয়ে যাবে এবং ঈমানহারা হয়ে চির জাহান্নামী হয়ে যাবে। এতোটুকু তাকওয়া ছাড়া মানুষের ঈমান, আ'মাল কিছুই কবুল হবে না। যে কথা বলা হয়েছে সূরাহ মা-ইদাহ এর ২৭ তম আয়াতে।

২য় স্তরঃ তাকওয়ার ২য় স্তর কবীরাহ গোনাহ থেকে বিরত থাকা আর আমাদের সবাইকে আবশ্যকীয়ভাবে যার যার সাধ্যমত এমন তাকওয়া অর্জন করতে হবে, যে কথা বলা হয়েছে সূরাহ তাগা'বুন এর ১৬ তম আয়াতে। কারন এতোটুকু তাকওয়া অর্জন করতে না পারলে মানুষ মহাপাপে জড়িয়ে ফাসিক হয়ে যাবে এবং তখন তার আখেরাত অনিশ্চিত হয়ে যাবে।

৩য় স্তরঃ তাকওয়ার ৩য় স্তর ছোট-বড় সকল প্রকার পাপ ও বদ-অভ্যাস গোনাহ থেকে বিরত থাকা, যে তাকওয়ার কথা বলা হয়েছে সূরাহ আ-ল ই'মরানের ১০২ তম আয়াতে। আর এমন তাকওয়া অর্জন করা আমাদের জন্য অসম্ভব প্রায়।

আনুগত্য পরিচিতিঃ বিধিবদ্ধভাবে কারো আদেশ-নিষেধ মেনে নেওয়ার ও মেনে চলার নাম আনুগত্য। সূরাহ নিসার ৫৯তম আয়াতে আল্লাহ, রাসূল আর আমাদের কর্তৃত্বশীল ব্যক্তিবর্গের আনুগত্য করতে আমাদেরকে আদেশ দেওয়া হয়েছে। এর মাঝে..

- আল্লাহর আনুগত্যের মূলভিত্তি দাসত্ব। মানে আমরা দাস আর আল্লাহ আমাদের মালিক। তাই আল্লাহর আনুগত্য হবে শর্তহীন ও সীমাহীন।
- রাসূলের আনুগত্যের মূলভিত্তি আল্লাহর অনুমোদন। সূরাহ নিসার ৬৪তম আয়াতে যে কথা বলা হয়েছে। আর এজন্যই আল্লাহর কিতাবের বিপরিতে রাসূলের হাদীছ মানা হয় না।
- আর কর্তা ব্যক্তিদের আনুগত্য হবে আল্লাহ ও রাসূলের দেওয়া মূলনীতির ভিত্তিতে, মূলনীতির আওতাধীন থেকে। আল্লাহ ও রাসূলের দেওয়া মূলনীতির বাইরে গিয়ে অন্য কারো আনুগত্য করা বৈধ নয়।

ইবাদাতের মূলকথাঃ "জিন্ন ও ইনসান সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য হল আল্লাহর ইবাদাত করা" আর ইবাদাতের মূলবিষয় আত্মসমর্পণ। জীবনের সকল ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে নিয়ে, নৈতিক ও আদর্শিকভাবে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে আল্লাহর মনোনীত পথে জীবন যাপন করাই ইবাদাতের মূলকথা। ইসলাম আল্লাহর মনোনীত একমাত্র জীবন আদর্শ। সুতরাং আল্লাহর ইবাদাত করতে হলে নৈতিক ও আদর্শিকভাবে ইসলামকে মেনে নিতে হয় এবং বাস্তব জীবনে ইসলামী বিধান মেনে চলতে হয়। ইরশাদ হচ্ছে..

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

আল্লাহর কাছে গ্রহনযোগ্য একমাত্র দ্বীন (জীবন আদর্শ) হল ইসলাম। একথা জানা সত্ত্বেও আহলেকিতাব শুধু হিংসাবশত ভিন্নমত পোষন করছে (যা আল্লাহর বিধান অমান্য করারই নামান্তর।) আর যে বা যারা আমার আয়াত (বিধান, কিতাব) অমান্য করবে (তাদের জানা উচিত) আল্লাহ্ অতি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। (৩ আ-ল ই'মরানঃ ১৯)

যে ব্যক্তি পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পন না করে অন্য পথ খুজবে তার ঈমান, আমল কিছুই কবুল করা হয় না। এ ব্যাপারে ইরশাদ হচ্ছে..

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (85)

যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য দ্বীন (অন্য আদর্শ, দর্শন, নীতিমালা বা মতবাদ) এর সন্ধান করল তার কোনোকিছুই কবুল করা হবে না এবং আখেরাতে সে (চির তরে) ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে যাবে। (৩ আ-ল ই'মরানঃ ৮৫)

আল্লাহর ইবাদাতঃ ইবাদাত করতে হয় শধুই আল্লাহর। আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদাত মোটেই কাম্য নয়। আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদাত করলে শিরক হয়। ইরশাদ হচ্ছে..

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

(হে আমার বান্দারা!) তোমরা ইবাদাত করবে শুধুই আল্লাহর, (আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদাত করে) অন্যকে আল্লাহর শরীক বানাবে না। আর (শুনো!) বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন, নিকটতম প্রতিবেশী, পার্শ্ববর্তি প্রতিবেশী, পার্শ্ববর্তি সঙ্গী (সফরসঙ্গী /জীবনসঙ্গী) পথিক ও অধীনস্থ সকলের সাথে উত্তম ব্যবহার করবে। (তোমরা দম্ভ করবে না। কারণ) কোনো অহংকারী দাম্ভিককে আল্লাহ পছন্দ করেন না। (৪ নিসা ৩৬)

ঈমান ও আক্বীদাহঃ আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদাত করা, আল্লাহর বিধানের বিপরীতে অন্যের বানানো আদর্শ, দর্শন, মতবাদ বা নীতিমালা মেনে নেওয়া শিরকের শামিল। আর শিরক ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। শিরক করলে ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল বরবাদ হয়ে যায়।(যে কথা বলা হয়েছে সূরাহ যুমার এর ৬৫ তম আয়াতসহ আরো অনেক আয়াতে।)

অধিকারঃ উত্তম ব্যবহার আত্মীয়-অনাত্মীয়, ধনী-গরীব, পরিচিত-অপরিচিত, সকলের অধিকার। তাই সকলের সাথে উত্তম ব্যবহার করতে হবে। অন্যথায় অধিকার নষ্টের অপরাধে অপরাধী হতে হবে তথা আল্লাহর বিচারে জালিম হিসেবে চিহ্নিত হতে হবে।

ইবাদাতের পথঃ আল্লাহ হলেন আমাদের একমাত্র মালিক, একমাত্র ইলাহ। আমাদের উপর আল্লাহর মালিকানা সার্বিক ও সার্বভৌম। তাই নৈতিক ও আদর্শিকভাবে নিজের উপর মহান আল্লাহর প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে নিয়ে বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে ও সকল বিষয়ে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ ও বিধিবিধান মেনে নেওয়া ও মেনে চলাই ইবাদাতের একমাত্র পথ আর এরই নাম ইসলাম। এ পথকে সীরাত মুস্তাক্বীম, সোজা পথ বা সরল পথও বলা হয়। এমনভাবে আল্লাহর ইবাদাত করা আমাদের ফরজ দায়িত্ব। ইরশাদ হচ্ছে..

وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ (36)

(ঈসা আ. বলেছিলেন) নিশ্চয় আল্লাহ হলেন আমার রাব্ব এবং তোমাদেরও রাব্ব। তাই ইবাদাত কর শুধুই তাঁর। আর এটাই সিরাত মুস্তাক্বীম (সঠিক পথ।) (১৯ মারইয়ামঃ ৩৬)

রাব্ব পরিচিতিঃ রাব্ব অর্থ প্রভু, মালিক, অধিপতি, স্বামী, অন্নদাতা, বিধানদাতা, নীতিনির্ধারক, জীবনবিধান নির্নয়কারী, বৈধঅবৈধ নির্ধারনকারী, ইত্যাদি।

যিনি সবকিছুর মালিক, সবকিছুর উপর যার মালিকানা, ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রন সুপ্রতিষ্ঠিত, যিনি সকলের প্রয়োজন মিটান, অভাব দূর করেন, সকলের জন্য বৈধ-অবৈধ নির্ধারন করেন, জীবন বিধান ঠিক করে দেন, যিনি সবাইকে তার কর্মের প্রতিফল ও পুরস্কার দেন, যিনি দান করেন, দয়া করেন, তিনি-ই রাব্ব। রাব্ব-ই একমাত্র বৈধ বিধানদাতা, বৈধ নীতিনির্ধারক।

মহান আল্লাহ হলেন আমাদের একমাত্র রাব্ব। আমরা দুনিয়াতে আসার আগেই মহান আল্লাহকে একমাত্র রাব্ব হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে এসেছি এবং মৃত্যুর পর সর্ব-প্রথম যে প্রশ্নের সম্মুখীন হব এটা হচ্ছে "তোমার রাব্ব কে"?

রাব্বের নীতির বাইরে গিয়ে অন্যকারো নীতি বা বিধান মেনে নেওয়া শিরক। শিরক করলে ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল বরবাদ হয়ে যায়। কোনো মুসলিম শিরক করলে সে আর মুঅমিন থাকে না। বরং মুনাফিক হয়ে চির জাহান্নামী হয়ে যায়। মুনাফিক জাহান্নামের নিম্নতম গহ্বরে পতিত হবে। পরকালে মুনাফিকের জন্য শাফায়া'ত করতেও কাউকে অনুমতি দেয়া হবে না। মুনাফিক মারা গেলে তার জানাযা পড়া বা তার জন্য দোয়া করাও নিষিদ্ধ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনাঃ মালিকানা দুই প্রকার। বিধিবদ্ধ মালিকানা ও সার্বিক মালিকানা বা সার্বভৌম মালিকানা।

- যে মালিকানা আইনের আওতাধীন, যে মালিকানায় জবাবদিহিতা আছে, যে মালিকানায় নিয়ম বা বিধান মেনে চলতে হয়, এটা হল বিধিবদ্ধ মালিকানা। আল্লাহ ছাড়া অন্য সকলের মালিকানা বিধিবদ্ধ।
- পক্ষান্তরে যে মালিকানা কোনো আইন বা নিয়মের আওতাধীন নয়, যে মালিকানায় কোনো জবাবদিহিতা নেই, যে মালিকানায় যা ইচ্ছা তাই করা যায়, এটা হচ্ছে সার্বিক মালিকানা বা সার্বভৌম মালিকানা। একমাত্র আল্লাহর মালিকানাই সার্বিক ও সার্বভৌম।

ত্বাগূত বর্জনঃ ঈমান ও ইবাদাত কবুলের পুর্তশর্ত হল ত্বাগূত বর্জন। ত্বাগূত বর্জন না করলে ঈমান, আ'মাল, ইবাদাত কিছুই কবুল হয় না। এ ব্যাপারে ইরশাদ হচ্ছে..

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۖ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ۚ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ (36)

আমি সকল জাতির কাছে রাসূল পাঠিয়েছি (এ বাণী দিয়ে যে) তোমরা সবাই এক আল্লাহর ইবাদাত করবে এবং সকল প্রকার ত্বাগুতকে বর্জন করবে। অতঃপর তাদের কাউকে (যারা ত্বাগূত বর্জন করেছে তাদেরকে) আল্লাহ হেদায়াত করেছেন আর কারো উপর (যারা ত্বাগূ'ত বর্জন করেনি তাদের উপর) চেপে বসেছে বিভ্রান্তি। সুতরাং তোমরা যমীনে বিচরণ কর। আর প্রত্যক্ষ কর (ত্বাগূত বর্জনের এ নীতি) প্রত্যাখ্যানকারীদের /অমান্যকারীদের কী পরিণতি হয়েছে। (১৬ নাহালঃ ৩৬)

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (256)

দ্বীন গ্রহণে বাধ্যবাধকতা নেই। (আল-কুরআনের সুস্পষ্ট বর্ণনার মাধ্যমে) বিভ্রান্তি থেকে হেদায়াত সম্পূর্ণরূপে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। সুতরাং **যে ব্যক্তি সকল প্রকার ত্বাগূতকে বর্জন করল এবং এক আল্লাহর উপর ঈমান আনল** সে এক মজবুত আদর্শ আঁকড়ে ধরল যা থেকে আর বিচ্ছিন্ন হতে নেই। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী। (২ বাক্বারাহঃ ২৫৬)

ঈমান ও আক্বীদাহঃ মুসলিম হতে বা ইসলাম গ্রহণ করতে কাউকে বাধ্য করা যাবে না। তবে মুসলিম হবার পর ফরজ কাজসমূহ পালন করা এবং হারাম থেকে বেঁচে থাকা সবার জন্য অত্যাবশ্যকীয়ভাবে আলনীয়। আর ঈমান কবুলের পূর্বশর্ত হল ত্বাগূত বর্জন। ত্বাগূত বর্জন না করলে ঈমান, আ'মাল, ইবাদাত কোনোকিছুই গ্রহনযোগ্য হয় না।

উল্লেখ্য তাগূত অর্থ অবাধ্য। আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্য ব্যক্তি, ব্যক্তিবর্গ ও অপশক্তিকে ত্বাগূত বলা হয়। আমাদের এ সিলেবাসের ৫ম অধ্যায়ে ত্বাগূত বর্জন সম্পর্কে আরো সবিস্তারে আলোচনা করা হবে, ইন শা-আল্লাহ।

ইবাদাতের নমুনাঃ যার যার মত করে কিছু করলেই এটা ইবাদাত হয়ে যায় না। আল্লাহর ইবাদাত করার জন্য নির্ধারিত নিয়ম, পদ্ধতি ও নমুনা রয়েছে। আল্লাহর ইবাদাতের বাস্তব নমুনা হচ্ছেন রাসূলগণ। রাসূলগণই আল্লাহর ইবাদাতের একমাত্র সঠিক অনুকরণীয় আদর্শ। যে যুগে যে রাসূল এসেছেন ওই যুগের মানুষের জন্য ইবাদাতের নমুনা হিসেবে একমাত্র তিনিই আদর্শ। রাসূলের আনুগত্য ও অনুকরণই আল্লাহর ইবাদাতের একমাত্র সঠিক পথ, একমাত্র সঠিক পদ্ধতি। এছাড়া অন্য সকল পথ ও পদ্ধতি ভ্রান্তি ও বিভ্রান্তিকর। ইরশাদ হচ্ছে..

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (31)

(হে নবী! সবাইকে) বলে দাওঃ তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবেসে থাকো (অথবা আল্লাহর ভালোবাসা কামনা কর) তবে আমার অনুকরণ কর, তখন আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন, তোমাদের পাপসমূহ মাফ করে দেবেন। আর (মনে রেখো!) আল্লাহ হলেন ক্ষমাশীল, দয়াময়। (আল্লাহর ভালোবাসা পাবার একমাত্র উপায়; রাসূল সাঃর অনুকরণ) (৩ আ-ল ই'মরানঃ ৩১)

জ্ঞাতব্যঃ আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা হতে হবে অতুলনীয়, এটা আল্লাহর অধিকার। (দেখুন বাকারাহঃ ১৬৫) অন্য সবাইকে ভালোবাসতে হবে আল্লাহর জন্য, আল্লাহর বিধানের আওতাধীন থেকে, আল্লাহর হুকুম মেনে। আর রাসূল সাঃর প্রতি ভালোবাসা হতে হবে সকল মানুষ থেকে বেশী। বর্ণিত হচ্ছে..

আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেনঃ তোমাদের কেউ মুঅমিন হতে পারবে না, যতক্ষন না আমার প্রতি তার ভালোবাসা তার নিজের সত্বা, পরিবার, সম্পদ এবং সকল মানুষ থেকে অধিক না হবে। (মুসলিমঃ ৬৯/৪৪, ঈমান অধ্যায়)

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে..

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ

আমি নূহকে তার জাতির কাছে পাঠালাম, (বলে দিলাম) যন্ত্রণাদায়ক আযাব আসার আগেই তাদেরকে সাবধান করে দাও। সে বললঃ লোক সকল! আমি সুস্পষ্টভাবে তোমাদেরকে সাবধান করে দিচ্ছি; তোমরা সবাই এক আল্লাহর ইবাদাত কর, আল্লাহর তাকওয়া অর্জন কর আর **আমার আনুগত্য কর**। (নতুবা আল্লাহর আযাবে পতিত হবে। ৭১ নূহঃ ১-৩)

অন্য আয়াতে বলা হচ্ছে..

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ (32)

(হে নবী! মানুষকে) বলে দাওঃ তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য কর। তোমরা যদি আনুগত্য বিমুখ হয়ে যাও (তবে কাফির ও মুনাফিক হয়ে যাবে। আর জেনে রাখো!) আল্লাহ কাফিরদের পছন্দ করেন না। (৩ আল-ই'মরানঃ ৩২)

ঈমান ও আক্বীদাহঃ উক্ত আয়াত থেকে বুঝা যায়ঃ রাসূলের আনুগত্য থেকে বের হয়ে যাওয়া কুফর ও মুনাফিকী।

অন্য আয়াতে বলা হচ্ছে..

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا (80)

যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করল সে আল্লাহর আনুগত্য করল। আর যে আনুগত্য বিমুখ হয়ে গেল (সে বিভ্রান্ত হয়ে গেল। তবে চিন্তা কর না।) আমি তাদের রক্ষক হিসেবে তোমাকে পাঠাইনি। (৪ নিসাঃ ৮০)

অন্যত্র বলা হচ্ছে..

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (115)

হেদায়াত সুস্পষ্ট হওয়া সত্বেও যে ব্যক্তি রাসূলের বিরোধিতা করবে, মুঅমিনদের (সাহাবাদের) পথ ছেড়ে অন্য পথে চলবে, সে যেদিকে ফিরবে আমি তাকে সেদিকেই ফিরিয়ে দেব, তাকে নিক্ষেপ করব জাহান্নামে আর জাহান্নাম হল জঘন্যতম আবাস। (৪ নিসাঃ ১১৫)

জ্ঞাতব্যঃ মনে রাখবেন; নেতা, আলীম, পীর, মুরব্বী, ইমাম, উনারা সকলেই আমাদের সম্মানের পাত্র, আমরা উনাদেরকে মান্য করব ঠিকই। তবে মনে রাখতে হবেঃ উনাদের প্রত্যেককে মানার জন্য আলাদা নিয়ম, নীতি ও সীমানা রয়েছে। কারো ব্যাপারেই এ নিয়ম, নীতি বা সীমানা লঙ্ঘন করা যাবে না। কিন্তু আজকাল আমাদের অনেকেই নেতা মানা, আইন মানা, পীর মানা, আলিম মানা বা ইমাম মানার নামে রাসূল সাঃর সুন্নাহকে অবজ্ঞা করে থাকেন। অথচ হেদায়াতের একমাত্র পথ রাসূল সাঃর অনুকরণ। যে পথ আঁকড়ে ধরে ছিলেন সাহাবাগণ। রাসূল সাঃর অনুকরণ ছেড়ে অন্য পথে গেলে বা অন্য পথ ধরলে বিভ্রান্তি অনিবার্জ হয়ে যায়।

কবুল ইবাদাতঃ যে ইবাদাতকে পূজি করে আখেরাতে জান্নাত পাওয়া যাবে; এটাই কবুল ইবাদাত। মনে রাখতে হবে! সকল ইবাদাত বা সকলের ইবাদাত আল্লাহর কাছে কবুল নয়। ইবাদাত কবুল হতে হলে ইবাদাত ও ইবাদাতকারী উভয়েই আল্লাহর কাছে গ্রহনযোগ্য ও মানসম্পন্ন হতে হবে। যেমন..

ক. আল্লাহ কেবল ওই ব্যক্তি ঈমান, আ'মাল ও ইবাদাতই কবুল করেন যে মুঅমিন ও মুত্তাক্বী হবে এবং কমপক্ষে অত্যাবশ্যকীয় স্তরের তাকওয়া অর্জন করে যাবতীয় কুফর ও শিরক থেকে নিজেকে বাচিয়ে রাখতে সক্ষম হবে। যেমন ইরশাদ হিচ্ছে..

..আল্লাহ কেবল মুত্তাক্বীদের থেকেই (তাদের ঈমান ও আ'মাল) কবুল করে থাকেন। (মাইদাহঃ ২৭)	إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ

তাকওয়া ও মুত্তাকী পরিচিতিঃ মুত্তাক্বী শব্দটি এসেছে আরবী তাক্বওয়া থেকে। আর তাক্বওয়ার মূল শব্দ বিক্বায়াহ অর্থ বেঁচে থাকা, বিরত থাকা। ইসলামী পরিভাষায় যাবতীয় কুফর শিরক ও মহাপাপ থেকে বিরত থাকার নাম তাকওয়া। আর যে ব্যক্তি তাকওয়া অর্জন করল (তথা কুফর শিরক ও পাপাচার থেকে বেঁচে থাকল) তাকে বলা হয় মুত্তাক্বী।

উল্লেখ্য তাক্বওয়ার ৩টি স্তর রয়েছে। যথা.. অত্যাবশ্যকীয় তাক্বওয়া, আবশ্যকীয় তাক্বওয়া এবং পরিপূর্ণ তাক্বওয়া।

অত্যাবশ্যকীয় তাকওয়াঃ প্রতিটি মুসলিমের জন্য অত্যাবশ্যকীয় তাকওয়া হল সকল প্রকার কুফর ও শিরক থেকে বেঁচে থাকা। মুসলিম পুরুষ নারী সবাইকে অত্যাবশ্যকীয়ভাবে এতোটুকু তাকওয়া অর্জন করতে হবে। নতুবা ঈমান বাঁচানো সম্ভব হবে না। বরং তখন ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে এবং ওই ব্যক্তি মুনাফিক হয়ে চির জাহান্নামী হয়ে যাবে।

আবশ্যকীয় তাকওয়াঃ প্রতিটি মুঅমিনের জন্য আবশ্যকীয় তাক্বওয়া হল সকল প্রকার কাবীরাহ গোনাহ তথা মহাপাপ থেকে বেঁচে থাকা। মুঅমিন হতে হলে এবং মুঅমিন হিসেবে জীবন যাপন করতে হলে অবশ্যই এতোটুকু তাকওয়া অর্জন করতে হবে। নতুবা সে ফাসিক হয়ে যাবে এবং তার আখেরাত অনিশ্চিত হয়ে যাবে।

পরিপূর্ণ তাকওয়াঃ অর্থাৎ ছোটবড় সকল প্রকার পাপ থেকে বেঁচে থাকা, যা মানুষের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। মহান আল্লাহই কেবল তার পছন্দের বান্দাকে এমন তাওয়ার অধিকারী করতে পারেন।

খ. আল্লাহ কেবল ওই ব্যক্তির ইবাদাতই কবুল করেন যে ব্যক্তি ইখলাস্বের অধিকারী হবে এবং নীতিগতভাবে ইসলাম ছাড়া বাকী সকল দর্শন, আদর্শ, মতবাদ ও নীতিমালাকে বিসর্জন দিয়ে নৈতিকভাবে একনিষ্ট মুসলিম হতে পারবে তথা হানীফ পদ্ধতি মেনে আল্লাহর ইবাদাত করবে। এ ব্যাপারে ইরশাদ হচ্ছে..

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ (5)

আর তাদেরকে হুকুম করা হয়েছিল যেন মুখলিস্ব হয়ে তথা ভেজালমুক্ত দ্বীন মেনে হানীফ পদ্ধতিতে এক আল্লাহর ইবাদাত করে, সালাত কায়েম করে আর যাকাত আদায় করে। আর এটাই প্রতিষ্ঠিত দ্বীন (তথা প্রতিষ্ঠিত জীবন আদর্শ, প্রতিষ্ঠিত নৈতিকতা ও ইবাদাতের সঠিক পদ্ধতি) (৯৮ বায়্যিনাহঃ ৫)

হানীফ পদ্ধতিঃ নৈতিক ও আদর্শিকভাবে ইসলাম ছাড়া অন্য সকলকিছুকে বিসর্জন দিয়ে বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সকল বিষয়ে একমাত্র আল্লাহর দ্বীনকে আকড়ে ধরা ও আকড়ে থাকার নাম হানীফ পদ্ধতিতে দ্বীন পালন করা।

ইখলাস্ব পরিচিতিঃ ইখলাস্ব অর্থ খাটি, বিশুদ্ধ, ভেজালমুক্ত, ইত্যাদি। আর যে ব্যক্তি তার বিশ্বাস, নিতি-আদর্শ, কর্ম ও নিয়তে ইখলাস্বের অধিকারী হতে পারল তাকে বলা হয় মুখলিস্ব। ইসলামে ইখলাস্ব হচ্ছে..

- ইবাদাতকারী ব্যক্তি তার বিশ্বাসকে খাটি, বিশুদ্ধ তথা সকল প্রকার ভেজাল থেকে মুক্ত রাখবে
- ইবাদাতকারী ব্যক্তি তার নীতি আদর্শকে সকল প্রকার ভেজাল থেকে মুক্ত রাখবে। আর এ উভয় কাজকে একত্রে বলা হয় ভেজালমুক্ত ঈমান।
- ইবাদাতকারী ব্যক্তি তার আ'মাল তথা কর্মকে ভেজালমুক্ত রাখবে
- ইবাদাতকারী ব্যক্তি তার নিয়ত তথা লক্ষ্য উদ্দেশ্যকে খাটি ও ভেজালমুক্ত রাখবে।
- এভাবে ভেজাল মুক্ত থাকাকে ইসলামের পরিভাষায় বলা হয় ইখলাস্ব।

গ. আল্লাহ কেবল ওই ব্যক্তির আ'মাল ও ইবাদাতই কবুল করেন যেব্যক্তি উল্লেখিত মান বজায় রাখা স্বত্বেও আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করবে, ঈমানের উপর অটল ও অবিচল থাকবে এবং রাসূল সাঃর অনুকরণে নির্ভেজালভাবে ইবাদাত করতে হয়। নতুবা তার ভালো কাজগুলো ইবাদাত হিসেবে গন্য করা হবে না। ফলে এসবের বিনিময় তাকে দুনিয়াতেই দিয়ে দেওয়া হবে এবং আখেরাতে সে কিছুই পাবে না। ইরশাদ হচ্ছে..

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ (2)

(হে নবী!) আমি তোমার প্রতি নাযিল করেছি যথাযথ কিতাব। তাই তুমি এক আল্লাহর ইবাদাত করবে (এ কিতাবের বিধান মত) একাগ্রচিত্তে, ভেজালমুক্ত দ্বীন মেনে। (৩৯ যুমারঃ ২)

অন্যত্র বলা হচ্ছে..

(হে নবী! মানুষকে) বলে দাওঃ আমি ইবাদাত করি শুধুই আল্লাহর। আমার দ্বীন (জীবন আদর্শ, নৈতিকতা ও ইবাদাতের পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে) ভেজালমুক্ত। (৩৯ যুমারঃ ১৪)	قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي

আ'মাল ও ই'বাদাত কবুলের শর্তসমূহঃ আমরা আ'মাল ও ই'বাদাত করি শুধুই আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য এবং আখেরাতের অনন্ত জীবনে প্রতিদানের আশায়। আমাদের জানা আবশ্যক যে সকল আ'মাল বা ইবাদাতের প্রতিদান আখেরাতে পাওয়া যাবে না, আখেরাতে আমরা শুধু ওইসব আ'মাল ও ই'বাদাতের প্রতিদানই পাব

যেগুলো আল্লাহর কাছে কবুল হবে। আর বান্দাকে তার আ'মাল ও ই'বাদাত আল্লাহর কাছে কবুল বা গ্রহণযোগ্য করানোর জন্য কিছু শর্ত পূরণ করতে হয়। যেমন..

শর্ত ১. ঈমানঃ ও অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমল ও ইবাদাত করবে তাকে পরিপূর্ন ঈমানের অধিকারী হতে হবে (যে কথা বলা হয়েছে সূরাহ ইসরা এর ১৯ তম আয়াতে। কোনো কারণে ঈমান নষ্ট করে ফেললে আ'মাল ও ই'বাদাত নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়।)

শর্ত ২. তাকওয়াঃ যে ব্যক্তি আমল ও ইবাদাত করবে তাকে কমপক্ষে ১ম স্তরের তাকওয়ার অধিকারী হতে হবে তথা যাবতীয় কুফর ও শিরক থেকে নিজেকে বিরত রাখতে হবে। (যে কথা বলা হয়েছে সূরাহ মাইদাহ এর ২৭ তম আয়াতে। কোনো প্রকার কুফর বা শিরকে জড়িয়ে গেলে তার আ'মাল ও ই'বাদাত নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যাবে।)

শর্ত ৩. ইখলাস্বঃ যে ব্যক্তি আমল ও ইবাদাত করবে তাকে ইখলাস্বের সহিত কাজটি করতে হয় (উল্লেখ্য ইখলাস্ব অর্থ ভেজালমুক্ত। অর্থাৎ তার বিশ্বাস, নৈতিকতা, কর্ম ও নিয়তকে ভেজালমুক্ত রাখতে হবে। এ ৪টি বিষয়ের কোনো ১টিতে ভেজাল যুক্ত হয়ে গেলে তা নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়।)

শর্ত ৪. রিয়াঃ অর্থাৎ আ'মাল ও ই'বাদাতটি সম্পূর্নভাবে রিয়া মুক্ত থাকতে হবে (বান্দা কোনো কাজ করার পর আল্লাহ ছাড়া অন্য থেকে প্রতিদান নিলে বা আশা করলে অথবা অন্যকে দেখানোর জন্য কাজ করলে এটাকে রিয়া বলা হয় এবং এ কাজটি তখন নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়।)

শর্ত ৫. আহ'কাম ও আরকানঃ প্রতিটি আ'মাল ও ইবাদাতের জন্য নির্ধারিত কিছু বিধিবিধান ও নিয়ম নীতি রয়েছে, এসব বিধিবিধান মেনেই কাজটি করতে হবে (প্রতিটি কাজেরই শারীয়া'হ নির্ধারিত কিছু বিধিবিধান রয়েছে। এসবের বাইরে কিছু করলে এটা গ্রহণযোগ্য হয় না।)

শর্ত ৬. রাসূল সা.র তরিকা বা পদ্ধতিঃ কাজটি করতে হয় রাসূল সা.'র তরিকা মত (রাসীল সা.র অনুমোদিত তরিকার বাইরে গিয়ে কোনো কাজ করলে এর গ্রহণযোগ্যতা থাকে না।)

শর্ত ৭. হারাম মুক্তঃ অর্থাৎ আ'মাল ও ইবাদাতকারীকে যাবতীয় হারাম থেকে মুক্ত থাকতে হয়। (হারাম খাদ্য, হারাম পানীয় বা হারাম পোশাক পড়ে ই'বাদাত করলে এটা কবুল করা হয় না।)

উল্লেখিত শর্তসমূহ পূর্ণ করে আ'মাল করলে এটা কবুল হবে। অন্যথায় এসব আ'মল মূল্যহীন বেকার কাজে পরিনত হয়ে যাবে।

যে ইবাদাত গ্রহণযোগ্য নয়ঃ আল্লাহর ইবাদাত করতে হয় রাসূল সা.র অনুকরণ করে, একাগ্রচিত্তে, ভেজালমুক্ত থেকে। মনগড়া পথে বা মনগড়া পদ্ধতিতে ইবাদাত করলে এটা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না।

মনে রাখতে হবে; ইবাদাতে মনগড়া কোনোকিছু যোগ করলে এটা আর ভেজালমুক্ত থাকে না বরং ভেজালযুক্ত হয়ে যায়। আর ভেজালযুক্ত ঈমান, আ'মাল বা ইবাদাত আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। ইরশাদ হচ্ছে..

মনে রেখো! শুধু ভেজালমুক্ত দ্বীনই (ঈমান, আ'মাল, নিয়ত) আল্লাহর কাছে গ্রহণ যোগ্য হয়... (৩৯ যুমারঃ ৩)	أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ...

যে ব্যক্তি শুধুমাত্র কিছু আ'মালের বেলায় আল্লাহর বিধান মেনে চলবে আর জীবনের অন্যান্য বিষয়ে অন্যকিছু মেনে চলবে তার ঈমান, আমাল, ইবাদাত কোনোকিছুই আল্লাহ গ্রহন করেন না। বরং আল্লাহর তালিকায় ওই ব্যক্তি মুনাফিক হয়ে চির জাহান্নামী হয়ে যায়। ইরশাদ হচ্ছে..

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

না.., তোমার প্রভুর কসম! তারা কেউই মুঅমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না তাদের যাবতীয় বিষয় মীমাংসার জন্য তোমার কাছে আসবে, তোমার দেওয়া ফয়সালা বিনা দ্বিধায় মেনে নেবে আর সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করবে। (৪ নিসাঃ ৬৫)

জ্ঞাতব্যঃ মুঅমিন হওয়ার জন্য এবং মুঅমিন হিসেবে জীবন যাপনের জন্য এখানে ৩টি শর্ত আরোপ করা হয়েছে। এ ৩ শর্তের যেকোনো একটি অনুপস্থিত হলে কোনো ব্যক্তি মুঅমিন হতে পারবে না বা মুঅমিন থাকতে পারবে না। শর্ত ৩টি হচ্ছে..

- জীবনের যাবতীয় সমস্যার সমাধানে রাসূল সা.র তথা ইসলামী বিধানের শরণাপন্ন হতে হবে।
- রাসূলের দেওয়া ফয়সালা বা বিধান তথা ইসলামী শারীয়া'হ বিনা দ্বিধায় মেনে নিতে হবে।
- আল্লাহর (বিধান ও রাসূল সা.র আদর্শের) কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করতে হবে।

আত্মসমর্পণের নমুনাঃ নিজের আদর্শ, দর্শন, নীতি, নৈতিকতা, চিন্তা, চেতনা, সাধনা, আরাধনা, জীবন, মরন, সবকিছু আল্লাহর ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিয়ে মহান আল্লাহর দেওয়া আদর্শ, দর্শন, নীতিমালা, নৈতিকতা ও বিধিবিধান মেনে চলাকে নিজের উপর অবধারিত করে নেওয়াই আত্মসমর্পণের মূলকথা। ইরশাদ হচ্ছে..

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (162) لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ (163)

(হে আমার বান্দা) বলো! আমার সালাত (ইবাদাত ও জীবিন বিধান) আমার নুসুক (কর্ম ও সাধনা) আমার জীবন, আমার মরণ, সবকিছুই রাব্বু-ল-আ'লামীন আল্লাহর তরে (উৎসর্গকৃত,) যার কোনো শরীক নেই আর আমাকে এমন আদেশই দেওয়া হয়েছে। আমিই প্রথম আত্মসমর্পণকারী। (৬ আনয়ামঃ ১৬২-১৬৩)

জ্ঞাতব্যঃ আপনি আপনার সবকিছু শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করতে পারলেই কেবল মুসলিম হিসেবে দাবী করতে পারেন।

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে..

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

1:

আল্লাহ বা রাসূল যখন কোনো সিদ্ধান্ত করে ফেলেন তখন (এ ব্যাপারে) মুঅমিন পুরুষ বা নারী কারো কোনো এখতিয়ার থাকে না। (বরং সবাইকে অত্যাবশ্যকীয়ভাবে এটা মেনে নিতে হয় এবং এটা অমান্য করা অবাধ্যতা হিসেবে গণ্য হয়।) আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্য হয়ে গেল সে চরমভাবে বিভ্রান্ত হয়ে গেল। (৩৩ আহযাবঃ ৩৬)

অন্য আয়াতে বলা হচ্ছে..

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ (42)

(হে আমার বান্দাগণ!) তোমরা হাক্ব (ইসলাম) আর বাতিল (কুফর) একত্রে মিশ্রিত কর না। জেনে বুঝে হাক্ব (সত্য, অধিকার, দ্বীন, ইসলামী জ্ঞান) গোপন কর না। (২ বাক্বারাহঃ ৪২)

হাদীছে বর্ণিত হয়েছে..

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابياً جاء الى رسول الله ﷺ فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة؟ قال تعبد الله لا تشرك به شيئاً وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئاً أبداً ولا انقص منه فلما ولى قال النبي ﷺ من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا- رواه البخاري و مسلم

আবু-হুরাইরাহ রা. বলেন, একদা এক বেদুইন এসে বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে এমন আমল বাতলে দিন যা করলে আমি জান্নাতে যেতে পারব। রাসূল সা. বললেন..

- তুমি এক আল্লাহর ইবাদাত করবে, আল্লাহর সাথে কোনো প্রকার শিরক করবে না।
- ফরজ সালাত কায়েম করবে।
- নির্ধারিত যাকাত আদায় করবে।
- রামাদ্বানে রোজা রাখবে।

লোকটি বললঃ ওই স্বত্বার কসম যার হাতে আমার জীবনঃ আমি এরচেয়ে বেশীও করব না, কমও করব না। এ বলে লোকটি চলে গেল। রাসূল সা. বললেনঃ কেউ জান্নাতী মানুষ দেখতে চাইলে লোকটিকে দেখে নাও। (বুখারী ও মুসলিম)

আল্লাহর ইবাদাত না করার পরিণতিঃ যে ব্যক্তি সঠিকভাবে আল্লাহর ইবাদাত করল চিরস্থায়ী জীবনে তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যায়। আর কেউ আল্লাহর ইবাদাত না করলে বা আল্লাহর পথ ছেড়ে অন্য পথ গ্রহন করলে তার জন্য জাহান্নাম অবধারিত হয়ে যায়। ইরশাদ হচ্ছে..

لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا (172) فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (173)

মাসীহ আল্লাহর দাস হতে অপছন্দ করেনি, সম্মানিত কোনো ফিরিস্তাও না। আর যে (বা যারা) আল্লাহর দাসত্ব /ইবাদাত থেকে সরে যাবে, দম্ভ করবে (তারা যেন জেনে রাখে! পরকালে) তিনি সবাইকে জমা করবেন। যারা ঈমান আনে এবং (ঈমানের সহিত) সৎকাজ করে তিনি তাদেরকে দেবেন পূর্ণ প্রতিদান এবং আরো বাড়িয়ে দেবেন আপন করুনায়। আর যারা আল্লাহর দাসত্ব/ইবাদাত থেকে বেরিয়ে যাবে, দম্ভ করবে তাদেরকে দেবেন যন্ত্রণাদায়ক আযাব। তারা কোনো সাহায্যকারী খুঁজে পাবে না আল্লাহ ছাড়া। (৪ নিসাঃ ১৭২, ১৭৩)

ইবাদাত নিয়ে বিভক্তিঃ মহান আল্লাহ সদয় হয়ে আমাদেরকে তাঁর ইবাদাতের সঠিক পথ ও সঠিক পদ্ধতি বাতলে দিয়েছেন। কিন্তু তথাপিও অনেক মানুষই সঠিকভাবে আল্লাহর ইবাদাত করে না। বাস্তবে দেখা যায়; অনেক মানুষ আল্লাহর দাসত্ব/ইবাদাত পরিহার করে স্পষ্টত কাফির, মুশরিক বা নাস্তিক হয়ে দ্বীনহীন জীবন যাপন করছে। আর যারা নীতিগতভাবে আল্লাহর দাসত্ব মেনে নিয়েছে তাদের অবস্থাও তেমন সুবিধার নয়। আল্লাহর ইবাদাত করতে গিয়ে তারাও দুই ভাবে বিভক্ত হয়ে গেছে।

কিছু মানুষ আল্লাহর হুকুম ও নবীর তরীকা মত কুরআন সুন্নাহ ভিত্তিক ভেজালমুক্ত জীবনযাপনে স্বচেষ্ট রয়েছে। আর অনেকেই ইসলামের সাথে অন্যকিছু যুক্ত করে ভেজাল মিশ্রিত নতুন পথ তৈরি করে নিয়েছে। যারা নতুন পথ তৈরি করছে তারা আবার অনেক দলে বিভক্ত। যেমন..

- কিছু মানুষ পীর-মুরিদী ও মারিফতের নামে মনগড়া পথ বানিয়ে ইসলামের নামে ভন্ডামী করে যাচ্ছে।
- অনেকে আবার কিছু ইসলাম, কিছু হিন্দু ইজম, কিছু বৌদ্ধ মতবাদ, কিছু খৃষ্টানিজম, কিছু নাস্তিক্যবাদ, ইত্যাদি মিশ্রিত করে জীবনটাকে বহুরূপী বানিয়ে ফেলছে।
- কেউ কেউ আবার ধর্ম নিরপেক্ষতার নামে ইসলামকে ব্যক্তি জীবনের কিছু কাজের সাথে সীমাবদ্ধ করে আল্লাহর দ্বীনকে দেশ জাতি ও সমাজ থেকে বিসর্জন দিয়ে বিভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছে।
- অনেকে আবার তাদের বাস্তব জীবন থেকে ইসলামকে বিসর্জন দিয়ে স্যকুলার ও প্রগতিবাদী সেজে আত্মপ্রতারনায় রত আছে

- কেউ কেউ আবার ধর্মের নামে মিলাদ, খতম, সিন্নি, ইত্যাদি নিয়ে অতি ব্যস্ত হয়ে পড়েছে এবং এসবকে দ্বীন মনে করে দ্বীনদার সেজে আত্মতৃপ্তিতে ভোগছে।
- কিছু মানুষ আবার ইসলামের নামে দলাদলি করে উম্মতকে ভেঙ্গে ছিন্নভিন্ন করে নানা দলে বিভক্ত হয়ে একে অন্যের নিন্দা করছে আর নিজেদেরকে একমাত্র সঠিক মনে করে আত্ম-প্রতারনায় রত আছে।
- এভাবে নানা জনে নানা ভাবে মনগড়া পথ বানিয়ে বিভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছে। অথচ নিজেকে ধার্মিক ভেবে ও ধার্মিক সেজে আত্ম অহমিকায় ভোগছে।

পর্যালোচনাঃ আসলে দ্বীন মেনে চলার একমাত্র পথ আল্লাহর ইবাদাত করা। আর আল্লাহর ইবাদাত করতে হলে...

- প্রথমেই সকল প্রকার কুফর ও শিরক পরিহার করে নৈতিকভাবে আল্লাহর পথে ফিরে আসতে হবে
- সকল প্রকার ত্বাগূতকে বর্জন করে শুধুমাত্র আল্লাহর দ্বীনকেই একমাত্র জীবন আদর্শ হিসেবে মেনে নিতে হবে
- অতঃপর আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পন করে আল্লাহর বিধানকে নিজের উপর অবধারিত করে নিতে হবে।
- মানব রচিত সকল আদর্শ, দর্শন, মতবাদ ও নীতিমালা ত্যাগ করে আল্লাহর দ্বীনের উপর অটল ও অবিচল থাকতে হয়।
- বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে ও সকল বিষয়ে শুধুমাত্র ইসলামকে মেনে নিয়ে নৈতিক ও আদর্শিকভাবে একনিষ্ঠ মুসলিম হতে হবে।
- বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে ও সকল বিষয়ে আল্লাহর বিধান ও রাসূলের আদর্শ মেনে চলতে হবে।
- বাস্তব জীবনে শুধুমাত্র রাসূল সা.র আদর্শ ও তরিকা অনুকরণ করতে হবে এবং এর বিপরীতে অন্য কোনোকিছু মেনে নেওয়া যাবে না।
- ইবাদাতের সঠিক পথ ও পদ্ধতি শিখার জন্য সঠিক উৎস থেকে জ্ঞান আহরণ করতে হয়।
- সঠিক পথে, সঠিক পদ্ধতিতে, সঠিক নীতিমালা মেনে, ভেজাল মুক্ত থেকে, শুধুই আল্লাহর জন্য ইবাদাত করতে হয়।

হুঁশিয়ারিঃ আল্লাহর দ্বীনের সাথে অন্যকিছু মিশ্রিত করে ফেললে এটা ভেজাল যুক্ত হয়ে যায়। আর ভেজাল দ্বীন, ভেজাল ঈমান বা ভেজালযুক্ত ইবাদাত আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। ইরশাদ হচ্ছে..

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ (5)

আর তাদেরকে হুকুম করা হয়েছিল যেন এক আল্লাহর ইবাদাত করে হানীফ পদ্ধতিতে ভেজালমুক্ত দ্বীন মেনে (তথা জীবনের আদর্শ, নৈতিকতা, কর্ম, লক্ষ্য ও ইবাদাতের পদ্ধতিকে সম্পূর্ণরূপে ভেজালমুক্ত রাখে,) সালাত কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে। আর এটাই প্রতিষ্ঠিত দ্বীন (তথা বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে ও সকল বিষয়ে মানব রচিত ও মনগড়া সবকিছু বর্জন করে সকল প্রকার ভেজাল থেকে মুক্ত থেকে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর আদেশ মেনে নেওয়া ও মেনে চলাই প্রতিষ্ঠিত দ্বীন) (৯৮ বায়্যিনাহঃ ৫)

জ্ঞাতব্যঃ এখানে ৭টি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। যথা..

- এক আল্লাহর ইবাদাত করতে হবে
- ইবাদাত করতে হবে ভেজালমুক্ত থেকে
- ইবাদাত করতে হবে শুধুই আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য
- ইবাদাত করতে হবে সঠিক পদ্ধতিতে সঠিক বিধান মেনে
- ইবাদাত করতে হবে হানীফ পদ্ধতিতে। উল্লেখ্য ইসলাম ছাড়া অন্য সবকিছুকে বিসর্জন দিয়ে বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে ও সকল বিষয়ে শুধুমাত্র আল্লাহর দেওয়া নীতি, আদর্শ ও বিধিবিধান মেনে নেওয়ার ও মেনে চলার নাম হানীফ পদ্ধতিতে দ্বীন পালন।
- সালাত কায়েম করতে হবে
- যাকাত আদায় করতে হবে।
- এমন হতে পারলে আমার আপনার দ্বীন পরিপূর্ণ হবে, ইন শা-আল্লাহ।

সুতরাং বুঝা গেলঃ

- জীবনকে সফল ও কল্যাণকর করে গড়ে তুলতে হলে শুধুমাত্র এক আল্লাহর ইবাদাত করতে হবে।
- আল্লাহর কছে আত্মসমর্পন করে বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে ও সকল বিষয়ে আল্লাহর বিধান মেনে নিতে হবে এবং মেনে চলতে হবে
- সঠিকভাবে ঈমান আনতে হবে এবং সনাতন ও আধুনিক সকল প্রকার কুফর ও শিরক থেকে বেচে থাকতে হবে
- হানীফ পদ্ধতিতে দ্বীন পালন করতে হবে তথা ইসলাম ছাড়া অন্যসকল আদর্শ, দর্শন, মতবাদ, নীতিমালা ও বিধিবিধানকে বিসর্জন দিয়ে একমাত্র ইসলামকেই জীবন আদর্শ হিসেবে মেনে নিতে হবে এবং মেনে চলতে হবে।
- নিজের বিশ্বাস, নৈতিকতা, কর্ম ও নিয়তে নির্ভেজাল থাকতে হবে।
- আল্লাহর ইবাদাত করতে হবে রাসূল সা.র বাতানো পথে, সঠিক নীতিমালা মেনে। কারণ নীতিভ্রষ্ট ইবাদাত আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। রাসূলের অনুকরণের বাইরে গিয়ে আল্লাহর ইবাদাতে অন্যকিছু যুক্ত করলে বা মিশ্রিত করলে এটা বেকার ও বরবাদ হয়ে যায়। সুতরাং এসব ব্যাপারে সাবধান হতে হবে। জেনে নিতে হবে সঠিক আদর্শ, সঠিক পথ ও সঠিক বিধান।
- মনে রাখতে হবে আমাদের জীবন আদর্শ হিসেবে মহান আল্লাহ আমাদের জন্য যা নির্ধারণ করে দিয়েছেন এটাই দ্বীন ইসলাম।
- জীবন বিধান হিসেবে মহান আল্লাহ যেসব নীতিমালা ও বিধিবিধান ঠিক করে দিয়েছেন এটাই শারীয়া'হ।
- শারীয়া'হ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তৈরি হয়েছে ফিক্বহ। আর ফিক্বহী ভিন্নমতের কারণে তৈরি হয়েছে মাযহাব।
- কিন্তু দ্বীন, শারীয়া'হ ও ফিক্বহ সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞানের অভাবে অনেক মানুষ এসব ব্যাপারে তালগুল পাকিয়ে ফেলেন। তাই দ্বীন শারীয়া'হ ও ফিক্বহ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করতে হবে এবং এটা আমাদের অত্যাবশ্যকীয় দায়িত্ব।

অনুচ্ছেদঃ ৫. নিজের আ'মাল ও ই'বাদাতকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করা

আ'মাল ও ই'বাদাত করা যেমন ফরজ ঠিক তেমনিভাবে আ'মাল ও ই'বাদাতের সংরক্ষণ করাও ফরজ। অর্থাৎ সম্পদ অর্জন বা উপার্জন করার পর যেভাবে সম্পদ নষ্ট বা ধ্বংস হওয়ার সম্ভাবনা থাকে ঠিক তদ্রূপ আ'মাল ও ই'বাদাত সম্পাদন করার পরও এগুলো নষ্ট বা ধ্বংস হবার সম্ভাবনা থেকে যায়। সুতরাং নিজের আ'মাল ও ইবাদাতকে ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা করা আমাদের অন্যতম একটি ফরজ দায়িত্ব।

উল্লেখ্য কিছু পাপ এমন আছে যেগুলো করলে ঈমান, আ'মাল ও ইবাদাত নষ্ট হয়ে যায়। নমুনা স্বরূপ এসবের অন্যতম ৩টি পাপের কথা নিম্নে উল্লেখ করা হলো। যেমন..

১. শিরকঃ ঈমান, আ'মাল ও ই'বাদাত ধ্বংসকারী সবচেয়ে জঘন্যতম মহাপাপ হল শিরক। শিরক একটি প্রতিক্রিয়াশীল মহাপাপ। সনাতন বা আধুনিক যে কোনো ধরণের শিরকে জড়িয়ে পড়লে ঈমান বিনষ্ট হয়ে যায় এবং সকল আ'মাল ও ই'বাদাত নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়। যেমন ইরশাদ হচ্ছে..

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (65)

(হে নবী!) তোমার কাছে এবং তোমার পূর্ববর্তী নবীদের কাছে এই মর্মে ওহী পাঠানো হয়েছে যে, "যদি তুমি শিরক কর তবে তোমার সকল আ'মাল বরবাদ হয়ে যাবে" এবং তখন তুমি (চিরতরে) ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে যাবে। (৩৯ যুমারঃ ৬৫) (শিরক সম্পর্কে জানতে সামনে শিরক অধ্যায় দেখে নিন)

২. কুফরঃ ঈমান, আ'মাল ও ই'বাদাত ধ্বংসকারী আরো একটি জঘন্যতম মহাপাপ হলো কুফর। কুফরও শিরকের মতই প্রতিক্রিয়াশীল মহাপাপ। সনাতন বা আধুনিক যে কোনো ধরণের কুফরে জড়িয়ে পড়লে ঈমান বিনষ্ট হয়ে যায় এবং জীবনের সকল আ'মাল ও ই'বাদাত নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়। যেমন ইরশাদ হচ্ছে..

وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (5)

...আর যে ব্যক্তি ঈমান আনা সত্ত্বেও কুফর করবে তার সকল আমল বরবাদ হয়ে যাবে এবং আখেরাতে সে (চিরতরে) ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে। (৫ মা-ইদাহঃ ৫) (কুফর সম্পর্কে জানতে সামনে কুফর অধ্যায় দেখে নিন)

৩. রিয়াঃ আ'মাল ও ই'বাদাতের ফল ধ্বংসকারী আরো একটি জঘন্যতম মহাপাপ হলো রিয়া। রিয়া অর্থ লোক দেখানো, সে মতে আল্লাহ ছাড়া.. অন্যকে দেখানোর জন্য /অন্যকে খুশী করার জন্য বা অন্য থেকে কোনোকিছু অর্জন করার জন্য আ'মল বা ইবাদাত করা হলে ইসলামের পরিভাষায় এটাকে রিয়া বলা হয়। রিয়া আসলে শিরিকেরই গুপ্ত রূপ। রিয়া আ'মাল ও ইবাদাত ধ্বংসকারী মহাপাপ। (সামনে আয়াত ২৬৪ দেখে নিন)

৪. খুঁটা দেওয়া কা কষ্ট দেওয়াঃ আ'মাল ও ই'বাদাত ধ্বংসকারী জঘন্যতম আরো দুটি পাপ হল কারো প্রতি করুণা, দয়া বা অনুগ্রহ করার পর অথবা কাউকে কোনো প্রকার সাহায্য সহযোগিতা করার পর তাকে সে কথা মনে করিয়ে দেওয়া তথা খুঁটা দেওয়া বা অন্য কোনোভাবে কষ্ট দেওয়া। এমন করলে আপনার করুণা, দয়া, অনুগ্রহ, সাহায্য, সহযোগিতা, সব নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যাবে আর তখন এজন্য আখেরাতে আল্লাহর কাছে সামান্যতম প্রতিদানও আশা করা যাবে না। যেমন ইরশাদ হচ্ছে..

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (262)
قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ (263) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (264)

২৬২. যারা আল্লাহর পথে খরচ করে, অতঃপর (গ্রহীতাকে) কষ্ট দেয় না বা কৃপা প্রকাশ করে না, প্রভুর কাছে তাদের প্রতিদান সংরক্ষিত থাকবে, (আখেরাতে) তাদের কোনো ভয় থাকবে না এবং তারা পেরেশানও হবে না।

২৬৩. (মানুষের সাথে) সুন্দর করে কথা বলা এবং (মানুষকে) ক্ষমা করা; ওই দানের চেয়ে উত্তম, যে দানের পর (গ্রহীতাকে) কষ্ট দেয়া হয় (এসব দান আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ) আল্লাহ অভাবমুক্ত, সহনশীল।

২৬৪. ওহে যারা ঈমান এনেছো! (শোনো!) তোমরা (গ্রহীতাকে) কষ্ট দিয়ে বা গ্রহিতার প্রতি কৃপা প্রকাশ করে (তথা তাকে খুঁটা দিয়ে) তোমাদের দানকে নস্যাৎ করে দিও না। (যে ব্যক্তি দান করার পর গ্রহীতাকে কষ্ট দিল বা খুঁটা দিল তার উপমা হচ্ছে) ওই ব্যক্তির মত যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্য দান করল এবং আল্লাহ ও আখেরাতে ঈমান রাখল না। (অর্থাৎ ঈমানহীন ব্যক্তি যেভাবে নেক কাজের ছাওয়াব পাবে না, ঠিক তদ্রূপ যে ব্যক্তি দান করার পর গ্রহীতাকে কষ্ট দিল বা খুঁটা দিল সেও আখেরাতে কিছুই পাবে না।) এর (এমন দানের) উপমা হলো যেন একটি মসৃন পাথর, যার উপর মাটি লেগে আছে, প্রবল বর্ষণে যা একদম পরিষ্কার হয়ে যায়। (দান করার পর গ্রহীতাকে কষ্ট দিলে বা খুঁটা দিলে ওই ব্যক্তির ছাওয়াবও এভাবেই পরিষ্কার হয়ে যাবে) এমন ব্যক্তিরা তাদের

অর্জিত (ছাওয়াবের) কিছুই পাবে না। আর (শুনো! যে বা যারা আল্লাহর বিধান অমান্য করে তারা কাফির হয়ে যায়। আর) আল্লাহ কাফিরদের হেদায়াত করেন না (যদি তারা নিজ থেকে ফিরে না আসে।) (২ বাক্বারাহঃ ২৬২-২৬৪)

হুঁশিয়ারিঃ দান করে বা উপকার করে গ্রহীতাকে কষ্ট দিলে অথবা নিজের কৃপা প্রকাশ করলে তথা খুঁটা দিলে এর ছাওয়াব নষ্ট হয়ে যায়। উল্লেখ্য দান খয়রাত বা পরোপকারের কথা গ্রহিতাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়াকে খুঁটা বলা হয়। তাই সাবধান!

বিঃ দ্রঃ = আ'মাল ও ই'বাদাত করার পর আখেরাতে এর ফল ভোগ করতে হলে প্রথমে আ'মাল ও ই'বাদাত কবুলের শর্তসমূহ পূরণ করতে হবে তারপর ওইসব পাপ থেকে বিরত থাকতে হবে যেগুলো আ'মাল ও ই'বাদাতকে ধ্বংস করে দেয়। আর যে বা যারা এমন করতে পারবে আখেরাতে কেবল তারাই নিজ নিজ আ'মাল ও ই'বাদাতের ফল ভোগ করতে পারবে।

অনুচ্ছেদঃ ৬. ইখলাস্বঃ দ্বীন পালনে ভেজালমুক্ত থাকা

আমাদের উপর অর্পিত ফরজ দায়িত্বসমূহের মাঝে অন্যতম আরো একটি হল "ইখলাস্ব" তথা "আল্লাহর দ্বীন পালনে ভেজালমুক্ত থাকা" অর্থাৎ আল্লাহ যে ভাবে বলেছেন এবং রাসূল সা. যে ভাবে শিখিয়েছেন; নিজের বিশ্বাস, নৈতিকতা ও কর্মকে ঠিক সে ভাবেই আদায় করা তথা..

- আল্লাহর কথা ও রাসূলের শিক্ষা থেকে কোনো অংশ বাদ না দেওয়া
- আল্লাহর কথা ও রাসূলের শিক্ষার সাথে কোনোকিছু সংযুক্ত না করা
- কাজে পদ্ধতিগত কোনো পরিবর্তন না করা
- নিজের দ্বীন তথা ঈমান, আ'মাল ও কর্মকে সকল প্রকার ভেজাল থেকে মুক্ত রাখা
- শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য আ'মাল ও ইবাদাত করা তথা নিজের নিয়ত ও লক্ষ্যকে ভেজাল মুক্ত রাখা। আর এরই নাম ইখলাস্ব।

ইখলাস্ব আসলে অন্তরের বিষয়, আবার করনীয় বিষয়ও। ইখলাস্বের এক অংশ অর্থাৎ দ্বীন এবং কর্মকে ভেজালমুক্ত রাখা হচ্ছে করণীয় বিষয় আর ইখলাস্বের অন্য অংশ অর্থাৎ নিয়তকে ভেজালমুক্ত রাখা তথা "শুধুই আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজটি সম্পাদন করা" হচ্ছে অন্তরের বিষয়। মহান আল্লাহ তায়া'লা বলেছেন..

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ (2)

(হে নবী!) আমি তোমার প্রতি নাযিল করেছি যথাযথ কিতাব তথা আল-কুরআন। তুমি (এ কিতাবের বিধান মত) আল্লাহর ইবাদাত করবে ভেজালমুক্ত দ্বীন মেনে। (৩৯ যুমারঃ ২)

বলো! আমি ইবাদাত করি শুধুই আল্লাহর। আমার দ্বীন ভেজালমুক্ত। (৩৯ যুমারঃ ১৪	قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي

ইখলাস্ব পরিচিতিঃ ইখলাস্ব অর্থ খাঁটি, বিশুদ্ধ, নির্ভেজাল, ভেজালমুক্ত। আল্লাহর ই'বাদাত করতে হয় ইখলাস্বের সহিত, ভেজালমুক্ত দ্বীন মেনে। ইখলাস্বের সহিত আ'মাল ও ই'বাদাত করতে হলে কমপক্ষে ৩টি বিষয়ের নিশ্চয়তা দিতে হবে..

- ঈমান হতে হবে ভেজালমুক্ত (মানে নিজের বিশ্বাস ও নৈতিকতাকে সকল প্রকার ভেজাল থেকে মুক্ত রাখতে হবে)
- কর্ম হতে হবে ভেজালমুক্ত (মানে কাজ করতে হবে আল্লাহর বাতানো পদ্ধতিতে, রাসূল সা.র তরিকা মত। এতে সামান্য হেরফের করা যাবে না। কারো আবিষ্কৃত ইবাদাত বা তরিকা বা পদ্ধতি মেনে করা আ'মাল আল্লাহর কাছে গ্রহণ যোগ্য হবে না।)
- নিয়ত হতে হবে ভেজালমুক্ত (মানে কাজটি করতে হবে শুধু-ই আল্লাহর জন্য। আল্লাহ ছাড়া অন্যকে খুশী করতে বা অন্যকারো থেকে প্রতিদান বা প্রশংসা পাওয়ার জন্য কোনো কাজ করলে এসব আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না।)

ভেজালের উপমাঃ আমাদের সমাজে নানা ভাবে মানুষের দ্বীনে তথা বিশ্বাস, নৈতিকতা, কর্ম ও নিয়তে ভেজাল যুক্ত হয়ে যায়। নিম্নে এর কিছু উপমা পেশ করা হল..

উপমাঃ ১. মানুষের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো তার ঈমান (তথা বিশ্বাস ও নৈতিকতা।) শুধুমাত্র ভেজালমুক্ত খাঁটি ঈমানই মানুষকে জান্নাতের নিশ্চয়তা দিতে পারে। আর ঈমানকে ভেজালমুক্ত রাখার একমাত্র পন্থা হলো কোনো ব্যাপারে নিশ্চিত ভাবে অবগত হওয়ার পরই কেবল এ ব্যাপারটিকে ঈমানের অংশ হিসেবে মেনে নেওয়া। আর এ জন্যই বিষয়টিকে সুনিশ্চিত করতে উম্মতের সকল ইমাম ঐক্যমত্য পোষণ করেছেন যে "ঈমান ও আক্বীদাহ প্রমাণ করার জন্য ক্বাত্বয়ী' দলীলের প্রয়োজন হয়, ক্বাত্বয়ী' দলীল ব্যতীত কোনোকিছুকে ঈমান ও আক্বীদাহর অংশ বানানো যাবে না"। আর ক্বাত্বয়ী' দলীল বলতে বুঝানো হয় "আল-কুরআনের মুহকাম আয়াত এবং মুতাওয়াতির মানের হাদীছ"।

কিন্তু আজকাল এসব নিয়মনীতি বিসর্জন দিয়ে মসলকী ও মিনহাজী আক্বীদাহ তথা দলীয় আক্বীদাহর নামে দ্বাইফ, মুনকার এবং মাওদ্বু বর্ণনার বিষয়কেও আক্বীদাহর অংশ বানানো হয়। এমনকি কুরআন হাদীছের বিপরীতে গিয়েও দলীয় আক্বীদাহর নামে ঈমানে ভেজাল যুক্ত করা হয়। যেমন..

- রাসূল হাজির নাযির
- রাসূল নূরের তৈরি
- তাবিজ প্রথা

- মনগড়া খতম পদ্ধতি
- মনগড়া দুরুদের ছাওয়াবের পরিমাণ
- আদম আ. রাসূলের উসিলা নিয়ে দোয়া করেছিলেন। ইত্যাদি। এসবই হলো মানুষের আক্বীদাহ ও ঈমানে ভেজালের নমুনা। এভাবেই অনেক মনগড়া ও খোঁড়া আক্বীদাহ তৈরি করে মানুষ তাদের ঈমানে ভেজাল যুক্ত করে ফেলেছে।

উপমাঃ ২. ইসলাম হলো মহান আল্লাহর দেওয়া একমাত্র জীবন আদর্শ এবং ইসলাম আমাদেরকে একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান দিয়েছে যার নাম শারীয়া'হ। রাসূল সা.র জীবদ্দশায়ই ইসলামী শারীয়া'হ পরিপূর্ণ হয়ে গেছে, এতে আর কোনোকিছু যুক্ত করা যাবে না এবং এর থেকে কোনোকিছু বাদও দেওয়া যাবে না।
কিন্তু আজকাল আমাদের জীবনে অনেক কিছুই যুক্ত হয়েছে এবং যুক্ত হচ্ছে। এমনকি ইসলাম পরিপন্থী মানব রচিত অনেক মতবাদ এবং দর্শনকেও ইসলামের সাথে যুক্ত করে পালন করছে অনেক মানুষ। যেমন..

- আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ
- স্যাকুলারিজম বা ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদ
- গণতন্ত্র
- পুঁজিবাদ
- বস্তুবাদ
- বিভক্তি বিভাজন ও দলাদলি। ইত্যাদি।

এসবই হচ্ছে ইসলামে ভেজালের নমুনা আর এভাবেই মানুষ তাদের ইসলামে ভেজাল যুক্ত করে নিজেদের দ্বীনকে ভেজাল যুক্ত করে ফেলছে।

উপমাঃ ৩. ঈমান, আক্বীদাহ ও দ্বীনের মত আজকাল মানুষের আমলেও ভেজালের ছড়াছড়ি। আমল ও ইবাদাতের নামে আজকাল মানুষ মনগড়া অনেক কিছুই করছে এবং করে যাচ্ছে। যেমন..

- মিলাদ, খতম, শিল্পী
- ফরজ সালাতের পর সম্মিলিত দোয়া।
- মনগড়া জিকির ও দুরুদ, ইত্যাদি।

এসবই হচ্ছে মানুষের ইবাদাতে ভেজালের উপমা। আর এভাবেই মানুষ তাদের আ'মাল ও ইবাদাতে ভেজাল যুক্ত করে এগুলোকে ভেজাল যুক্ত বানিয়ে ফেলছে।

অনুচ্ছেদঃ ৭. সাওম পালন বা সিয়াম সাধন

আমাদের উপর অর্পিত ফরজ দায়িত্ব সমূহের মাঝে অন্যতম আরো একটি হল রামাদ্বান মাসে সাওম পালন বা সিয়াম সাধন করা। ইসলামের ৫টি মৌলিক বিষয়ের ৪র্থ নম্বরে রয়েছে সিয়াম। সিয়াম সাধনকে আমাদের সমাজে ফার্সি ভাষার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বলা হয় রোজা রাখা। সাওম পালন করা মুসলিম হিসেবে আমাদের ফরজ দায়িত্ব। ইরশাদ হচ্ছে..

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (183) أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (184)

ওহে যারা ঈমান এনেছো! (শোনো!) তোমাদের উপর ফরজ করা হয়েছে সিয়াম সাধন (রোজা রাখা) যেমন ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর, যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো। (আল্লাহর ভয়ে যাবতীয় কুফর শিরক ও পাপাচার থেকে বেঁচে থাকার নাম তাকওয়া। রোজা পালন করতে হয় ১ মাস তথা) নির্ধারিত (২৯/৩০) দিন। (রোজার মাসে) কেউ অসুস্থ হলে বা সফরে থাকলে (রোজা ভেঙ্গে ফেলবে এবং পরে) অন্যদিন এ সংখ্যা পূর্ণ করবে। আর সক্ষম ব্যক্তি (রোজা না রাখলে প্রতিটি রোজার বদলে একজন) মিসকিনকে ফিদয়াহ (২ বেলার খাবার) দেবে। কেউ স্বেচ্ছায় সৎকাজ করলে এটা তার জন্য কল্যাণকর হয়। তোমরা রোজা রাখবে, এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর (এ কথাটি) যদি তোমরা বুঝতে পারো। (২ বাক্বারাহঃ ১৮৩-১৮৪)

আইন ও বিধানঃ ইসলামের সূচনাতে বিধান ছিল; সক্ষম ব্যক্তি রোজা না রেখে ফিদয়াহ দিলে হয়ে যেত কিন্তু পরবর্তীতে সামনের ১৮৫তম আয়াত দ্বারা এ বিধান রহিত করা হয়েছে। এখন সবাইকে রোজা রাখতে হয়। তবে বার্ধক্য বা স্থায়ী অসুস্থতার কারণে যারা রোজা রাখতে সক্ষম নয় তাদের জন্য ফিদয়ার সুযোগ এখনো বিদ্যমান, তারা রোজা না রেখে ফিদয়াহ দেবে। এক রোজার বদলে একজন মিসকীনকে (দরিদ্র মানুষকে) দু'বেলা খাদ্য দানকে ফিদয়াহ বলা হয়। আর রামাদ্বান মাসে সফরে থাকলে অথবা অসুস্থ হলে তখন রোজা না রেখে অন্য সময়ে এটা পূর্ণ করতে পারবে।

আরবী সনের ৯ম মাস রামাদ্বান। আমাদের সমাজে উর্দু উচ্চারণের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বলা হয় রমজান। সিয়াম পালন করতে হয় রামাদ্বান মাসে। মহান আল্লাহ তায়া'লা বলেছেন..

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (185)

রামাদ্বান মাস; যাতে মানুষের হেদায়াত, সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা ও ভালোমন্দ নির্ধারণের নীতিমালা দিয়ে নাযিল করা হয়েছে আল-ক্বুরআন। সুতরাং যে ব্যক্তি এ মাস পাবে সে অবশ্যই রোজা রাখবে। তবে কেউ অসুস্থ হলে বা সফরে থাকলে (এ রোজা ভঙ্গ করতে পারবে এবং) অন্যদিন এটা পূর্ণ করবে। আল্লাহ (তার বিধানকে) তোমাদের তরে সহজ করতে চান, কঠিন করতে চান না। (তিনি অসুস্থতায় বা সফর অবস্থায় রোজা না রেখে এ রোজা অন্য সময়ে রাখার সুযোগ দিচ্ছেন) যেন তোমরা (রোজার) সংখ্যা পূর্ণ করতে পার আর আল্লাহর মহত্ব বর্ণনা কর। কারণ তিনিই তোমাদেরকে হেদায়াত করেছেন। আর যেন তোমরা তার শোকর আদায় কর। (২ বাক্বারাহঃ ১৮৫) (অন্তরে নিয়ামতের গুরুত্ব অনুধাবন করে মুখে স্বীকৃতি দেয়া এবং বাস্তব জীবনে আল্লাহর বিধান মেনে নেয়ার নাম আল্লাহর শোকর আদায় করা।)

প্রাসঙ্গিক আলোচনাঃ সিয়াম, তারাবীহ, ই'তিকাফ ও লাইলাতু-ল-ক্বাদর

সাওম ও সিয়াম পরিচিতিঃ সাওম অর্থ সংযম, বিরতি আর সিয়াম অর্থ সংযম করা বা বিরত থাকা। ইসলামী শারীয়া'হ মতে "ফজরের সুচনা সময় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত খাদ্য, পানীয় ও যৌন সম্ভোগ থেকে বিরত থাকাকে বলা হয় সাওম পালন বা সিয়াম সাধন"। সিয়াম অবস্থায় এ তিনটি কাজের যে কোনো একটি করে ফেললে সাওম নষ্ট হয়ে যায় তথা রোজা ভঙ্গ হয়ে যায়। উল্লেখ্য আমাদের সমাজে সাওম পালন বা সিয়াম সাধনকে বলা হয় রোজা রাখা।

পরিচিতি পর্যালোচনা ও সাওম ভঙ্গের কারণ সমূহঃ

- ফজরের সুচনা সময় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সিয়াম পালন করতে হয়। রাতে সিয়াম পালন করলে হবে না।
- সিয়াম অবস্থায় খাদ্য থেকে বিরত থাকতে হয়। তাই সিয়াম অবস্থায় খাবার খেলে সিয়াম ভঙ্গ হয়ে যায়
- সিয়াম অবস্থান পানীয় থেকে বিরত থাকতে হয়। তাই সিয়াম অবস্থায় পান করলে সিয়াম ভঙ্গ হয়ে যায়
- সিয়াম অবস্থান যৌন সম্ভোগ থেকে বিরত থাকতে হয়। তাই সিয়াম অবস্থায় যৌন সঙ্গম করলে সিয়াম ভঙ্গ হয়ে যায়

সিয়ামের বিধানঃ ইসলামী শারীয়া'হ মতে রামাদ্বান মাসে সিয়াম সাধন করা বিবেকবান ও বালিগ প্রতিটি মুসলিম নর ও নারীর উপর ফরজ। সুতরাং..

- পাগল, বেহুশ বা মাতালের উপর সিয়াম ফরজ হয় না
- নাবালিগ শিশুর উপর সিয়াম ফরজ হয় না
- অমুসলিম ব্যক্তির উপর সিয়াম ফরজ হয় না।

রামাদ্বান পরিচিতিঃ চন্দ্র বছরের ৯ম মাসের নাম রামাদ্বান। আমাদের সমাজে উর্দু/ফার্সি উচ্চারণের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বলা হয় "রমযান বা রমজান"। রামাদ্বানসহ চন্দ্র মাসগুলো ২৯ বা ৩০ দিনে পূর্ণ হয়ে থাকে।

রামাদ্বান মাসের বৈশিষ্টঃ

- রামাদ্বান সিয়াম সাধনের মাস, সংযমের মাস, তাকওয়া অর্জনের মাস
- রামাদ্বান মাসে আল-কুরআন নাযিল করা হয়েছে, রামাদ্বান কুরআনের মাস
- রামাদ্বান মাসেই রয়েছে মহান আল্লাহর বিশেষ উপহার "লাইলাতু-ল-ক্বাদর" তাই রামাদ্বান হচ্ছে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বুনাস পাওয়ার মাস। লাইলাতু-ল-ক্বাদরকে আমাদের সমাজে বলা হয় "শবে কদর"। শবে কদর উর্দু ও ফার্সি ভাষার শব্দ।

সাওম পালনের লক্ষ্যঃ

- আল্লাহর আদেশ পালন করা তথা আল্লাহর ইবাদাত করা
- আল্লাহর তাকওয়া অর্জন করা। (উল্লেখ্য আল্লাহর ভয়ে যাবতীয় কুফর, শিরক ও পাপাচার থেকে বেঁচে থাকাকে তাকওয়া বলে।)

সাওম পালনের শিক্ষাঃ সাওম পালনের মাধ্যমে আমরা বেশ কয়েকটি বাস্তব শিক্ষা অর্জন করে থাকি। এরমাঝে নিজেদের প্রবৃত্তি এবং লোভ-লালসা ও কামনা-বাসনার উপর নিয়ন্ত্রণের বাস্তব প্রশিক্ষণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যেমন..

- সাওম অবস্থায় আমরা সকল প্রকার খাদ্য বর্জন করি। তাই এ শিক্ষা কাজে লাগিয়ে রামাদ্বানের পরও সকল প্রকার হারাম খাদ্য বর্জন করতে হবে।
- সাওম অবস্থায় আমরা সকল প্রকার পানীয় বর্জন করি। তাই এ শিক্ষা কাজে লাগিয়ে রামাদ্বানের পরও সকল প্রকার হারাম পানীয় বর্জন করতে হবে।
- সাওম অবস্থায় আমরা যৌন সম্ভোগ বর্জন করি। তাই এ শিক্ষা কাজে লাগিয়ে রামাদ্বানের পরও সকল প্রকার হারাম যৌনাচার বর্জন করতে হবে।
- সুতরাং আমাদের লোভ-লালাসা, কামনা-বাসনা এবং প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রের এক বাস্তব অনুশীলনী হচ্ছে সিয়াম সাধন। আর এ শিক্ষাকে কাজে লাগাতে পারলে সারাটি বছর আমরা অনেক পাপ ও পাপাচার থেকে বাঁচতে পারব, ইন শা-আল্লাহ।

এবার আসুন! সিয়াম সাধন বা রোজা পালন সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় কিছু বিধিবিধান জেনে নেই..

অবস্থা	বর্ণনা	বিধান/মন্তব্য	করণীয়
অস্বীকার, অবজ্ঞা বা ঐচ্ছিক মনে করা	যে মুসলিম রামাদ্বান মাসের সিয়াম পালনে অস্বিকৃতি ব্যক্ত করল /রামাদ্বানের সিয়ামকে অবজ্ঞা বা অবহেলা করল /রামাদ্বানের সিয়ামকে ঐচ্ছিক মনে করল..	তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে গেলো	তাওবাহ করে ঈমানকে নবায়ন করতে হবে। নতুবা সে মুনাফিক হয়ে চির জাহান্নামী হয়ে যাবে।

না রাখা	যে ব্যক্তি তার উপর ফরজ হওয়া সত্বেও রামাদ্বান মাসের সিয়াম পালন করল না..	সে মহাপাপ করল	এ জন্য তাওবাহ ও ইস্তিগফার করতে হবে এবং এ রোজাগুলো পূর্ণ করতে হবে
রোগী ব্যক্তি	যে মুসলিম রামাদ্বান মাসে রোগাক্রান্ত হয়ে গেলো	সে রোজা না রাখলেও হবে	পরে এসব রোজা পূর্ণ করবে
মুসাফির	যে ব্যক্তি রামাদ্বান মাসে মুসাফির হয়ে গেলো	সে রোজা না রাখলেও হবে	পরে এসব রোজা পূর্ণ করবে
অতি বৃদ্ধ	কোনো ব্যক্তি যদি বার্ধক্যজনিত অতি দুর্বলতার কারণে রোজা রাখতে অক্ষম হয়ে যায় অথবা রোজা রাখলে তার মৃত্যু ঝুঁকি বা স্বাস্থ্য ঝুঁকি বেড়ে যায় তবে সে..	রোজা রাখবে না	রোজার বদলে ফিদয়াহ দেবে। উল্লেখ্য প্রতিটি রোজার বদলে একজন মিসকিনকে দু-বেলা খাদ্য দানকে ফিদয়াহ বলা হয়।
স্থায়ী রোগী	যে রোগী রোজা রাখলে মৃত্যু ঝুঁকি বা স্বাস্থ্য ঝুঁকি বেড়ে যায় এবং এ থেকে আরোগ্য হবার সম্ভাবনা ক্ষীণ থাকে এমন ব্যক্তি..	রোজা রাখবে না	রোজার বদলে ফিদয়াহ দেবে।
গর্ভবতী	রোজা রাখলে যদি নিজের বা আগত সন্তানের স্বাস্থ্য ঝুঁকি হয় তবে..	রোজা রাখবে না	ওই রোজা পরে পূর্ণ করবে
	আগত সন্তানের স্বাস্থ ঝুঁকি না থাকলে..	রোজা না রাখা অনুমোদিত	না রাখলে পরে পূর্ণ করবে
নিফাস	সন্তান জন্ম দেওয়ার পর মায়ের জড়ায়ু থেকে নির্গত রক্তস্রাবকে নিফাস বলে। নিফাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর অন্য কোনো অসুবিধান না থাকলে..	রোজা রাখবে	যদি নিফাসের দিন (হানাফী মতে ৪০ আর মালিকী মতে ৬০ দিন) পার হয়ে যায় এবং তথাপিও স্রাব বন্ধ না হয় তবে হিসাব মিলিয়ে দেখবে এটা হাইদ্ব তথা নিয়মিক ঋতুস্রাব কি না? নিয়মিত স্রাব হলে সালাত ও সিয়াম দুটু থেকেই বিরত থাকবে আর নিয়মিত ঋতুস্রাব না হলে সালাত ও সিয়াম দুটুই পালন করবে।
ধাত্রী মা	শিশুর বয়স ৬ মাসের কম হলে এবং মায়ের দুধ ব্যতীত অন্য খাবার না খেলে ওই মা..	রোজা রাখবে না	ওই রোজা পরে পূর্ণ করবে
	৬ মাসের কম বয়সী শিশু যদি মায়ের দুধ ছাড়াও বাজারের দুধে অভ্যস্ত থাকে তবুও ওই মায়ের জন্য..	রোজা না রাখার অনুমতি আছে	না রাখলে ওই রোজা পরে পূর্ণ করবে
	শিশুর বয়স যদি ৬ মাসের বেশী হয় এবং মায়ে রোজা রাখলে যদি শিশুর স্বাস্থ্য সমস্যার সম্ভাবনা থাকে তবে ওই মা..	রোজা রাখবে না	ওই রোজা পরে পূর্ণ করবে
	শিশুর বয়স যদি ৬ মাসের বেশী হয় এবং মায়ে রোজা রাখলে যদি শিশুর স্বাস্থ্য ঝুঁকি না থাকে তবে ওই মা..	রোজা রাখবে	
হঠাৎ অসুস্থ	রোজা অবস্থায় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে স্বাস্থ্য ঝুঁকি দেখা দিলে	রোজা ভেঙ্গে ফেলবে	ওই রোজা পরে পূর্ণ করবে
খাদ্য বা পানীয়	রোজার কথা ভুলে গিয়ে কোনোকিছু খেয়ে ফেললে বা পান করলে	রোজা নষ্ট হবে না	রোজা অব্যাহত রাখবে
	কোনো প্রকার খাদ্য দ্রব্য বা পানীয় মুখে দিলে (যদি গলার ভিতরে না যায়)	রোজা নষ্ট হবে না	রোজা অব্যাহত রাখবে
	কোনো প্রকার খাদ্য বা পানীয় মুখে দেওয়ার পর যদি গলার ভিতরে চলে যায়	রোজা নষ্ট হয়ে যাবে	ওই রোজা পরে পূর্ণ করবে
	সাধারণভাবে কোনো খাদ্য বা পানীয় গিলে ফেললে	রোজা নষ্ট হয়ে যাবে	ওই রোজা পরে পূর্ণ করবে
	অযু, গোসল বা কুল্লি করার সময় অসাবধানতা বশত গলার ভিতর পানি চলে গেলে (এটাকে "খাত্বা" বলা হয়) অনেকের মতে এমন "খাত্বা"র কারণে রোজা নষ্ট হবে না। আর কারো কারো মতে নষ্ট হয়ে যাবে।	দ্বিমত রয়েছে	
লবণ টেষ্ট	খাদ্যে লবণ টেষ্ট বা স্বাদ টেষ্ট করলে যদি গলার ভিতর না যায়	রোজা নষ্ট হবে না	রোজা অব্যাহত রাখবে
যৌন সঙ্গম	রোজা অবস্থায় ইচ্ছাকৃত ভাবে যৌন সঙ্গম করলে (রামাদ্বানের রাতে স্ত্রীসহবাস বৈধ আছে। দেখুন বাক্বারাহঃ ১৮৭)	রোজা ভেঙ্গে যাবে	এজন্য কাফফারাহ দিতে হবে (১টি রোজার বদলে ৬০টি রোজা রাখা অথবা ৬০ জন মিসকিনকে দু-বেলা খাদ্য দানকে রোজার কাফফারাহ বলে)

	রোজা অবস্থায় ধর্ষণের বা জোর পূর্বক সঙ্গমের স্বীকার হলে	রোজা ভেঙ্গে যাবে	যে ধর্ষণ করেছে বা জোর পূর্বক সঙ্গম করেছে সে কাফফারাহ দেবে, অন্যজন শুধু কাজা আদায় করবে
ইচ্ছাকৃত পানাহার	রোজা অবস্থায় ইচ্ছাকৃত ভাবে পানাহার করা মহাপাপ। এমন করলে	রোজা নষ্ট হয়ে যাবে	এ জন্য তাওবাহ ও ইস্তিগফার করতে হবে এবং ওই রোজা পূর্ণ করতে হবে। (হানাফী ফিক্বহ মতে কাজা ও কাফফারাহ দুটুই আদায় করবে আর অন্য ফিক্বহ মতে শুধু কাজা করবে)
বীর্যপাত	কোনো পুরুষ বা নারী রোজা অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে নিজে নিজে বীর্যপাত ঘটালে	রোজা নষ্ট হয়ে যাবে	পরে ওই রোজা পূর্ণ করবে। (এমন করা পাপ কাজ। তাই সাবধান থাকবে)
	রোজা অবস্থায় পুরুষ বা নারীর যদি স্বপ্নদোষ হয়ে বীর্যপাত হয়ে যায় তবে..	রোজা নষ্ট হবে না	রোজা অব্যাহত রাখবে
কল্পনা	রোজা অবস্থায় সঙ্গী বা সঙ্গিনীর কথা কল্পনা করে বীর্যপাত হলে	রোজা নষ্ট হবে না	রোজা অব্যাহত রাখবে (কাজটি মোটেই উচিত নয়। তাই এ ব্যাপারে অতি সতর্ক থাকতে হবে)
স্পর্শ, চুম্বন বা আলিঙ্গন	রোজা অবস্থায় স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে স্পর্শ, চুম্বন বা আলিঙ্গন করলে	রোজা নষ্ট হবে না	রোজা অব্যাহত রাখবে
রক্ত পরীক্ষা	রোজা অবস্থায় রক্ত পরীক্ষা করলে	রোজা নষ্ট হবে না	রোজা অব্যাহত রাখবে
ইনজেকশন	রোজা অবস্থায় মাংসপেশী বা রগের ভিতর ইনজেকশন বা পেটের চামড়ায় ইন্সুলিন নিলে	রোজা নষ্ট হবে না	রোজা অব্যাহত রাখবে
ঔষধ	রোজা অবস্থায় শরীরের বাইরের অংশের কাটা, ঘা অথবা আঘাতে ঔষধ লাগালে	রোজা নষ্ট হবে না	রোজা অব্যাহত রাখবে
	রোজা অবস্থায় পেট বা মাথার ভিতরে ঔষধ চলে গেলে	রোজা নষ্ট হয়ে যাবে	ওই রোজা পরে পূর্ণ করবে
	রোজা অবস্থায় যোনি পথে বা পায়খানার রাস্তার ভিতরে ক্রিম, মলম বা অন্য ঔষধ লাগালে	রোজা ভঙ্গ হবে না	করণ এসব বস্তু খাদ্যদ্রব্য নয় এবং খাদ্যনালী বা খাদ্য থলিতে যায় না
চুখের ড্রপ	ড্রপের স্বাদ গলার ভিতরে অনুভূত না হলে সর্বসম্মত মতে	রোজা নষ্ট হবে না	রোজা অব্যাহত রাখবে
	ড্রপের স্বাদ গলার ভিতর অনুভূত হলে.. (আবু-হানীফাহ, ইবনু তাইমিয়্যাহ, বিন বায, উছাইমিনসহ অনেকের মতে রোজা নষ্ট হবে না। আর মালিকী ও হাম্বলী আলিমদের মতে রোজা নষ্ট হয়ে যাবে।)	দ্বিমত রয়েছে	রোজা অব্যাহত রাখবে /পরে পূর্ণ করবে। (বিন বায বলেছেন দ্বিমত থেকে বাঁচার জন্য ওই রোজা পরে পূর্ণ করা উত্তম)
কানের ড্রপ	চুখের ড্রপের সমান বিধান	সমান বিধান	সমান বিধান
নাকের ড্রপ	চুখ ও কানের ড্রপের সমান বিধান	সমান বিধান	সমান বিধান
ঋতুস্রাব	রোজা অবস্থায় হাইদ্ব (নিয়মিত ঋতুস্রাব) শুরু হলে	রোজা নষ্ট হয়ে যাবে	স্বাভাবিক ভাবে পানাহার করতে পারবে এবং ওই রোজা পরে পূর্ণ করবে
	রোজা অবস্থায় ইস্তিহাদ্বা (অনিয়মিত বা অস্বাভাবিক স্রাব) শুরু হলে (নিয়মিত স্রাব হচ্ছেঃ হানাফী মতে ৩-১০ দিন (কমপক্ষে ২ সপ্তাহ পরপর) আর মালিকী মতে ০-১৫ দিন এবং শাফিয়ী মতে ১-১৫ দিন। এ ছাড়া অন্য স্রাব হচ্ছে ইস্তিহাদ্বা বা অস্বাভাবিক স্রাব)	রোজা নষ্ট হবে না	রোজা অব্যাহত রাখবে। (এ অবস্থায় নিয়মিত সালাত আদায় করবে, রোজা রাখবে এবং স্বামী সহবাস করতে পারবে)
রক্ত	শরীরের বাইরের অংশ থেকে রক্ত বের হলে	রোজা নষ্ট হবে না	রোজা অব্যাহত রাখবে
	শরীর থেকে রক্ত বের হয়ে অতি দুর্বল হয়ে স্বাস্থ্য ঝুঁকি দেখা দিলে	রোজা ভেঙ্গে ফেলবে	ওই রোজা পরে পূর্ণ করবে
	মুখের ভিতর থেকে রক্ত বের হয়ে গলার ভিতর না গেলে	রোজা নষ্ট হবে না	রোজা অব্যাহত রাখবে
	মুখের ভিতর থেকে রক্ত বের হয়ে গলার ভিতরে চলে গেলে কারো মতে রোজা নষ্ট হয়ে যাবে আর কারো মতে হবে না	দ্বিমত রয়েছে	রোজা অব্যাহত রাখবে /ওই রোজা পরে পূর্ণ করবে
বমি	অনিচ্ছাকৃত বমি হলে	রোজা নষ্ট হবে না	রোজা অব্যাহত রাখবে
	ইচ্ছাকৃত বমি করলে	রোজা নষ্ট হয়ে যাবে	ওই রোজা পরে পূর্ণ করবে
দাঁত মাজন	মিছওয়াক, টুথপেস্ট, মাজন বা ছাই দিয়ে দাঁত মাজলে ওইসব দ্রব্য যদি গলার ভিতরে না যায়	রোজা নষ্ট হবে না	রোজা অব্যাহত রাখবে
	ওইসব দ্রব্য যদি গলার ভিতরে চলে যায়	রোজা নষ্ট হয়ে যাবে	ওই রোজা পরে পূর্ণ করবে
রূপ চর্চা	সাবান, শাওয়ার বা বাথ লিকুইড অথবা শ্যাম্পু/কন্ডিশনার দিয়ে গোসল করলে	রোজা নষ্ট হবে না	রোজা অব্যাহত রাখবে
	তেল, ক্রিম, ভ্যাসলিন বা লোসন ব্যবহার করলে	**রোজা নষ্ট হবে না**	রোজা অব্যাহত রাখবে

	মেকআপ, লিপিষ্টিক বা এমনকিছু ব্যবহার করলে	রোজা নষ্ট হবে না	রোজা অব্যাহত রাখবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সুহূরঃ মূল আরবী শব্দ "সাহার" অর্থ রাতের শেষ অংশ। সে মতে রাতের শেষ প্রহরের পানাহারকে বলা হয় "সুহূর" আর আমাদের সমাজে উর্দু/ফার্সির সাথে সামঞ্জস্য রেখে বলা হয় "সেহরি"। সিয়ামের জন্য সুহূর বা সেহরি খাওয়া আবশ্যক নয় তবে উত্তম। সুহূর নবী সা.র সুন্নাহ। নবী সা. নিজে সুহূর করতেন এবং আমাদেরকে এ ব্যাপারে উৎসাহ দিয়েছেন। বর্ণিত আছে..

عن أنس قال :قال رسول الله ﷺتسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه

আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেনঃ তোমরা সুহূর খাও। কারণ অবশ্যই তাতে বারাকাহ বিদ্যমান। (বুখারী ও মুসলিম)

উল্লেখ্য সুহূর নির্ধারিত কোনো খাবারের নাম নয়। মানুষ তার অভ্যাস ও চাহিদা মত শেষরাতে যে খাবার গ্রহণ করবে এটাই সুহূর।

বিঃ দ্রঃ = উপরে উল্লেখিত হাদীছটি অনেক মজবুত এবং হাদীছে বর্ণিত শব্দটি আদেশসূচক কিন্তু তবুও সুহূর বা শেষরাতের খাবার ফরজ বা ওয়াজিব হয়নি এবং এ ব্যাপারে সকল ইমামগণ একমত, কোনো ইমামই সুহূরকে ফরজ বলেননি। কারণ নবী সা. কিছু বললেই ফরজ বা হারাম হয়ে যায় না। ফরজ বা হারাম হতে হলে আরো অনেক নিয়মনীতি রয়েছে। নবী সা. উত্তম বুঝানোর জন্য বা বৈধ বুঝানোর জন্য অথবা অন্য কারণেও অনেক কথা বলেছেন। এমনকি পবিত্র কুরআনেও অনেক আয়াত এমন আছে যাতে আদেশসূচক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে কিন্তু বিষয়টি ফরজ হয়নি। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে হলে আমাদের এ কোর্সের সূচনাতে "ফরজ অধ্যায়টি" দেখে নিন।

সুহূরের সময়ঃ মধ্যরাতের পর থেকে ফরজের সূচনা সময় পর্যন্ত সুহূর খাওয়ার সময়। বর্ণিত হচ্ছে..

عَنْ عبدالله بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺقَالَ :لاَ يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَوْ أَحَدًا مِنْكُمْ أَذَانُ بِلاَلٍ مِنْ سَحُورِهِ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ أَوْ يُنَادِي بِلَيْلٍ لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ، وَلِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ، وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ الفَجْرُ أَوِ الصُّبْحُ

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, নবী সা. বলেছেনঃ (শুনো!) বিলালের আযান যেন তোমাদের কাউকে সুহূর থেকে বিরত রাখতে না পারে। কারণ তোমাদের যারা ইবাদাতে মশগুল থাকো তাদেরকে (সকালের আগমনের ব্যাপারে) সাবধান করতে আর ঘুমন্তদের জাগ্রত করতে সে রাতে আযান দেয়। তার আযান মানে এই নয় যে ফজর হয়েগেছে বা সকাল হয়েগেছে। (বুখারীঃ ৬২১)

عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺأَنَّهُ قَالَ :إِنَّ بِلاَلًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ

আ'ইশাহ রা. থেকে বর্ণিত, নবী সা. বলেছেনঃ বিলাল রাতে আযান দেয় সুতরাং উম্মু মাকতূমের ছেলে আযান দেওয়া পর্যন্ত তোমরা পানাহার করবে। (বুখারীঃ ৮২২)

উল্লেখ্য রাসূল সা.র সময়ে ঘড়ি ছিল না। তাই পূর্ব আকাশ ফর্শা হয়ে সুবহে সাদিক উন্মুক্তভাবে ফুটে উঠলে তখন আযান দেওয়া হত। এ ছাড়াও উম্মু মাকতূমের ছেলে আব্দুল্লাহ অন্ধ ছিলেন। তিনি দেখতে পেতেন না। অন্যরা যখন বলতঃ "সকাল হয়েগেছে, আযান দেন" তখন উনি আযান দিতেন।

আযান শুরু হলেও হাতের খাবার ফেলতে হবে না বরং খেয়ে নিতে পারবে। বর্ণিত হচ্ছে..

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه **قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمْ النِّدَاءَ وَالإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلا يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ** .رواه أحمد (10251)وأبو داود (2350)وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

আবু-হুরাইরাহ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেনঃ তোমরা যখন (ফজরের) আযান শুনবে তখন খাবারের পাত্র হাতে থাকলে এটা রেখে দেবে না বরং প্রয়োজন পূর্ণ করে (খেয়ে) ফেলবে (আহমাদঃ ১০২৫১, আবু-দাউদঃ ২৩৫০ শাইখ আলবানীর তাহকীক মতেও হাদীছটি সাহীহ)

হুঁশিয়ারিঃ সূরাহ বাক্বারাহর ১৮৭তম আয়াতে বলা হয়েছে ফজরের সাদা রং ফুটে উঠা পর্যন্ত পানাহার করবে। কিন্তু অত্যান্ত দুঃখের সহিত বলতে হচ্ছে আমাদের সমাজে অনেক ক্যালেন্ডারে ফজরের ১০মিনিট আগে "সেহরির শেষ সময়" নির্ধারণ করে দেওয়া হয় এবং মাইকে ঘোষণা করা হয় "ফজরের আর মাত্র ১০ মিনিট বাকী আছে, খানা পিনা বন্ধ করুন"। আসলে এমন না করে যদি লিখে দেওয়া হত "সতর্কতার জন্য ফজরের ১০মিনিট আগে পানাহার বন্ধ করা উচিত" তবে উত্তম হত।

ইফতারঃ মূল শব্দ "ফাত্বারা" অর্থ ভেঙ্গে ফেলা। এর থেকে সকালের নাস্তাকে বলা হয় "ফুত্বূর" অর্থ আজকের উপবাস ভেঙ্গে ফেলা। এমন অর্থ বুঝাতে ইংলিশেও বলা হয় "ব্রেকফাস্ট" মানে আজকের উপবাস ভেঙ্গে ফেলা। আর এর থেকেই বলা হয় "ইফত্বার" মানে সাওম বা রোজা ভেঙ্গে ফেলা।

সারাদিন সিয়াম সাধনের পর যখন সূর্য অস্ত যায় তখন সাওম ভঙ্গ করতে যে খাদ্য খাওয়া হয় বা পানীয় পান করা হয় এরই নাম "ইফত্বার"। ইফতার নির্ধারিত কোনো খাবারের নাম নয়। মানুষ তার অভ্যাস ও চাহিদা মত যে খাদ্য বা পানীয় দ্বারা সাওম ভঙ্গ করবে এটাই তার ইফতার। তবে ইফতারে সর্বপ্রথম খেজুর বা পানী গ্রহণ করা উত্তম। এ ব্যাপারে অনেক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। আর ইফতারে দেরী না করে সূর্য অস্ত যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইফতার করে নেওয়া উচিত। ইফতারে দেরী করা নিন্দনীয় কাজ। বর্ণিত হচ্ছে..

عَنْ سَهْلِ بنِ سَعْدٍ أَنَّ رسُولَ اللَّهِ ﷺقَالَ :لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجلوا الفِطْرَ. متفقٌ عَلَيْهِ.

সাহল বিন সা'দ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেনঃ মানুষ ততদিন "খাইর" (কল্যাণ বা ইসলাম) এর উপর বিদ্যমান থাকবে যতদিন তারা ইফতারে বিলম্ব না করবে। (বুখারী ও মুসলিম)

হুঁশিয়ারিঃ কিন্তু দুঃখের বিষয় এতো মজবুত হাদীছ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও আমাদের সমাজের অনেক ক্যালেন্ডারেও সূর্যাস্তের ৫-১০ মিনিট পরে ইফতারের সময় লিখে আনুষ্ঠানিকভাবে ইফতারে দেরী করে নবী সা.র হাদীছ ও সুন্নাহকে অবজ্ঞা করা হয় যা সমাজ ও জাতিকে অকল্যাণের দিকে ঠেলে দেওয়ারই নামান্তর।

ইফতারের দোয়াঃ যে খাবার বা পানীয় দ্বারা সিয়াম ভঙ্গ করা হয় এরই নাম ইফতার। ইফতার স্বাভাবিক খাবারের মতই। তাই অন্যান্য খাবারের মত বিসমিল্লাহ বলে ইফতার শুরু করবে, ইফতারের পর আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং ছাওয়াবের আশা ব্যক্ত করে রাসূল সা. বলতেন..

عن ابن عمر قال :كان رسول الله ﷺ إذا أفطر قال :ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله

ইবন উ'মার রা. বলেনঃ রাসূল সা. যখন ইফতার করতেন তখন বলতেনঃ তৃষ্ণা নিবারণ হয়েছে, রগসমূহ সতেজ হয়েছে এবং ইন শা-আল্লাহ, ছাওয়াবও অবধারিত হয়ে গেছে। (আবু-দাউদঃ হাসান)

ক্বিয়ামু-ল-লাইলঃ পরিচিতিঃ "ক্বিয়ামু-ল-লাইল" শব্দের অর্থ রাতে দাড়ানো। রাসূল সা. এবং সাহাবাগণ রাতে ঘুম থেকে জেগে নফল ইবাদাত করতেন, বিশেষ করে নফল সালাত আদায় করতেন। উনাদের সময়ে এসব নফল ইবাদাত এবং সালাত আদায়কে "ক্বিয়ামু-ল-লাইল" বলা হত। আমাদের সমাজে প্রচলিত তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ সবই তখনকার ক্বিয়ামু-ল-লাইল।

ক্বিয়ামু-ল-লাইল শুধু রামাদ্বানের বৈশিষ্ট নয়। রাসূল সা. এবং সাহাবাগণ সারা বছরই (যার যতটুকু খুশী ব্যক্তিগতভাবে) ক্বিয়ামু-ল-লাইল করতেন। যে রাতে যার যতটুকু খুশী জেগে সালাত আদায় করতেন। এ জন্য লোক ডেকে জমায়েত করা হত না বা জামায়াতের ব্যবস্থা করা হত না। রামাদ্বান বা রামাদ্বান ছাড়া কোনো সময়েই ক্বিয়ামু-ল-লাইলের জন্য সালাতের সংখ্যা বা সময়ের পরিমাণ নির্ধারিত ছিল না। রাসূল সা. রামাদ্বান এবং রামাদ্বান ছাড়া অন্য সকল মাসে সমপরিমাণে সালাত আদায় করতেন। রামাদ্বান উপলক্ষে তিনি সালাতের রাকায়াত বাড়াতেন না। বর্ণিত হচ্ছে..

روى البخاري (3569)، ومسلم (738)عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، **أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ** رضي الله عنها **كَيْفَ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُولِ اللَّهِ** صلى الله عليه وسلم **فِي رَمَضَانَ ؟ قَالَتْ مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلاَ فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاَثًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ قَالَ تَنَامُ عَيْنِي وَلاَ يَنَامُ قَلْبِي**

আবু-সালামাহ বিন আব্দুর রাহমান একদা আ'ইশাহ রা.কে জিজ্ঞেস করলেনঃ রামাদ্বান মাসে রাসূল সা.র সালাত কেমন ছিল? আ'ইশাহ রা. বললেনঃ রামাদ্বান ও রামাদ্বান ছাড়া অন্য সময়েও রাসূল সা. ১১ রাকায়াতের চেয়ে বাড়াতেন না। (প্রথমে) ৪ রাকায়াত পড়তেন, এ ৪ রাকায়াত এতো সুন্দর ও সুদীর্ঘ হত যে এ সম্পর্কে বলার অবকাশ রাখে না। অতঃপর আরো ৪ রাকায়াত পড়তেন, এ ৪ রাকায়াত এতো সুন্দর ও সুদীর্ঘ হত যে এ সম্পর্কেও বলার অবকাশ রাখে না। তারপর (একটু আরাম করতেন এবং) ৩ রাকায়াত (বিতির) পড়তেন। একদা আমি বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! বিতিরের আগে আপনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন! তিনি বললেনঃ আমার চুখ ঘুমায়, আমার অন্তর ঘুমায় না। (বুখারীঃ ৩৫৬৯, মুসলিমঃ ৭৩৮)

পর্যালোচনাঃ উল্লেখিত হাদীছ থেকে জানা যায় রাসূল সা. রামাদ্বান এবং রামাদ্বান ছাড়া অন্য মাসেও তথা সারা বছরই ক্বিয়ামু-ল-লাইল হিসেবে সর্বোচ্চ ১১ রাকায়াত সালাত আদায় করতেন। এরমাঝে ৮ রাকায়াত সাধারণ সালাত আর ৩ রাকায়াত বিতির।
বর্তমানে আমাদের সমাজের এক শ্রেণীর মানুষ এ হাদীছ দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন; তারাবীহ ৮ রাকায়াত। আসলে এ হাদীছ দ্বারা এমন কথা প্রমান হয় না। কারণ এখানে রামাদ্বান ও রামাদ্বান ছাড়া অন্য মাসের কথাও বলা হয়েছে। আর তারাবীহ শুধু রামাদ্বান মাসে হয়, অন্য মাসে নয়।

বিঃ দ্রঃ = রাসূল সা. সারা বছর ক্বিয়ামু-ল-লাইল করলেও রামাদ্বান মাসের ক্বিয়ামু-ল-লাইলে (রাকায়াত না বাড়িয়ে) সালাতকে অনেক বেশী সুন্দর ও সুদীর্ঘ করে পড়তেন। বর্ণিত হচ্ছে..

عن عائشة رضي الله عنها قالت :كان رسول الله ﷺ يَجْتَهِدُ في رمضان ما لا يَجْتَهِدُ في غيره وفي العَشْرِ الأَوَاخِرِ منه ما لا يَجْتَهِدُ في غيره.

আ'ইশাহ রা. বলেনঃ রাসূল সা. রামাদ্বানে (ক্বিয়ামু-ল-লাইলে) এতো বেশী মেহনত করতেন যা অন্য সময়ে করতেন না আর রামাদ্বানের শেষ দশকে এতো বেশী মেহনত করতেন যত মেহনত অন্য সময়ে করতেন না। (মুসলিম)

ক্বিয়ামু-ল-লাইলে জামায়াতঃ রাসূল সা.র ঘরে ড্রয়িং রোম বা অতিরিক্ত কক্ষ ছিল না, শুধু উনার একেকজন স্ত্রীর জন্য একেকটি বেড রোম ছিল আর এ সকল রোমের একটিমাত্র দরজা ছিল যা মসজিদের ভিতর দিয়ে খোলত। তাই রাসূল সা. রাতে নফল সালাতের জন্য মাঝে মাঝে মসজিদে চলে আসতেন। নবী সা.র মসজিদে অনেক সাহাবাগণ বসবাস করতেন যাদেরকে আসহাবে সুফফাহ বা সুফফাবাসী বলা হয়।

একদা রামাদ্বানের রাতে রাসূল সা. মসজিদে একাকী সালাতরত ছিলেন। তখন কয়েকজন সাহাবী এসে উনার পিছনে দাঁড়িয়ে যান এবং এভাবে জামায়াত তৈরি হয়ে যায়, পরদিন আরো কিছুলোক এসে জামায়াতে শরীক হন। আর এ সংবাদ ছড়িয়ে পরলে ৩য়/৪র্থ দিন অনেক লোক এসে মসজিদে জড় হন কিন্তু রাসূল সা. কক্ষ থেকে বের হয়ে আসেননি। বর্ণিত হচ্ছে..

ففي صحيح مسلم عن عائشة قالت :صلى النبي ﷺ في المسجد ذات ليلة، فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة وكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أوالرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله ﷺ فلما أصبح قال :قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أنني خشيت أن تفرض عليكم .وذلك في رمضان.

আ'ইশাহ রা. বলেনঃ রাসূল সা. একদা রাতে মসজিদে সালাত আদায় করছিলেন, তখন কিছু মানুষ এসে উনার সালাতে শরীক হয়ে যায়। পরদিনও তিনি সালাত আদায় করলেন এবং এদিন আরো বেশী লোক এসে তার সালাতে শরীক হল। অতঃপর ৩য় বা ৪র্থ রাতে অনেক লোক (মসজিদে) জড় হল কিন্তু রাসূল সা. (ঘর থেকে) বের হলেন না। পরদিন সকালে তিনি বললেনঃ (গতরাতে) তোমরা যা করেছো আমি দেখেছি। কিন্তু আমি বের হয়ে আসিনি, আমি আশঙ্কা করেছি তোমাদের উপর না ফরজ হয়ে যায়। আর এটা ছিল রামাদ্বান মাস। (মুসলিম)

সাহাবাগণ ঘরে পরিবারের লোকজনকে নিয়ে জামায়াত করতেন বলে বর্ণনা পাওয়া যায়। কিছু লোক মসজিদে এসেও একা একা সালাত পড়তেন। পরে উমার রা.র খিলাফাতকালে একদা রাতে টহল দিতে এসে তিনি দেখেন লোকজন মসজিদে একা একা ক্বিয়ামু-ল-লাইল করছে। তিনি তাদেরকে একজন ইমামের পিছনে জড় করে দেন। বর্নিত হয়েছে..

خَرَجْتُ مع عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه **لَيْلَةً في رَمَضَانَ إلى المَسْجِدِ، فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ؛ يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ، ويُصَلِّي الرَّجُلُ فيُصَلِّي بصَلَاتِهِ الرَّهْطُ، فَقَالَ عُمَرُ إنِّي أرَى لو جَمَعْتُ هَؤُلَاءِ علَى قَارِئٍ واحِدٍ، لَكانَ أمْثَلَ .ثُمَّ عَزَمَ، فَجَمعهُمْ علَى أُبَيِّ بنِ كَعْبٍ، ثُمَّ خَرَجْتُ معهُ لَيْلَةً أُخْرَى والنَّاسُ يُصَلُّونَ بصَلَاةِ قَارِئِهِمْ، قَالَ عُمَرُ :نِعْمَ البِدْعَةُ هذِه، والَّتي يَنَامُونَ عَنْهَا أفْضَلُ مِنَ الَّتي يَقُومُونَ .يُرِيدُ آخِرَ اللَّيْلِ، وكانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أوَّلَهُ.**

الراوي :عبدالرحمن بن عبد القاري | المحدث :البخاري | المصدر :صحيح البخاري الصفحة أو الرقم | 2010 :خلاصة حكم المحدث] :صحيح[

(প্রসিদ্ধ তাবেয়ী) আব্দুর রাহমান বিন আব্দুল ক্বারী বলেনঃ (উ'মার রা.র খিলাফাতকালে) একদা রামাদ্বানের রাতে আমি উ'মার রা.র সাথে বের হয়ে মসজিদে (নববীতে) আসলাম। দেখলাম লোকজন বিচ্ছিন্ন, কেউ একা সালাত আদায় করছে, কারো সাথে কয়েকজন শরীক হয়েছে (ছোট ছোট জামায়াত হয়ে গেছে।)

তখন উ'মার বললেনঃ আমি যদি এদেরকে একজন ক্বারীর পিছনে একত্রিত করে দেই তবে মনে হয় ভালো হবে। অতঃপর তিনি তাই করলেন। সবাইকে উবাই বিন কায়াবের পিছনে একত্রিত করে দিলেন। (তখন থেকে জামায়াতে ক্বিয়ামু-ল-লাইলের প্রচলন হয়ে গেল।) অতঃপর আরেক রাতে আমি উ'মার রা.র সঙ্গে বের হলাম। লোকজন তখন তাদের ক্বারীর পিছনে সালাত আদায় করছিল। (এমন দৃশ্য দেখে) উ'মার রা. বললেনঃ কী সুন্দর বিদয়া'ত এটি। তবে যারা (এ সালাতে শামিল না হয়ে) ঘুমিয়ে আছে তারা এদের চেয়ে উত্তম যারা এখানে সালাত আদায় করছে। লোকজন সাধারণত রাতের প্রথম দিকে সালাত আদায় করত। (বুখারী)

কিন্তু কয়েকদিন সালাত আদাতের পর ওই ইমাম সাহেব আর আসেননি। পরে লোকজন নিজেদের ইমাম ঠিক করে সালাত অব্যাহত রাখেন। এরপর থেকে ক্বিয়ামু-ল-লাইলে ব্যাপকভাবে জামায়াতের প্রচলন শুরু হয়। আর পরবর্তীতে রাসূল সা. ও সাহাবাদের সমাজের পরিভাষা "ক্বিয়ামু-ল-লাইল" থেকে সরে এসে রামাদ্বানের সালাতকে তারাবীহ নামে নতুন নাম করণ করা হয়।

তারাবীহ পরিচিতিঃ আমাদের সমাজে রামাদ্বান মাসে ইশা সালাতের পর অতিরিক্ত কিছু সালাত আদায় করা হয়। এ সালাত আমাদের কাছে তারাবীহ নামে খ্যাত। তারাবীহ শব্দের অর্থ বিশ্রাম করা। তখনকার দিনে রামাদ্বানের এ সালাতে প্রতি ৪ রাকায়াত পর পর বিশ্রাম নেওয়া হত বিধায় এ সালাত তারাবীহ নামে খ্যাত হয়ে যায়।

তারাবীহ সালাতের ইতিকথাঃ তারাবীহ নামে কোনো সালাতের কথা কুরআন বা হাদীছে উল্লেখ নেই। রাসূল সা. ও সাহাবাদের সমাজে ক্বিয়ামু-ল-লাইল নামে প্রচলিত সালাতই পরবর্তীতে রামাদ্বান মাসে তারাবীহ নামে পরিচিত হয়ে উঠে।

ক্বিয়ামু-ল-লাইল বা তারাবীহর রাকায়াতঃ ক্বিয়ামু-ল-লাইল বা তারাবীহ আসলে তাহাওয়্যু' তথা ঐচ্ছিক সালাত। আর ফরজ ছাড়া অন্য কোনো সালাতের জন্য রাকায়াত নির্ধারণ করা বা দাওয়াত দিয়ে লোক সমাগম করা উচিত নয়। যে যামানায় মসজিদে ক্বিয়ামু-ল-লাইল এর জামায়াত ব্যাপকভাবে বিস্তৃতি লাভ করে সে যামানায়ও এর রাকায়াত নির্ধারিত ছিল না। বরং প্রতিটি মসজিদের স্থানীয় ইমামগণ উনাদের ইচ্ছামত রাকায়াতের সংখ্যা ঠিক করতেন। এ ব্যাপারে ইমাম ইবনু হাজার আসক্বালানী রাহি. বুখারীর প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যা গ্রন্থ "ফাতহু-ল-বারী"তে দলীল প্রমাণসহ কয়েকটি পরিসংখ্যান উল্লেখ করেছেন..

আর তা হল কোনো কোনো মসজিদে পড়া হত.. ৩ রাকায়াত বিতিরসহ ১১ রাকায়াত ৩ রাকায়াত বিতিরসহ ১৩ রাকায়াত ৩ রাকায়াত বিতিরসহ ২১ রাকায়াত ৩ রাকায়াত বিতিরসহ ২৩ রাকায়াত ৩ রাকায়াত বিতিরসহ ৩৯ রাকায়াত ৩ রাকায়াত বিতিরসহ ৪১ রাকায়াত ৩ রাকায়াত বিতিরসহ ৪৯ রাকায়াত (এভাবেই একেক মসজিদে একেক ভাবে সংখ্যা ঠিক করা হত)	أحصى الحافظ ابن حجر في الفتح الأقوال في ذلك مع ذكر الأدلة، وهي: .إحدى عشرة ركعة مع الوتر بثلاث ركعات .ثلاث عشرة ركعة مع الوتر بثلاث ركعات .إحدى وعشرون ركعة مع الوتر بثلاث ركعات ثلاث وعشرون ركعة مع الوتر بثلاث ركعات .تسع وثلاثون ركعة مع الوتر بثلاث ركعات .إحدى وأربعون ركعة مع الوتر بثلاث ركعات .تسع وأربعون ركعة مع الوتر بثلاث ركعات

আমাদের করনীয়ঃ আসলে আমাদের উচিত নবী যুগের পরিভাষা ক্বিয়ামু-ল-লাইলে ফিরে যাওয়া এবং এর রাকায়াত নিয়ে দলাদলি ও জামায়াত নিয়ে অতি বাড়াবাড়ি বাদ দিয়ে বিষয়টিকে স্বাভাবিক অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া। অর্থাৎ

- যারা ৮ রাকায়াত পড়ে তাদেরকে ৮ রাকায়াত পড়তে দেওয়া
- যারা ২০ রাকায়াত পড়ে তাদেরকে ২০ রাকায়াত পড়তে দেওয়া
- যারা এরচেয়েও কম বা বেশী পড়তে চায় তাদেরকে তা করতে দেওয়া
- যেহেতু এটা তাওয়্যু তথা ঐচ্ছিক সালাত তাই কাউ কারো উপর নিজের মতামতকে চাপিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা না করা
- কেউ না পড়লে তাকে মন্দভাবে না দেখা
- আমাদেরকে মনে রাখতে হবে মুসলিম ভাতৃত্ববোধ এবং জাতীয় ঐক্য বজায় রাখা ফরজ তথা আবশ্যিক বিষয় আর তারাবীহ হচ্ছে তাহাওয়্যু তথা ওইচ্ছিক বিষয়।

হুঁশিয়ারিঃ আমাদের বর্তমান সমাজে আবার ক্বিয়ামু-ল-লাইল শব্দটির প্রচলন শুরু হয়েছে, সমাজে ইসলামী সংগঠন নামে পরিচিত কিছু রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন রামাদ্বান মাসে মাঝে মাঝে ক্বিয়ামু-ল-লাইল নামে রাত্রি জাগরণের উদ্যোগ নিয়ে থাকেন। তবে নাম এক হলেও এ ক্বিয়ামু-ল-

লাইল আর সে "ক্বিয়ামু-ল-লাইল" এর মাঝে তফাত অনেক। রাসূল সা. ও সাহাবা যুগের ক্বিয়ামু-ল-লাইল ছিল সারা বছর ব্যাপি নফল সালাত আদায়ের একটি সাভাবিক প্রক্রিয়া আর ইনাদের ক্বিয়ামু-ল-লাইল হচ্ছে রামাদ্বান মাসে সাংগঠনিক কার্যকলাপকে আরো মজবুত করার জন্য একটি দলীয় প্রক্রিয়া।

ই'তিকাফঃ ই'তিকাফ অর্থ অবস্থান করা। ছাওয়াবের নিয়তে মসজিদে অবস্থান করাকে ই'তিকাফ বলা হয় আর যে ব্যক্তি ই'তিকাফ করে তাকে বলা হয় "মু'তাকিফ"। ইসলামে ই'তিকাফের বৈধতা এবং বিধান সম্পর্কে কিছু ধারণা আমরা আল-কুরআন থেকেই পেয়েছি। যেমন ইরশাদ হচ্ছে..

وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ	আর তোমরা মসজিদে ই'তিকাফরত অবস্থায় নারী গমন করবে না। (২ বাক্বারাহঃ ১৮৭)

উল্লেখ্য উক্ত আয়াতে দুটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যথা..

- মসজিদে ই'তিকাফ করাকে ইবাদাত হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে
- মসজিদে ই'তিকাফরত অবস্থায় নারীগমন তথা যৌন সঙ্গমকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

ই'তিকাফের সময় ও দিনঃ ই'তিকাফের নির্ধারিত কোনো সময় বা দিন নেই এবং ই'তিকাফকালের নির্ধারিত কোনো পরিমাণও নেই। যার যতটুকু সময় ইচ্ছা যে কোনো সময় এবং যে কোনো দিন ই'তিকাফ করতে পারবে। তবে রামাদ্বান মাসের শেষ দশকে ই'তিকাফ করা নবী সা.র একটি বিশেষ সুন্নাহ। বর্ণিত হচ্ছে..

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما **قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺيَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ .**مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

ইবন উ'মার রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূল সা. রামাদ্বানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

ই'তিকাফের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায় আল্লাহর ঘরে অবস্থান নেওয়া এবং যাবতীয় পাপ ও পাপাচার থেকে বিরত থেকে একমাত্র আল্লাহর দিকে ধাবিত হওয়া ই'তিকাফের অন্যতম লক্ষ্য। বর্ণিত হচ্ছে..

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِﷺ قَالَ فِي الْمُعْتَكَفِ هُوَ يَعْتَكِفُ الذُّنُوبَ وَيُجْرَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا . رَوَاهُ ابْن مَاجَه

ইবন আ'ব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, মু'তাকিফ সম্পর্কে রাসূল সা. বলেছেনঃ সে আসলে সমুদয় পাপ থেকে ই'তিকাফ (দূরে অবস্থান) করে থাকে এবং (সে ই'তিকাফরত অবস্থায়) লোকেরা যত নেককাজ করে তাকে এর সমপরিমাণ ছাওয়াব দেওয়া হয়। (ইবনু মাজা)

কে ই'তিকাফ করবেঃ ই'তিকাফ পুরুষ ও নারী সকলের জন্য। পুরুষ নারী সবাই মসজিদে ই'তিকাফ করতে পারবে। বর্ণিত হচ্ছে..

عن عائشة رضي الله عنها **:أن رسول الله** صلى الله عليه وسلم **كان يعتكف في الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ من رمضان، حتى توفاه الله عز وجل ، ثم اعتكف أزواجه بعده**

আ'ইশাহ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. রামাদ্বানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করতেন এবং তিনি মৃত্যু পর্যন্ত এমন করেছেন। তার ইন্তিকালের পর তার স্ত্রীগণও ই'তিকাফ করতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبيﷺ يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء فأذنت لها فضربت خباء فلما رأته زينب ابنة جحش ضربت خباء آخر فلما أصبح النبي ﷺ رأى الأخبية فقال ما هذا فأخبر فقال النبي ﷺ ألبر ترون بهن فترك الاعتكاف ذلك الشهر ثم اعتكف عشرا من شوال

আ'ইশাহ রা. বলেনঃ রাসূল সা. রামাদ্বানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করতেন আর আমি (মসজিদে) উনার জন্য তাবু বসাতাম। ফজরের সালাতের পর তিনি তাবুতে অবস্থান নিতেন। একদা (আ'ইশাহ রা. রাসূল সা.র জন্য এবং নিজের জন্য তাবু বসানোর পর) হাফস্বাহ রা. আ'ইশাহ রা.কে অনুরোধ করলেন উনার জন্য (ই'তিকাফের অনুমতির এনে দিতে এবং) তাবু বসাতে। (আ'ইশাহ রা. বলেন) আমি হাফস্বার জন্য অনুমতি এনে দিলাম এবং তাবু বসিয়ে দিলাম। (হাফস্বার তাবু দেখার পর রাসূলের আরেক স্ত্রী) যাইনাব বিনত জাহাশ (রাসূলের অনুমতি না নিয়েই নিজের জন্য) আরেকটি তাবু বসিয়ে নিলেন। (এসব কিছু হল ২০ রামাদ্বান রাতে) সকালে এতোগুলো তাবু দেখে রাসূল সা. জিজ্ঞেস করলেনঃ "এসব কী"? তখন রাসূল সা.কে সবকিছু জানানো হলে তিনি বললেনঃ "এদের অবস্থা দেখো! নেকী নিয়েও কেমন করছে"। তিনি এ মাসে ই'তিকাফ ছেড়ে দিলেন এবং শাওয়্যাল মাসে ১০দিন ই'তিকাফ করলেন। (বুখারী)

ই'তিকাফরত অবস্থায় করণীয়ঃ ই'তিকাফরত অবস্থায় মসজিদে অবস্থান করতে হবে। একান্ত প্রয়োজন না হলে কোনো প্রকার ইবাদাতের জন্য অথবা সামাজিক, পারিবারিক বা ব্যক্তিগত কাজের জন্য মসজিদ থেকে বের হবে না। বর্ণিত হচ্ছে..

وعنها قالت :السنة على المعتكف أن لا يعود مريضاً، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلاّ في مسجد جامع (رواه أبو داود

আ'ইশাহ রা. বলেনঃ ই'তিকাফকারীর জন্য সুন্নাহ (নিয়ম) হচ্ছে সে..

- রোগী দেখতে যাবে না
- জানাযায় শরীক হবে না
- নারী স্পর্শ করবে না
- যৌন মিলন করবে না
- একান্ত প্রয়োজন (খাদ্য, পানীয়, পবিত্রা অর্জন, পেশাব-পায়খানা, ইত্যাদি) ছাড়া মসজিদ থেকে বের হবে না
- সাওম (রোজা) ছাড়া ই'তিকাফ হবে না
- জামে মসজিদ ছাড়া (অন্য মসজিদে বা ঘরে) ই'তিকাফ হবে না। (আবু-দাউদ। হাদীছের সনদে সমস্যা নেই)

কোথায় ই'তিকাফ করবেঃ উপরের হাদীছ থেকে এবং রাসূল সা. ও সাহাবাদের আমল থেকে জানা যায় ই'তিকাফ শুধু জামে মসজিদেই করতে হয়। জামে মসজিদ ব্যতীত অন্য মসজিদে বা ঘরে ই'তিকাফ হবে না।

বিঃ দ্রঃ = নিরাপত্তা জনিত সমস্যার কারণে মহিলারা বাড়ির মসজিদে (মাসজিদ বাইতিহা) ই'তিকাফ করতে পারবে বলে মন্তব্য করেছেন ইমাম আবু-হানীফাহ রাহি.। আর এ কথাটিকে অপব্যবহার করে কেউ কেউ মহিলাদের জন্য ঘরের এক কক্ষে ই'তিকাফ করার বৈধতা দিয়ে থাকেন। আসলে বিষয়টি সরাসরি হাদীছের বিপরীতে চলে যায়।

লাইলাতুল ক্বাদরঃ লাইলাতু-ল-ক্বাদর অর্থ মহিমান্বিত রাত, ভাগ্য রজনী। রামাদ্বান মাসের এক রাতে আল-কুরআন অবতরণ শুরু হয়েছে। প্রতি বছর এ রাতে মহান আল্লাহর আদেশ নিয়ে জিবরাঈল আ.সহ ফিরিস্তাগণ পৃথিবীতে নেমে আসেন। মহান আল্লাহ তায়া'লা এ রাতকে লাইলাতু-ল-ক্বাদর হিসেবে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে..

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (1) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (2) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (3) تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ (4) سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ (5)

নিশ্চয় আমি এ ক্বুরআন নাযিল করেছি "লাইলাতু-ল-ক্বাদরে" (শবে ক্বদরে, কদরের রাতে,) তুমি কী জানো! "লাইলাতু-ল-ক্বাদর" কী? "লাইলাতু-ল-ক্বাদর" হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। ফিরিস্তাগণ এবং রূহ (জিবরাঈল) আল্লাহর অনুমোদনক্রমে এ রাতে বিশেষ কাজ নিয়ে পৃথিবীতে নেমে আসে। (এ রাতের) শান্তি, ফজর উদিত হওয়া পর্যন্ত (বিস্তৃত হতে থাকে।) (৮৭ আল-ক্বাদর)

লাইলাতু-ল-ক্বাদরে ১ বছরের কর্মতালিকা আকাশ থেকে দুনিয়ায় কর্মরত ফিরিস্তাদের কাছে হস্তান্তর করা হয়। ইরশাদ হচ্ছে..

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ (3) فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ (4) أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ (5)

নিশ্চয় আমরা এ কুরআন নাযিল করেছি এক বরকতময় রাতে (লাইলাতু-ল-ক্বাদরে।) নিশ্চয় আমরা (এ কিতাবের মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে পাপের পরিণতি সম্পর্কে) সাবধান করে দিচ্ছি। আর (যে রাতে এ কুরআন নাযিল করা হয়েছে) সেই রাতেই আমার আদেশে প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলাদা (যমীনের ফিরিস্তার কাছে হস্তান্তর) করা হয়। নিশ্চয় আমিই প্রেরণ করে থাকি। (কেউ কেউ মনে করেন এ বরকতময় রাত হল শবে বরাত। এমন মনে করা ভুল। আসলে এ রাত হল শবে কদর। দেখুন সূরাহ আল-ক্বাদর।) (৪৪ দুখানঃ ৩-৫)

লাইলাতু-ল-ক্বাদরে করণীয়ঃ লাইলাতু-ল-ক্বাদর এ উম্মতের জন্য মহান আল্লাহর এক বিশেষ নিয়ামত। এ রাতে আমাদেরকে বোনাস হিসেবে এক হাজার মাসের চেয়ে বেশী ছাওয়াব দান করা হয়। তাই আমাদের জন্য উত্তম হলো এ রাতে আল্লাহর কাছে নিজেকে সমর্পণ করে আল্লাহর ইবাদাত ও দোয়া করা। হাদীছে বর্ণিত হচ্ছে..

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :قال رسول الله ﷺ من يقم ليلة القدر إيماناً واحتسابا غفر لله ما تقدم من ذنبه

আবু-হুরাইরাহ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেনঃ যে ব্যক্তি ঈমান ও ইহতিসাবের সাথে লাইলাতু-ল-ক্বাদরে ক্বিয়াম করবে তার আগেকার সমুদয় পাপ মাফ করে দেওয়া হবে। (বুখারীঃ ৩৫, মুসলিমঃ ৭৬০)

عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، بِمَ أَدْعُو؟ قَالَ قُولِي اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

আ'ইশাহ রা. বলেনঃ একদা আমি জিজ্ঞেস করলামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কী মনে করেন? যদি আমি লাইলাতু-ল-ক্বাদর পেয়ে যাই তখন আমি কী বলব? তিনি বললেনঃ বলবে "আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আ'ফুয়্যুন, তুহি'ব্বু-ল-আ'ফওয়া, ফা'ফু আ'ন্না"- (হে আল্লাহ! নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল, তুমি ক্ষমা করতে পছন্দ কর সুতরাং আমাকে ক্ষমা করে দাও।) (ইবনু-ল-ক্বাইয়্যুম। হাদীছটি সাহীহ)

লাইলাতু-ল-ক্বাদর কোন রাতঃ লাইলাতু-ল-ক্বাদর কোন রাত তা আমাদেরকে নির্ধারণ করে বলা হয়নি। তবে এই মর্মে ধারণা দেওয়া হয়েছে যে এটা হবে রামাদ্বান মাসের শেষ দশকের কোনো এক বেজোড় রাতে। বর্ণিত হচ্ছে..

عن عائشة رضي الله عنها عن النبيِّ ﷺ قال :تَحَرَّوْا لَيْلَةَ القَدْرِ في الوِتْرِ مِنَ العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِن رَمَضَانَ

আ'ইশাহ রা. থেকে বর্ণিত, নবী সা. বলেছেনঃ তোমরা রামাদ্বান মাসের শেষ দশকের বেজোড় রাতে লাইলাতু-ল-ক্বাদরের সন্ধান করবে। (বুখারী)

অনুচ্ছেদঃ ৮. ওয়াদা ও অঙ্গীকার পূর্ণ করা

আমাদের উপর অর্পিত আরো একটি ফরজ দায়িত্ব হলো ওয়াদা করলে বা অঙ্গীকার করলে পূর্ণ করা। আসলে বিষয়টি আমাদের ব্যক্তি জীবন থেকে আন্তর্জাতিক জীবন পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রেই বিস্তৃত। ইরশাদ হচ্ছে..

..তোমরা ওয়াদা পূর্ণ করবে। কারণ ওয়াদা সম্পর্কে অবশ্যই তোমাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে। (১৭ ইসরাঃ ৩৪)	**وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا**

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

(হে আমার বান্দাগণ!) তোমরা আল্লাহর সাথেকৃত ওয়াদা ও অঙ্গীকার পূর্ণ করবে। (ওয়াদার সাথে আল্লাহর নাম যুক্ত করে) ওয়াদাকে অঙ্গীকারে/শপথে রূপান্তিত করার পর কখনো এটা ভঙ্গ করবে না। কারণ (আল্লাহর নাম ব্যবহার করে) তোমরা আল্লাহকে এর জিম্মাদার বানিয়ে ফেলেছ। (তাই এটা ভঙ্গ করলে আল্লাহর নামের অবমাননা হয়। মনে রেখো!) তোমরা যা কর আল্লাহ এসকল ব্যাপারে অবগত। (১৬ নাহ'লঃ ৯১)

وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (94) وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (95)

(হে মুঅমিনগণ!) তোমরা তোমাদের শপথকে/অঙ্গীকারকে প্রতারণার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করো না। এমন করলে (তোমরা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবে এবং তখন) প্রতিষ্ঠিত হবার পরও তোমাদের পা পিছলে যেতে পারে। তখন

আল্লাহর পথ থেকে বিরত থাকার কারণে তোমাদেরকে কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে। আর (এমন করলে আখেরাতে) তোমাদের জন্য নির্ধারিত হবে কঠিন আযাব। তোমরা আল্লাহর নামে শপথ করার পর সামান্য দুনিয়ার স্বার্থে এসব বদলে দিও না। (মনে রেখো! শপথ পূর্ণকারীর পুরস্কার হিসেবে) আল্লাহর কাছে যা রয়েছে (সমগ্র দুনিয়ার চেয়েও) এটা অনেক অনেক উত্তম, যদি তোমরা বুঝতে। (শপথের বিধান জানতে দেখুন সূরাহ বাক্বারাহঃ ২২৫)

বিঃ দ্রঃ= কাউকে কোনো বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেওয়ার নাম ওয়াদা আর ওয়াদার সাথে আল্লাহর নাম যুক্ত করে এটাকে পাপাপুক্ত করে নেওয়ার নাম অঙ্গীকার বা শপথ।

অনুচ্ছেদঃ ৯. কাফফারাহ আদায় করা

আমাদের আরো একটি ফরজ দায়িত্ব হচ্ছে কোনো অপরাধ করার পর আল্লাহ প্রদত্ত কাফফারাহ (পাপ মোচনের জন্য নির্ধারিত পণ বা জরিমানা) অবধারিত হয়ে গেলে এটা আদায় করা।

কাফফারহ পরিচিতিঃ কাফফারহ অর্থ রিমোভার বা মোচনকারী। কখনো কোনো কাবীরাহ গোনাহ (মহাপাপ) হয়ে গেলে এসব পাপ মোচনের জন্য সুনির্দিষ্ট পন্থা বাতলে দিয়েছে ইসলাম। সাধারণত মহাপাপের অনিষ্ট থেকে মুক্তি পেতে ক্ষমার ব্যবস্থা রয়েছে ইসলামে। তাওবাহ ও ইস্তিগফারের মাধ্যমে মহাপাপ থেকে ক্ষমা পাওয়া যায় আর কাফফারাহ আদায় করলে পাপটি মোচন হয়ে যায়। কাফফারাহ আসলে পাপ মুক্তির জরিমানা বা পণ।

উল্লেখ্য সকল পাপের জন্য কাফফারাহ দিতে হয় না। নির্ধারিত কয়েকটি পাপের কারণে কাফফারাহ আদায় করা ফরজ হয় এবং প্রতিটি বিষয়ের কাফফারাহ ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। যেমন..

ক. কসম ভঙ্গের কাফফারাহঃ ভবিষ্যতে কোনো কাজ করার বা না করার জন্য কসম করলে এ কসম রক্ষা করা আবশ্যকীয় হয়ে যায়। এমন কসম ভঙ্গ করলে কাফফারাহ (নির্ধারিত পণ বা জরিমানা) আদায় করতে হয়।

কসমের কাফফারাহ হচ্ছে ১০জন মিসকিনকে (২ বেলা) খাদ্য দান করা অথবা ১০ জন মিসকিনকে (১ জোড়া করে) বস্ত্র দান করা অথবা একজন দাসকে মুক্ত করে দেওয়া। আর এ তিনের কোনোটি করতে সক্ষম না হলে ৩টি রোজা পালন করা। ইরশাদ হচ্ছে..

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (89)

লাগ'ওয়া কসমের জন্য আল্লাহ তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন না। তবে ইচ্ছাকৃত কসমের জন্য অবশ্যই পাকড়াও করবেন। (তোমরা কসম করলে এটা পূর্ণ করবে। আর কসম ভঙ্গ করলে কাফফারাহ দিবে। কসমের) কাফফারাহ হল..

- দশজন মিসকীনকে খাদ্য দান (তাদেরকে এমন মানের খাদ্য দেবে) যে খাবার তোমরা সাধারণত পরিবারে খেয়ে থাকো
- অথবা (দশজন মিসকীনকে) বস্ত্র দান করা, (প্রত্যেককে ১ জোড়া করে বস্ত্র দেবে। একটি নীচের আর একটি উপরের)
- অথবা একজন দাসকে মুক্ত করে দেওয়া।
- আর (এ তিনটির কোনোটি) না পারলে তিনদিন রোজা পালন করা।

এটা হল কসমের কাফফারাহ। তোমরা কসম (করলে এটা) রক্ষা করবে। আল্লাহ এভাবেই তার বিধান স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, যেন তোমরা শোকর আদায় কর। (৫ মাইদাহঃ ৮৯)

প্রাসঙ্গিক আলোচনাঃ কসম ও কসমের বিধান

কোনো তথ্য, সংবাদ অথবা কর্মের সাথে আল্লাহর নাম যুক্ত করা হলে এটাকে কসম বলা হয়। কসম ৩ প্রকার হয়ে থাকে। যথা.. গুরুত্বহীন কসম (লাগ'ওয়া কসম), মিথ্যা কসম (গু'মুস কসম) ও উদ্দেশ্যমূলক কসম (মুনআ'ক্বিদাহ কসম।)

লাগ'ওয়া কসমঃ কসমের ইচ্ছা না করে অভ্যাসগত বা উদ্দেশ্যহীনভাবে কসমের শব্দ ব্যবহার করা অথবা অতীতের কোনো বিষয়কে সত্য মনে করে কসম করার নাম লাগ'ওয়া কসম। লাগ'ওয়া কসমে পাপ হয় না এবং লাগ'ওয়া কসমে কাফফারাহ দিতে হয় না।

গু'মুস কসমঃ অতীতের কোনো বিষয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা কসম করাকে গু'মুস কসম বলা হয়। গু'মুস কসমে পাপ হয়। এজন্য তাওবাহ ও ইস্তিগফার করতে হয় তবে কাফফারাহ দিতে হয় না।

মুনআ'ক্বিদাহ কসমঃ ভবিষ্যতে কোনো কাজ করার বা না করার কসমকে মুনআ'ক্বিদাহ কসম বলা হয়। মুনআ'ক্বিদাহ কসম করলে পাপ হয় না তবে মুনআ'ক্বিদাহ কসম ভঙ্গ করলে কাফফারাহ দিতে হয়। মুনআ'ক্বিদাহ কসমের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান হচ্ছে..

- কোনো ভালো কাজ না করার কসম করলে এটা ভঙ্গ করে কাফফারাহ দিতে হয়।
- কোনো মন্দ কাজ করার জন্য কসম করলে এটা ভঙ্গ করে কাফফারাহ দিতে হয়।
- সাধারণ ভাবে মুনআ'ক্বিদাহ কসম পূর্ণ করতে হয়।
- মুনআ'ক্বিদাহ কসম ভঙ্গ করলে কাফফারাহ দিতে হয়।
- কসমের কাফফারাহ হচ্ছে দশজন মিসকীনকে খাদ্য দান করা অথবা বস্ত্র দান করা অথবা একজন দাসকে মুক্ত করে দেওয়া। আর এ তিনটির কোনোটি করতে সক্ষম না হলে তিনটি রোজা রাখতে হয়।

- আল্লাহ ছাড়া অন্য নামে কসম করা বৈধ নয়। এমন কাজকে হাদীছে শিরক বলা হয়েছে।

খ. হত্যার কাফফারাহঃ এক মুসলিমের জন্য বৈধ কারণ (যে কারণে শারয়ী' আইন মতে ইসলামী আদালত তাঁর মৃত্যুদন্ড দিয়েছে) ব্যতীত অন্য মুসলিমকে হত্যা করা মহাপাপ। কখনো ভুলবশত এমন হয়ে গেলে হত্যাকারী ব্যক্তি (নিহতের পরিবারকে) দিয়াত (রক্তপণ) এবং কাফফারাহ উভয়টিই আদায় করবে। ইরশাদ হচ্ছে..

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (92) وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (93)

৯২. কোনো মুঅমিনের (মুসলিমের) জন্য বৈধ নয় অন্য মুঅমিনকে হত্যা করা তবে ভুলবশত (করে ফেললে সে কথা ভিন্ন।)

- যে ব্যক্তি ভুলবশত কোনো মুঅমিনকে হত্যা করল তাকে অবশ্যই (কাফফারাহ এবং দিয়াত উভয়টিই আদায় করতে হবে।)
- (কোনো মুঅমিনকে ভুলবশত হত্যার কাফফারাহ হিসেবে) একজন মুঅমিন দাসকে মুক্ত করবে এবং নিহত ব্যক্তির পরিবারকে দিয়াত (রক্তপণ) আদায় করবে। তবে নিহতের পরিবার মাফ করে দিলে (দিয়াত মাফ হয়ে যাবে কিন্তু কাফফারাহ মাফ হবে না।)
- নিহত মুসলিম ব্যক্তি শত্রু দেশের নাগরিক হলে শুধু (কাফফারাহ দিতে হবে তথা) একজন মুঅমিন দাসকে মুক্ত করতে হবে।
- আর সে (নিহত মুসলিম ব্যক্তি) যদি এমন দেশের নাগরিক হয় যাদের সাথে তোমাদের (ইসলামী সরকারের নিরাপত্তা) চুক্তি রয়েছে তবে (হত্যাকারী) নিহত ব্যক্তির পরিবারকে দিয়াত আদায় করবে এবং (কাফফারাহও আদায় করবে তথা) একজন মুঅমিন দাসকে মুক্ত করবে।
- হত্যাকারী যদি (মুক্ত করার জন্য) দাস না পায় (তবুও কাফফারাহ রহিত হবে না বরং) তখন (হত্যার কাফফারাহ হিসেবে) লাগাতার দুই মাস রোজা রাখবে।
- (হত্যাকারী এসব করবে) আল্লাহর পক্ষ থেকে তাওবাহ (কবুলের পন্থা) হিসেবে। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। (সুতরাং আল্লাহর দেওয়া সকল বিধানই জ্ঞানগর্ভ এবং প্রজ্ঞায় ভরপুর)

৯৩. আর কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো মুঅমিনকে হত্যা করে তবে তার সাজা হল চির জাহান্নাম। আল্লাহ তার প্রতি গুস্বা হবেন, তাকে লা'নত করবেন, তার জন্য প্রস্তুত করবেন মহা-আযাব। (৪ নিসাঃ ৯২-৯৩)

গ. রোজা ভঙ্গের কাফফারাহঃ ফজরের সূচনা সময় থেকে শুরু করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সকল প্রকার খাদ্য, পানীয় এবং যৌন সম্ভোগ থেকে বিরত থাকার নাম সিয়াম সাধন করা বা সাওম পালন করা। আমাদের সমাজে ফার্সি শব্দকে বাংলার সাথে মিশিয়ে বলা হয় রোজা রাখা। রামাদ্বানের রাতে এ তিন কাজ করা বৈধ আর দিনে (রোজা অবস্থায়) এ তিনটি কাজ করা অবৈধ। ইরশাদ হচ্ছে..

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (187)

পটভূমিঃ সূচনাতে যখন রোজা ফরজ করা হয় তখন রোজা পালনের নিয়মনীতি স্পষ্ট করে বলা হয়নি। ফলে রাসূল সা. ও সাহাবাগণ আহলে কিতাবের নিয়ম ও রীতি মেনে রোজা পালন করতেন। তখনকার রীতি অনুযায়ী ইফতারের পর ঘুমিয়ে পড়লে পরদিনের রোজা শুরু হয়ে যেত এবং তখন থেকেই পানাহার ও যৌন সঙ্গম হারাম হয়ে যেত। বিষয়টি আসলে সহজ ছিল না। তাই কিছু অঘটন ঘটে গেল। যেমন..

- এক রাতে দেরী করে বাড়ী ফিরে উমর রা. দেখলেন স্ত্রী ঘুমিয়ে পড়েছেন। তিনি স্ত্রীকে কাছে টেনে সহবাস করে ফেললেন। অন্য বর্ণনা মতে উমর রা. নিজেই ঘুমিয়ে পড়ে ছিলেন এবং ঘুম ভাঙ্গার পর সহবাস করেছেন। (কুরতুবীঃ আবু-দাউদ)
- কাইস বিন সিমরাহ আল-আনসারী রা. একজন গরীব সাহাবী ছিলেন। সারাদিন খেজুর বাগানে কাজ করতেন। একদা রোজার দিনে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে জানতে পারলেন ঘরে খাবার কিছুই নেই। স্ত্রী খাবারের সন্ধানে অন্য বাড়ী গেলে কাইসের ক্লান্ত দেহ জুড়ে ঘুম জড়িয়ে এলো। তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। স্ত্রী খাবার নিয়ে এসে দেখলেন স্বামী ঘুমিয়ে পড়েছেন। কাইস রা. কিছু না খেয়েই পরের দিনের রোজা শুরু করলেন। কিন্তু শরীরে আর কত সয়। দুপুরের পর তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। (কুরতুবীঃ বুখারী)

এভাবে আরো কিছু ঘটনা ঘটল, এসব ঘটনার পর সংশ্লিষ্ট সাহাবাগণ তাওবাহ করলেন, আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলেন। তাই এ সমস্যার স্থায়ী সমাধান দিয়ে নাযিল হল.. তোমাদের তরে হালাল করা হলো রোজার রাতে নারী (স্ত্রী/দাসী) গমন। নারীরা তোমাদের পরিচ্ছদ আর তোমরা তাদের পরিচ্ছদ। আল্লাহ জানেনঃ তোমাদের কেও কেও নিজেকে প্রতারিত করেছো। (তবে) তিনি তোমাদের তাওবাহ কবুল করেছেন এবং তোমাদেরকে মাফ করে দিয়েছেন। এখন থেকে তোমরা (রমজানের রাতে) যখন ইচ্ছা নারী গমন করতে পারবে। (এবং সঙ্গমকালে) তাই (সন্তান) কামনা করবে যা আল্লাহ তোমাদের জন্য নির্ধারণ করে রেখেছেন। আর তোমরা (রমজানের রাতে) খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করবে যতক্ষণ না (আকাশের পূর্ব দিগন্তে) রাতের কালো দাগ (দূর হয়ে এখান) থেকে ঊষার সাদা দাগ স্পষ্ট হয়ে উঠে। এরপর (পরবর্তী) রাত (তথা সূর্যাস্ত) পর্যন্ত রোজা পূর্ণ করবে। তবে মসজিদে ই'তিকাফরত অবস্থায় নারী গমন করবে না। (মনে রাখবে!) এসব (বিধান) হলো আল্লাহর সীমানা।

তোমরা আল্লাহর সীমানার কাছেও যাবে না। (আর শোনো!) আল্লাহ তার বিধান এভাবেই স্পষ্ট করে বর্ণনা করেন, যেন মানুষ মুত্তাক্বী হতে পারে। (২ বাক্বারাহঃ ১৮৭) (যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে যাবতীয় কুফর শিরক ও পাপাচার থেকে বেঁচে থাকে সে-ই মুত্তাক্বী)

আইন ও বিধানঃ রোজার রাতে স্ত্রী-সঙ্গম করা বৈধ কাজ। ফজরের আলো স্পষ্ট হয়ে উঠা পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী-সঙ্গম করা যাবে। মসজিদে ই'তিকাফরত অবস্থায় স্ত্রী-সঙ্গম করা যাবে না। তবে এ অবস্থায়ও স্ত্রী তার স্বামীর মাথার চুল আঁচড়ে দিতে পারবে বলে হাদীছ উল্লেখ আছে।

রামাদ্বান মাসে রোজা অবস্থায় দিনের বেলা যৌন সঙ্গম করলে পাপ হয় এবং এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে কাফফারাহ দিতে হয়। রাসূল সা. এমন বিধান দিয়েছেন বলে হাদীছে বর্ণিত হয়েছে..

1834حدثنا **أبو اليمان** أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه **قال بينما نحن جلوس عند النبي ﷺ إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت قال ما لك قال وقعت على امرأتي وأنا صائم فقال رسول الله ﷺ هل تجد رقبة تعتقها قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا فقال فهل تجد إطعام ستين مسكينا قال لا قال فمكث النبي ﷺ فبينا نحن على ذلك أتي النبي ﷺ بعرق فيها تمر والعرق المكتل قال أين السائل فقال أنا قال خذها فتصدق به فقال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي فضحك النبي ﷺ حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك**

আবু-হুরাইরাহ রা. বলেনঃ একদা আমরা নবী সা.র কাছে বসা ছিলাম, এমন সময় একব্যক্তি এসে বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! "আমি ধ্বংস হয়ে গেছি"।
রাসূল সা. বললেনঃ কী হয়েছে?
লোকটি বললঃ আমি রোজা অবস্থায় স্ত্রী সঙ্গম করে ফেলেছি।
রাসূল সা. বললেনঃ তুমি কী কোনো গোলাম আজাদ করতে পারবে?
লোকটি বললঃ না..।
রাসূল সা. বললেনঃ তবে কী লাগাতার দুই মাস রোজা রাখতে পারবে?
লোকটি বললঃ না..।
রাসূল সা. বললেনঃ তবে কী ৬০ জন মিসকিনকে খাদ্য দান করতে পারবে?
লোকটি বললঃ না..
রাসূল সা. (আর কিছু বললেন না। এভাবে) কিছু সময় পার করলেন। আমরা এভাবেই বসে রইলাম। এমন সময় রাসূল সা.র কাছে (হাদিয়া স্বরূপ) এক ঝুড়ি খেজুর এলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ প্রশ্নকারী ওই লোকটি কোথায়?
লোকটি বললঃ আমি, ইয়া রাসূলাল্লাহ!
রাসূল সা. বললেনঃ এ খেজুরগুলো নিয়ে যাও এবং সাদাক্বাহ হিসেবে (গরীবদের মাঝে) বিলিয়ে দাও!
লোকটি বললঃ আমার চেয়ে বেশী গরীবদের মাঝে বিলাব..? ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর কসম! মদীনার দুই সীমানার ভিতর আমার পরিবারের চেয়ে গরীব কোনো পরিবার নেই। (এ কথা শুনে) নবী সা. হেসে ফেললেন (এমন ভাবে হাসলেন যে) তার আনইয়াব (দুই পাশের ধারালো দাঁত) দেখা গিয়েছে। অতঃপর বললেনঃ (যাও!) তোমার পরিবারকে খাইয়ে দাও। (বুখারী ও মুসলিম)

ফিক্বহ বিশ্লেষণঃ রামাদ্বান মাসে রোজা অবস্থায় স্ত্রী সঙ্গম করলে রোজা ভেঙ্গে যায়, এ রোজা কাজা করতে হয় এবং এ জন্য কাফফারাহ দিতে হয়। এটা ফাক্বীহ ইমামগণের সর্বসম্মত মত, সবাই এ বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেছেন। তবে রামাদ্বান মাসে রোজা অবস্থায় খাদ্য বা পানীয় দ্বারা রোজা ভঙ্গ করলে কাফফারাহ দিতে হবে কী না? এ ব্যাপারে রাসূল সা. থেকে কোনো সুস্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায়নি। তাই ফাক্বীগণ এ বিষয়ে একমত হতে পারেননি।
হানাফীদের মতে রামাদ্বান মাসে রোজা অবস্থায় দিনের বেলা ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো প্রকার খাদ্য বা পানীয় দ্বারা রোজা ভঙ্গ করলেও কাফফারাহ দিতে হবে। আর অন্যদের মতে এ অবস্থায় শুধু কাজা করতে হবে।

ঘ. যিহারের কাফফারাহঃ স্বামী তার স্ত্রীকে "মা" বলে ডাকলে বা মায়ের সাথে তুলনা করলে ইসলামী সমাজনীতির পরিভাষায় এটাকে "যিহার" বলা হয়। জাহেলী যুগে আরব সমাজে যিহার করে বলা হত "তুমি আমার উপর (হারাম হয়ে গেছো) যেমন মায়ের উপর উঠা"। মানে তুমি আমার উপর হারাম হয়ে গেছো যেমন আমার মায়ের উপর উঠা আমার জন্য হারাম। তখনকার দিনে এভাবে যিহার করাকে তালাক হিসেবে গণ্য করা হত। এ ব্যাপারে বিধান দিয়ে নাযিল হয়েছে..

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (2) وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (3) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (4)

(হে মুসলিমগণ!) তোমাদের যারা নিজের স্ত্রীর সাথে যিহার করল (তাদের জেনে রাখা উচিত) তাদের (মুখের কথায়) স্ত্রীগণ তাদের মা হয়ে যায় না। বরং যে নারী যাকে জন্ম দেয় কেবল সে-ই তার মা হয়। যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে "যিহার" করল সে অতি ঘৃনিত কাজ করল, সে মিথ্যা কথা বলল। (তবে তাওবাহ করলে আল্লাহ মাফ করে দেন) নিশ্চয় আল্লাহ পাপ মোচনকারী, ক্ষমাশীল।

(যে বা) যারা নিজের স্ত্রীর সাথে "যিহার" করল এবং অতঃপর তার কথা প্রত্যাহার করে নিল (তাদের স্ত্রীগণ তালাক হবে না। তবে এমন জঘন্যতম উক্তির জন্য কাফফারাহ দিতে হবে। যিহারের কাফফারাহ হলঃ স্বামী-স্ত্রী) একে অপরকে স্পর্শ করার আগে (স্বামী) একটি গোলাম আজাদ করবে। এটা হল আল্লাহর আদেশ। (তাই অবশ্যই পালন করবে আর মনে রাখবে) তোমাদের সকল ব্যাপারে আল্লাহ অবগত।

আর এটা (গোলাম আজাদ করতে) না পারলে স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে স্পর্শ করার আগে (স্বামী) একাধারে দুই মাস রোজা রাখবে (এটা হচ্ছে যিহারের কাফফারাহ আদায়ের ২য় পদ্ধতি।)

আর যে ব্যক্তি তাও পারবে না, সে ৬০জন মিসকীনকে (২ বেলা) ভোজন করাবে (এটা যিহারের কাফফারাহ আদায়ের ৩য় পদ্ধতি।)

এসব (বিধান পালন করা) হলো আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমানের দাবী। এসব হলো আল্লাহর সীমানা। (তাই তোমরা আল্লাহর সীমানা লঙ্ঘন করো না। কারণ যে ব্যক্তি নীতিগত ভাবে আল্লাহর সীমানা লঙ্ঘন করে সে কাফির হয়ে যায়) আর কাফিরদের তরে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। (৫৮ মুজাদালাহঃ ২-৪)

আইন ও বিধানঃ যিহার শব্দটি এসেছে "যাহর" থেকে। আরবী "যাহর" অর্থ পিঠ বা আরোহন করা। আর যিহার হলো পিঠের সাথে বা আরোহন করার সাথে তুলনা করা। উল্লেখ্য যৌন সঙ্গম করার সময় সাধারনত স্বামী স্ত্রীর উপরে উঠে, তাই যিহার বলে সঙ্গম বুঝানো হয়।

স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে "তুমি আমার জন্য মায়ের উঠার মত হয়ে গেছ"। সামাজিক পরিভাষায় এটাকে যিহার বলা হয়। "যাহর" শব্দের অর্থ পিঠ হলেও যিহার শব্দটি আরবী সমাজে আরোহণ করা বা উপরে উঠার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। সঙ্গমকালে সাধারণত পুরুষ নারীর উপরে উঠে। সে মতে এর অর্থ দাঁড়ায়ঃ মায়ের উপরে উঠা যেভাবে হারাম; স্ত্রীর উপর উঠাকেও সেভাবে হারাম করে নেওয়া। অর্থাৎ নিজের স্ত্রীকে নিজের জন্য হারাম করে ফেলা, যা তালাকের ইঙ্গিত বহন করে। তাই আরব সমাজে বিষয়টিকে অতি গুরুত্ব দিয়ে তালাক হিসেবে দেখা হত। ইসলামী শারীয়া'হ মতে যিহারের কিছু বিধান নিম্নে উল্লেখ করা হল..

- যিহারের মূল বিষয় হচ্ছে নিজের স্ত্রীর উপর উঠাকে মায়ের উপর উঠার সাথে তুলনা করা। (অর্থাৎ স্ত্রীর উপরে উঠাকে মায়ের উপরে উঠার মত হারাম করে নেওয়া)
- কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে "তুমি আমার জন্য মেয়ের উপরে উঠার মত বা বোনের উপরে উঠার মত বা অন্য মহরাম নারীর সাথে তুলনা করে তবেও যিহার হয়ে যায়। ইমাম মালিক ও আবু-হানীফাহ এমনই বলেছেন। ইমাম শাফিয়ী থেকে এ ব্যাপারে দুটি মত পাওয়া যায়ঃ এক মতে যিহার হবে, আর এক মতে হবে না।
- "যিহার" ইসলামিক পারিবারিক আইনের অংশ। এ আইন মুসলিমদের বেলায় প্রযোজ্য। তাই ইসলামী দেশের অমুসলিম নাগরিক যিহার করলে তালাক হবে না। কারণ কুরআনে শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে "তোমাদের কেউ যদি যিহার করে" মানে মুসলিমদের কেউ (ঈমাম আবু-হানীফাহ এ কথাই বলেছেন)
- যিহারকারী স্বামী কাফফারাহ আদায়ের আগে স্ত্রী সহবাস করতে পারবে না।

ঙ. ইহরাম অবস্থায় চুল কাটার কাফফারাহঃ হাজ্জ বা উমরার ইহরামরত অবস্থায় চুল কাটা নিষিদ্ধ। এমতাবস্থায় কোনো কারণ বশত চুল কেটে ফেললে কাফফারাহ (পাপ মোচনের জন্য নির্ধারিত পণ বা জরিমানা) দিতে হবে। এ ব্যাপারে বিধান দিয়ে নাযিল হয়েছে..

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (196)

(মুঅমিনগণ!) তোমরা হাজ্জ ও উমরাহ (শুরু করলে এটা) পূর্ণ করবে (আর এটা করবে) শুধুই আল্লাহর জন্য। (ইহরামের পর হাজ্জ বা উমরাহ পালনে) বাধাগ্রস্ত হলে সাধ্যমত হাদয়ী (পশু কুরবাণী) দিবে। হাদয়ী যথাস্থানে পৌঁছার আগে তোমরা মাথা মুন্ডাবে না। তবে কেউ অসুখ হলে বা মাথায় সমস্যা হলে (মুন্ডিয়ে ফেলবে এবং এর) ফিদয়াহ হিসেবে (৩টি) রোজা রাখবে অথবা (৬জন মিসকিনকে) সাদাক্বাহ (হিসেবে খাদ্য) দেবে অথবা (১টি ছাগল বা ভেড়া) কুরবাণী করবে। আর নিরাপদ অবস্থায় হাজ্জ মৌসুমে (শাওয়্যাল, যু-ল-ক্বাই'দাহ, যু-ল-হি'জ্জাহ মাসে) উমরাহর সুবিধা নিলে (তথা তামাত্তু' বা ক্বিরান হাজ্জ করলে) সাধ্যমত হাদয়ী দিতে হবে। হাদয়ী না পেলে ১০টি রোজা পূর্ণ করবেঃ ৩টি হাজ্জকালীন সময়ে (মক্কায়) আর ৭টি (বাড়ি) ফিরে গিয়ে। এটা (হাদয়ীর বদলে রোজার বিধান) তার জন্য যার পরিবার মক্কায় থাকে না। তোমরা সবাই আল্লাহর তাকওয়া অর্জন করবে আর মনে রেখবে! আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর। (বাক্বারাহঃ ১৯৬)

আইন ও বিধানঃ

- হাজ্ব ও উমরাহ হবে শুধুই আল্লাহর জন্য। অন্য কোনো উদ্দেশ্যে হাজ্ব বা উমরাহ করলে এর ছাওয়াব পাওয়া যাবে না;
- হাজ্ব/উমরাহ শুরু করার (ইহরামের) পর বাঁধাগ্রস্ত হলে হাদয়ী (কুরবাণী) দিয়ে এবং মাথার চুল কেটে ইহরাম থেকে বের হতে হবে;
- হাদয়ী যথাস্থানে পৌঁছানোর পর চুল কাটতে হবে;
- কোনো অসুস্থতা বা অসুবিধার কারণে সময়ের আগে মাথার চুল কেটে ফেললে ফিদয়াহ দিতে হবে;
- চুল কাটার ফিদয়াহ হিসেবে ৩টি (মতান্তরে ১০ টি) রোজা রাখতে হয় অথবা ৬ জন মিসকিনকে খাবার দিতে হয় অথবা ১টি ছাগল বা ভেড়া কুরবাণী করতে হয়;
- যেব্যক্তি হাজ্ব করল সে যদি হাজ্ব মৌসুমে উমরাহ করে (তামাত্তু'/ক্বিরান হাজ্ব করে) তবে সে একটি হাদয়ী (কুরবাণী) করবে আর পশু না পেলে ১০টি রোজা রাখবেঃ ৩টি হাজ্ব মৌসুমে আর ৭টি বাড়ি গিয়ে। তবে মক্কার স্থায়ী বাসিন্দাদের রোজা রাখতে হবে না।
- উল্লেখ্য ইহরাম রত অবস্থায় চুল কাটার কাফফারাহকে ফিদয়া বলা হয়।

চ. ইহরাম অবস্থায় শিকারের কাফফারাহঃ হাজ্ব বা উমরার ইহরামরত অবস্থায় জলজ শিকার বৈধ হলেও স্থলজ প্রাণী বা পাখি শিকার বৈধ নয়। বরং এমন করা অন্যায় ও পাপ। কেউ এমন করলে এজন্য কাফফারাহ দিতে হয়। এ ব্যাপারে নাযিল হয়েছে..

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (94) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ (95) أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (96)

পটভূমিঃ শনিবার ছিল ইয়াহুদীদের ইবাদাতের দিন। এ দিনে ব্যবসা বানিজ্য, মৎস শিকারসহ দুনিয়াবী কাজকর্ম নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু শনিবারে ঝাঁকে ঝাঁকে মাছ তীরে ভেসে আসত। আসলে এটা ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ পরীক্ষা। একদল ইয়াহুদ লোভ সামলাতে না পেরে নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও মাছ শিকারে মেতে উঠল। তারা আল্লাহর পরীক্ষায় ফেইল করেছে।

মহান আল্লাহ রাসূল সাঃর সাহাবাদেরও পরীক্ষা নিয়েছেন। আমাদের শারীয়া'হ মতে ইহরাম অবস্থায় পশুপাখি শিকার করা নিষিদ্ধ। হুদাইবিয়ার সফরে রাসূল সাঃ ও সাহাবাগণ ইহরাম অবস্থায় ছিলেন। তখন পশুপাখি একেবারে নাগালের কাছে চলে আসত। কিন্তু সাহাবাগণ শিকার করেননি। তারা আল্লাহর পরীক্ষায় পাশ করেছেন। তাদের প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হয়েছে..

৯৪. মুঅমিনগণ! কিছু শিকারি জন্তু তোমাদের হাত ও তীরের নাগালে চলে আসছে (তবুও তোমরা শিকার করনি।) এভাবেই আল্লাহ তোমাদের পরীক্ষা করেছেন। যেন প্রকাশিত হয় তোমাদের মাঝে কে না দেখেও আল্লাহকে ভয় করে (আর কে করে না।) যে ব্যক্তি সীমালঙ্ঘন করবে তার তরে যন্ত্রনাদায়ক আযাব।

৯৫. মুঅমিনগণ! তোমরা ইহ'রাম অবস্থায় (পশুপাখি) শিকার করবে না। তোমাদের কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে শিকার করে ফেললে এর প্রতিকার (কাফফারাহ) হিসেবে শিকারকৃত প্রাণীর সমতুল্য "হাদয়ী" মক্কায় পৌঁছে দেবে। তোমাদের (মুসলিমদের) মাঝে বিচারিক জ্ঞান সম্পন্ন দুইজন ব্যক্তি (মান নির্ণয়ের) ফয়সালা করবে। অথবা (ইহরাম অবস্থায় শিকারের) কাফফারাহ হিসেবে মিসকীনকে খাদ্য দিবে বা সমপরিমাণ রোজা রাখবে। শিকারীব্যক্তি এভাবেই তার কর্মফল ভোগ করবে। (তবে তোমাদের) অতীত আল্লাহ মাফ করে দিয়েছেন। আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী।

৯৬. তবে তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে সাগরের/জলজ শিকার। সাগরের/জলজ খাবার তোমাদের ও (তোমাদের সঙ্গে থাকা) বাহনের জীবিকা। ইহরামে থাকাকালীন শুধু স্থলচর শিকার তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে (জলচর নয়।) তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অর্জন করবে আর (মনে রাখবে) তোমরা সবাই তার কাছেই ফিরে যাচ্ছ। (আল্লাহর ভয়ে যাবতীয় কুফর, শিরক ও পাপাচার থেকে বেঁচে থাকার নাম তাকওয়া) (৫ মাইদাহঃ ৯৪-৯৬)

আইন ও বিধানঃ অধিকাংশ উলামার মতে জলচর সকল প্রাণীই হালাল। কারণ উক্ত আয়াতে সাগরের শিকার এবং খাদ্যকে ব্যাপক ভাবে হালাল বলা হয়েছে। হাদীছেও ব্যাপক ভাবে হালাল বলা হয়েছে, কোনো কিছুকে আলাদা করা হয়নি। তবে কুমির আর উভচর সাপ হালাল নয়। কারণ এটা জলচর নয়, উভচর।

কোনো কোনো আলিম ব্যাঙ খাওয়া অবৈধ বলেছেন। কারণ রাসূল সাঃ ব্যাঙ মারতে নিষেধ করেছেন আর মারতে নিষেধ করা অবৈধ হবার ইঙ্গিত বহন করে।

হানাফী আলিমগণের মতে জলচর প্রাণীদের মাঝে শুধু মাছ খাওয়া যাবে। মাছ ছাড়া অন্যকিছু খাওয়া মাকরুহ।

অনুচ্ছেদঃ ১০. বিয়ের মোহর আদায় করা

আমাদের উপর অর্পিত আরো একটি ফরজ দায়িত্ব হচ্ছে কোনো নারীকে বিয়ে করলে তার মোহর আদায় করা। মহান আল্লাহ তায়া'লা ইরশাদ করেন..

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (4)

(মুসলিমগণ!) তোমরা সন্তুষ্টচিত্তে স্ত্রীদেরকে তাদের (পূর্ণ) মোহর পরিশোধ করবে তবে তারা খুশী হয়ে নিজ থেকে কিছু ছাড় দিলে তোমরা এটা খুশী হয়ে গ্রহণ করবে। (৪ নিসাঃ ৪)

আইন ও বিধানঃ

- বিবাহকালে মোহর পাওয়া স্ত্রীর অধিকার আর মোহর পরিশোধ করা পুরুষের ফরজ দায়িত্ব।
- মোহর যেহেতু স্ত্রীর অধিকার তাই এটা স্ত্রীকেই দিতে হিবে, স্ত্রী তার ইচ্ছা মত যে কোথাও বা যে কারো কাছে রাখতে পারবে
- মোহর নগদ আদায় করা ইসলামের বিধান এবং এটা-ই রাসূল সা. ও সাহাবাদের অনুশ্রিত সুন্নাহ।
- মোহর আদায় না করা বা মোহর নিয়ে টালবাহানা করা অনৈতিক ও অবৈধ কাজ।
- বিবাহ সম্পাদন করার সময় মোহর ধার্য করে নিতে হয়।
- বিবাহ সম্পাদন করার সময় মোহর ধার্য না করলে "মোহর মিছিল" দিতে হয়। (উল্লেখ্য মোহর মিছিল অর্থ সমপরিমাণ মোহর। নববধূর সমান সুন্দরী এবং সমান গুণবতী তার অন্য বোন বা ফুফুদের সমপরিমাণ মোহরকে মোহর মিছিল বলা হয়।)
- বিবাহ সম্পাদন করার সময় যে মোহর ধার্য করা হয়েছে এটাকে সঙ্গত মনে না করলে বিয়ের পর নব-দম্পতি এ মোহরে সংশোধনী আনতে পারবে।
- স্ত্রীর সাথে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করলে অথবা শারীরিক সম্পর্কের জন্য স্ত্রী নিজেকে স্বামীর কাছে উপস্থাপন করলে মোহর আদায় ফরজ হয়ে যায়।
- মোহর ধার্য করে বিয়ে করার পর স্ত্রীর সাথে শারীরিক সম্পর্ক করার অথবা শারীরিক সম্পর্কের জন্য স্ত্রী নিজেকে স্বামীর কাছে উপস্থাপন করার আগে তাকে তালাক দিলে অর্ধেক মোহর দিতে হয়।
- যদি বিবাহের সময় মোহর ধার্য করা না হয় এবং শারীরিক সম্পর্ক করার বা স্ত্রী শারীরিক সম্পর্কের জন্য নিজেকে একান্তভাবে স্বামীর কাছে উপস্থাপন করার আগে তালাক হয়ে যায় তবে কোনো মোহর দিতে হবে না বরং স্বামী তার সাধ্য মত মাতা' (উপহার) দিয়ে স্ত্রীকে বিদায় জানাবে।

অন্য আয়াতে বলা হচ্ছে..

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا **(24)**

আর (তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে) অন্যের বিবাহিতা স্ত্রী। তবে (কুফরতান্ত্রিক দেশ থেকে কাফিরদের) যে সকল স্ত্রী তোমাদের হস্তগত হয়ে যায় (তারা তোমাদের জন্য হালাল হয়ে যায়) এটাই আল্লাহর বিধান। (আগের আয়াতে) উল্লেখিত নারীগণ ছাড়া বাকি নারীরা তোমাদের জন্য হালাল, তোমরা তোমাদের সম্পদ ব্যয় (মোহর আদায়) করে বিয়ের জন্য তাদের খুঁজ করবে, যিনার জন্য নয়। (বিয়ের পর) তাদের সাথে শারীরিক সম্ভোগ করে ফেললে নির্ধারিত মোহর দিতে হবে। (মোহর) নির্ধারণ করার পরও (স্বামী-স্ত্রী) উভয়ের সম্মতিতে (এ মোহরের ধরণ বা পরিমাণ) পরিবর্তন করা কোনো অপরাধ নয়। নিশ্চয় আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। (৪ নিসাঃ ২৪)

আইন ও বিধানঃ অন্যের বিবাহিতা স্ত্রীকে বিয়ে করা হারাম। তবে যুদ্ধরত কাফির শত্রুর স্ত্রীরা যদি স্বেচ্ছায় কুফর সমাজ ত্যাগ করে অথবা যুদ্ধবন্দী হয়ে ইসলামী শাসনের অধীনে চলে আসে তবে ওই স্ত্রীগণ বিবাহ যোগ্য হিসেবে মুসলিমদের জন্য হালাল হয়ে যায়।

- বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে মোহর আদায় করা উত্তম। দৈহিক মিলনের পর মোহর আদায় করা ফরজ হয়ে যায়।
- মিলনের আগে তালাক দিলে অর্ধেক মোহর দিতে হয়
- মোহর নির্ধারণ করার পর স্বামী-স্ত্রী উভয়ের সম্মতিতে মোহরের ধরণ বা পরিমাণ পরিবর্তন করতে পারবে।

অনুচ্ছেদঃ ১১. অধীনস্থদের প্রতি দায়িত্ব পালন করা

আমাদের উপর অর্পিত আরো একটি ফরজ দায়িত্ব হচ্ছে অধীনস্থদের প্রতি দায়িত্ব পালন করা এবং নিজ নিজ অধীনস্থ সকলকে দ্বীনের পথে পরিচালিত করা। ইরশাদ হচ্ছে..

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ **(132)**

(হে আমার বান্দা!) তুমি তোমার আহলকে (পরিবারকে/অধীনস্থদেরকে) সালাতের (নামাযের/দ্বীন পালনের) আদেশ দাও এবং নিজেও এ ব্যাপারে যত্নবান হও। আমি তোমার কাছে রিজক চাই না বরং আমিই তোমাকে রিজক (জীবন উপকরণ) দিয়ে থাকি। আর (মনে রেখো!) চূড়ান্ত সাফল্য মুত্তাক্বীদের জন্য। (২০ ত্বাহাঃ ১৩২)

সালাত পরিচিতিঃ আরবী মূল শব্দ "স্বালাহ" এর বহুবচন হলো "স্বালাওয়াত"। আমাদের সমাজে উর্দু উচ্চারণের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বলা হয় "সালাত"। আরবী অবিধানে সালাহ শব্দের অনেকগুলো অর্থ লিখা হয়েছে এর অন্যতম ৩টি হল প্রার্থনা করা, এবাদত করা, দ্বীন পালন করা, ইত্যাদি। সে মতে সালাতের আদেশ করার অর্থ দাঁড়ায়..

- মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করার তথা নিয়মিত নামায আদায় করার আদেশ করা,
- মহান আল্লাহর এবাদত করা তথা বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সকল বিষয়ে আল্লাহর বিধিবিধান মেনে নেওয়া ও মেনে চলার আদেশ করা
- আল্লাহর দ্বীন মেনে চলার তথা ইসলামকে জীবনের একমাত্র আদর্শ হিসেবে মেনে নেওয়ার এবং আল্লাহর আইন ও বিধানের আলোকে দেশ, জাতি ও সমাজ গঠন ও পরিচালনার আদেশ করা।

তাকওয়া ও মুত্তাক্বী পরিচিতিঃ আয়াতে বলা হয়েছে চূড়ান্ত সফলতা মুত্তাক্বীদের জন্য। মুত্তাক্বী শব্দটি এসেছে তাক্বওয়া থেকে আর তাক্বওয়ার মূল শব্দ বিক্বায়াহ অর্থ বেঁচে থাকা। সে মতে আল্লাহর ভয়ে যাবতীয় কুফর, শিরক ও পাপাচার থেকে বেঁচে থাকার নাম

তাক্বওয়া। আর যে ব্যক্তি তাক্বওয়া অর্জন করল সে-ই মুত্তাক্বী। উল্লেখ্য তাক্বওয়ার ৩টি স্তর রয়েছে। যথা.. অত্যাবশ্যকীয় তাক্বওয়া, আবশ্যকীয় তাক্বওয়া এবং পরিপূর্ণ তাক্বওয়া।

১ম স্তরঃ অত্যাবশ্যকীয় তাকওয়াঃ প্রতিটি মুসলিমের জন্য অত্যাবশ্যকীয় তাকওয়া হলো সকল প্রকার কুফর ও শিরক থেকে বেঁচে থাকা। মুসলিম পুরুষ নারী সবাইকে অত্যাবশ্যকীয়ভাবে এতটুকু তাকওয়া অর্জন করতেই হবে। কারণ কুফর বা শিরকে জড়িয়ে গেলে আর ঈমান বাঁচানো সম্ভব হয় না, তখন ঈমান বিনষ্ট হয়ে যায় আর ওই ব্যক্তি হয়ে যায় চির জাহান্নামী মুনাফিক।

২য় স্তরঃ আবশ্যকীয় তাকওয়াঃ প্রতিটি মুঅমিনের জন্য আবশ্যকীয় তাক্বওয়া হলো সকল প্রকার কাবীরাহ গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা। মুঅমিন হতে হলে এবং মুঅমিন হিসেবে জীবন যাপন করতে হলে অবশ্যই এতোটুকু তাকওয়া অর্জন করতে হবে। নতুবা ওই ব্যক্তি ফাসিক হয়ে যাবে এবং তার আখেরাত অনিশ্চিত হয়ে যাবে।

৩য় স্তরঃ পরিপূর্ণ তাকওয়াঃ অর্থাৎ ছোটবড় সকল প্রকার পাপ ও বদ-অভ্যাস থেকে বেঁচে থাকা, যা মানুষের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। মহান আল্লাহ্ই কেবল তার পছন্দের বান্দাকে এ তাকওয়ার অধিকারী করতে পারেন। (তাকওয়া সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ২য় অধ্যায়ে তাকওয়া পাঠ দেখে নিন)

অনুচ্ছেদঃ ১২. তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর ইদ্দত পালন করা

তালাকপ্রাপ্তা মুসলিম নারীর জন্য আরো একটি ফরজ দায়িত্ব হলো স্বামী তালাক দিলে অথবা আদালত কর্তৃক বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটলে তালাকের ইদ্দত পালন করা। ইরশাদ হচ্ছে..

তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীগণ (অন্য বিয়ে থেকে) নিজেকে বিরত রাখবে তিন ক্বুরু (এটাই তালাকের ইদ্দত। ২ বাক্বারাহঃ ২২৮)	وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

তালাকের ইদ্দতঃ ইদ্দত অর্থ গণনা করা, সংখ্যা পূর্ণ করা। তালাকপ্রাপ্তা নারীগণ অন্যত্র বিয়ে করার আগে একটি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। অপেক্ষার এ সময়কে বলা হয় তালাকের "ইদ্দত"।
স্বামী মারা যাবার পরও অন্যত্র বিয়ে হবার আগে স্ত্রীকে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। অপেক্ষার ওই সময়কে বলা হয় স্বামী মারার যাবার পরবর্তী ইদ্দত। তালাকপ্রাপ্তা নারীর ইদ্দত বা অপেক্ষার সময় নির্ধারন করা হয়েছে তিন ক্বুরু। উল্লেখ্য আরবী ক্বুরু শব্দটি দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথাঃ (১) ঋতু স্রাব (২) দুই স্রাবের মধ্যবর্তী সময়।

তালাক প্রাপ্তা নারীর ইদ্দতের মেয়াদ বর্ণনায় আল-কুরআনে শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে "ক্বুরু"। ক্বুরু শব্দের যেহেতু দুটি অর্থ আছে তাই ইসলামী শারীয়া'হ মতে তালাক প্রাপ্তা নারীগণ দুই ভাবে ইদ্দত পালন করতে পারবে। এ দুটি অর্থের একটিকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে ফক্বহী ইমামগণ দুই দলে ভাগ হয়ে গেছেন। যথা..
১. হানাফী আলীমগণ এখানে ঋতুস্রাব অর্থটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন তাই উনাদের মতে তালাকপ্রাপ্তা নারী ইদ্দত পালন করবে তিন স্রাব।
২. শাফিয়ী' আলীমগণ এখানে দুই স্রাবের মধ্যবর্তি সময়কে প্রাধান্য দিয়েছেন তাই উনাদের মতে তালাকপ্রাপ্তা নারীর ইদ্দত হবে (দুই স্রাবের মধ্যবর্তী) তিন পবিত্রতা।

তাকালপ্রাপ্তা নারীর যদি ঋতুস্রাব না হয় তবে তার ইদ্দত হবে ৩ মাস আর তালাক প্রাপ্তা নারী যদি গর্ভবতী হয় তবে তার ইদ্দত হবে সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত। মহান আল্লাহ তায়া'লা ইরশাদ করেন..

وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا **(4)**

আর যে সব নারীর ঋতুস্রাব (বন্ধ হয়ে গিয়েছে আর স্রাব) হওয়ার সম্ভাবনা নেই, তাদের ইদ্দতের ব্যাপারে তোমরা যাতে সংশয়ে না পড় (এ জন্য আল্লাহ অন্য ব্যবস্থা করে দিয়েছেন) তারা ইদ্দত পালন করবে ৩ মাস এবং যাদের এখনো ঋতুস্রাব হয়নি তারাও (ইদ্দত পালন করবে ৩ মাস।) আর গর্ভবতী নারীরা ইদ্দত পালন করবে তাদের সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত। যে ব্যক্তি আল্লাহর তাকওয়া অর্জন করে আল্লাহ তার কাজকে সহজ করে দেন। (৬৫ তালাকঃ ৪)

বিঃ দ্রঃ = ঋতুস্রাব গনণার ব্যাপারে ভুক্তভোগী নারীর নিজের কথাই চূড়ান্ত কথা বলে বিবেচিত হবে। সে মিথ্যা বললে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করবে। আদালত, সরকার ও সমাজকে তার কথার উপর ভিত্তি করেই ফয়সালা দিতে হবে। উল্লেখ্য বাংলাদেশসহ অনেক দেশের সরকার (স্রাব ওয়ালী ও স্রাবহীন সকল নারীদের জন্যই) ৩ মাসকে নির্ধারণ করে ফেয়েছে।

প্রসঙ্গিক আলোচনাঃ তালাক

তালাক পরিচিতিঃ বিবাহ একটি সামাজিক ও ধর্মীয় বন্ধন, বিবাহের মাধ্যমে একজন পুরুষ ও একজন নারী একে অপরের আপন হয়ে যায় এবং উভয়ে মিলে শুরু করে নতুন সংসার। শুরু হয় প্রেমময় জীবনের নতুন যাত্রা। কিন্তু মাঝে মাঝে সংগত কারণেই এ বিবাহ ভেঙ্গে ফেলার প্রয়োজন হয়। বিবাহ ভঙ্গের জন্য শারীয়া'হ আইন সম্মত যে বৈধ পদ্ধতি রেয়ছে এটাই তালাক নামে পরিচিত। ইসলামী শারীয়া'হ মতে তালাক দেওয়ার জন্যও ঠিক করা আছে নির্ধারিত ধরণ ও পদ্ধতি।

তালাক দেয়ার ধরণ ও পদ্ধতিঃ বিয়ের জন্য পুরুষ ও নারী উভয়ের সম্মতির প্রয়োজন হয়। পুরুষ বা নারী কোনো এক জনের আপত্তি থাকলে বিয়ে শুদ্ধ হয় না। তালাক কিন্তু এমন নয়। তালাক যেহেতু সম্পর্ক নষ্ট করার বিষয়। তাই এটা..

- পুরুষ ও নারী উভয়ের সম্মতিতে হতে পারে;
- শুধু পুরুষের পক্ষ থেকে হতে পারে;
- শুধু নারীর পক্ষ থেকেও হতে পারে।

উভয়ের সম্মতিতে তালাকঃ স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের সম্মতিতে তালাক দিতে হলে উত্তম পদ্ধতি হল এক তালাক দিয়ে সমাপ্ত করা। আর এটাই তালাকের উত্তম পদ্ধতি এবং এতে বেশ কিছু সুবিধাও পাওয়া যায়। যে আলোচনা সামনে আসছে, ইন শা-আল্লাহ।

পুরুষের পক্ষ থেকে তালাকঃ পুরুষের পক্ষ থেকে তালাক দেওয়া হলে উত্তম পদ্ধতি হল এক তালাক দিয়ে সমাপ্ত করা। স্বামী এক তালাক দিয়ে সমাপ্ত করবে এবং স্ত্রী ইদ্দত পূর্ন হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। স্বামী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে বিবাহ রক্ষার আইনগত ব্যবস্থা না নিলে ইদ্দত পূর্ন করার পর স্ত্রী তার পছন্দ মত অন্য পুরুষকে বিয়ে হতে পারবে।

নারীর পক্ষ থেকে তালাকঃ কোনো নারী যদি নিজ থেকে বিবাহ ভেঙ্গে দিতে চায় তবে তাকে নিম্নের ৩টি পদ্ধতির যে কোনো ১টি বেঁছে নিতে পারবে..

পদ্ধতিঃ ১. বিয়ের সময়ে বা পরে নারী যদি তার স্বামী থেকে তালাকের ক্ষমতা নিয়ে থাকে তবে প্রদেয় ক্ষমতা বলে স্ত্রী নিজেই নিজেকে তালাক দিতে পারবে এবং তখনও উত্তম হল এক তালাক দিয়ে ছেড়ে দেওয়া।
স্বামী থেকে তালাকের ক্ষমতা না নিয়ে থাকলে; নারী নিজে /পরিবারের মাধ্যমে /সমাজের মাধ্যমে তার স্বামীকে তালাকের জন্য অনুরোধ করতে পারবে

পদ্ধতিঃ ২. নারী ইচ্ছা করলে কোনোকিছুর বিনিময়ে স্বামীর সাথে তালাকের চুক্তি করতে পারবে। বিনিময় দিয়ে তালাক নেয়ার পদ্ধতিকে খুলা বলা হয়। খুলা এক তালাক বাইনের সমান, খুলার মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে যায় এবং তখন স্বামীর হাতে আর কোনো ক্ষমতা থাকে না।

পদ্ধতিঃ ৩. স্ত্রী চাইলে বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য আদালতে যেতে পারবে। আদালত তালাক দিতে পারবে না তবে বিবাহ ভেঙ্গে দিতে পারবে। আদালতের মাধ্যমে বিবাহ ভঙ্গ করা হলে তালাক বাইনের বিধান আর্যকর হবে। আদালতের ঘোষনার মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে যায় এবং তখন স্বামীর হাতে আর কোনো ক্ষমতা থাকে না।

তালাকের প্রকার ভেদঃ ইসলামী বিধানে তালাক দুই প্রকার হয়ে থাকে। যথাঃ রাজয়ী' তালাক ও বাইন তালাক।

ক. রাজয়ী' তালাকঃ বিবাহ ভঙ্গের জন্য দুই প্রকার তালাক রয়েছে। এরমধ্যে এক প্রকার তালাক হল রাজয়ী' তালাক তথা প্রত্যাবর্তনশীল তালাক। তালাক দেবার উত্তম পন্থা হল এক তালাক রাজয়ী' একবার দিয়েই বিষয়টির সমাপ্তি ঘটানো। এতে কিছু বাড়তি সুবিধা পাওয়া যায়। যেমন..

- রাজয়ী' তালাকে তৎক্ষণাৎ বিবাহ বিচ্ছেদ হয় না বরং স্ত্রীর ইদ্দত পূর্ন হয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা হয়।
- রাজয়ী' তালাক ১ম বার বা ২য় বার দেয়ার পরও বিবাহ ঠিকিয়ে রাখার জন্য স্বামীর হাতে বিধিবদ্ধ ক্ষমতা থাকে।
- রাজয়ী' তালাক দেওয়ার পর স্বামী চাইলে স্ত্রীর ইদ্দতের ভিতর স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারবে। তবে ইদ্দত পার হয়ে গেলে আর পারবে না।
- ১ম ও ২য় বার রাজয়ী' তালাক দেওয়ার পর স্ত্রীর ইদ্দত পার হয়ে গেলে এ তালাক বাইন তালাকে রূপান্তরিত হয়ে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়।
- ১ম ও ২য় বার (রাজয়ী বা বাইন যে কোনো) তালাকের মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেলে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে একে অপরের জন্য অন্য দশজন নারী পুরুষের মত হয়ে যায়, তখন স্ত্রী ইচ্ছা করলে অন্য পুরুষকে বিয়ে করতে পারবে আর উভয়ের সম্মতি হলে আবার তারা একে অপরকে বিয়ে করতে পারবে। ফিক্বহী পরিভাষার এর নাম তাজদীদু নিকাহ বা বিবাহ নবায়ন।

খ. বাইন তালাকঃ বাইন অর্থ ভঙ্গকারী, বাইন তালাকের মাধ্যেমে ততক্ষনাৎ বিবাহ ভঙ্গ হয়ে বিচ্ছেদ ঘটে যায়। বাইন তালাকের পর বিবাহ ঠিকিয়ে রাখার আর সুযোগ থাকে না। বাইন তালাকের পর স্বামী চাইলেও এ বিবাহ আর ঠিকাতে পারবে না। বাইত তালাকের পর সাথে সাথে এ যোগল অন্য দশজন নারী পুরুষের মত হয়ে যায়। তবে ১ম বার বা ২য় বার এমন তালাকের পরও তারা উভয়ে সম্মত হলে আবার বিয়ে করতে পারবে, বাইন তালাকের পর পুনরায় ঘর বাধার এটাই বৈধ একমাত্র পদ্ধতি, এ সুযোগ দুইবার ব্যবহার করা যায়, ৩য় বার আবার তালাক দিলে বিবাহ নবায়নের সুযোগ আর থাকে না।

৩ তালাক ও মুগা'ল্লাজাহঃ তালাক বৈধ হলেও সংসার ভাঙ্গা যেহেতু ভালো কাজ নয়, তাই তাকালের পরও সংসার ঠিকিয়ে রাখার জন্য ইসলাম মানুষকে ২ বার সুযোগ দিয়েছে। দুই বারের পর পুনরায় (রাজয়ী বা বাইন যে কোনো প্রকার) তালাক দিলে কঠিনভাবে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়, তখন ওই স্বামী ও স্ত্রী একে অপরের জন্য মুগা'ল্লাযাহ (কঠিনভাবে হারাম) হয়ে যায় এবং পুনরায় বিবাহ নবায়নের সুযোগও বন্ধ হয়ে যায়, তখন তারা চাইলেও আর বিয়ে করতে পারবে না।
তবে ওই নারী যদি অন্য পুরুষকে বিয়ে করে এবং (স্বভাবিক নিয়মে) তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে তখন মুগা'ল্লাযাহ ভেঙ্গে গিয়ে আবার উভয়ের বিবাহ বৈধ হয়ে যায়। এ ব্যাপারে বিধান দিয়ে নাযিল হয়েছে..
(দুই বারের পর) পুনরায় তালাক দিলে (তিন তালাক পূর্ণ হয়ে যায়। তখন) এ পুরুষের জন্য ওই স্ত্রী আর বৈধ থাকে না। (বরং কঠিনতম হারাম হয়ে যায়) তবে স্ত্রী যদি (নিয়ম মত) অন্য স্বামীকে বিয়ে করে এবং ২য় স্বামী তালাক দেয় (বা মারা যায়) আর উভয়ে (নারী ও তার ১ম স্বামী) মনে করে এখন তারা আল্লাহর বিধান মেনে চলতে পারবে তবে (ওই নারী তার ১ম স্বামীর সাথে) পুনরায় বিয়ে করতে (আইনগত) বাধা থাকে না। এটা হল আল্লাহর নির্ধারিত সীমানা (বিধান।) তিনি এটা বর্ণনা করছেন জ্ঞানীলোকদের তরে। (২ বাকারাহঃ ২৩০)

আইন ও বিধানঃ

- ১ম বার রাজয়ী' তালাক (১ তালাক রাজয়ী') দিলে স্বামী চাইলে স্ত্রীর ইদ্দতের ভিতর এ তালাক ফিরিয়ে নিতে পারবে। তাই স্ত্রীর জন্য উত্তম হল স্বামীর ঘরে ইদ্দত পূর্ণ করা এবং ইদ্দতের ভিতর উত্তম রূপে সাজ গোঁজ করা।
- ২য় বার রাজয়ী তালাক (২ তালাক রাজয়ী') দিলে স্বামী চাইলে স্ত্রীর ইদ্দতের ভিতর এ তালাক ফিরিয়ে নিতে পারবে। তাই স্ত্রীর জন্য উত্তম হল স্বামীর ঘরে থেকে ইদ্দত পূর্ণ করা এবং ইদ্দতের ভিতর উত্তম রূপে সাজ গোঁজ করা।

- ১ম বার বাইন তালাক (১ তালাক বাইন) দিলে স্বামীর হাতে আর ক্ষমতা থাকে না। স্বামী চাইলেও এ তালাক আর ফিরিয়ে নিতে পারবে না। বরং সঙ্গে সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে এবং তারা উভয়ে অন্য দশ জনের মত সাধারন নারী পুরুষে পরিণত হবে। তবে স্বামী চাইলে এবং স্ত্রী সম্মতি দিলে উভয়ে আবার বিয়ে করতে পারবে। ফিক্বহের পরিভাষায় একে বলা হয় "তাজদীদু-ন-নিকাহ" তথা বিবাহ নবায়ন।
- ২য় বার বাইন তালাক (২ তালাক বাইন) দিলে স্বামীর হাতে আর ক্ষমতা থাকে না। স্বামী চাইলেও এ তালাক আর ফিরিয়ে নিতে পারবে না। বরং সঙ্গে সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে এবং তারা উভয়ে অন্য দশ জনের মত সাধারন নারী পুরুষে পরিণত হবে। তবে স্বামী চাইলে এবং স্ত্রী সম্মতি দিলে উভয়ে আবার বিয়ে করতে পারবে। ফিক্বহের পরিভাষায় একে বলা হয় "তাজদীদু-ন-নিকাহ" তথা বিবাহ নবায়ন।
- ১ম বার রাজয়ী' তালাক (১ তালাক রাজয়ী') দেবার পর ইদ্দত পার হয়ে গেলে এ তালাক বাইনে রূপান্তরিত হয়ে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়। স্ত্রী ইচ্ছা করলে তখন অন্য পুরুষকে বিয়ে করতে পারবে আর চাইলে ১ম স্বামীকে পুনরায় বিয়ে করতে পারবে।
- অনুরুপ ভাবে ২য় বার রাজয়ী' তালাক দিয়ে ইদ্দত পার হয়ে যাবার পর স্ত্রী ইচ্ছা করলে অন্য পুরুষকে বিয়ে করতে পারবে। আর চাইলে তার ১ম স্বামীকে পুনরায় বিয়ে করতে পারবে।

ইসলামী শারীয়া'হ মানুষকে ২ বার এ সুযোগ দিয়েছে, ৩য় বার তালাক দিলে আর এ সুযোগ থাকে না। তখন স্বামী-স্ত্রী একে অপরের জন্য কঠিনতর হারাম হয়ে যায়। ফিক্বহের পরিভাষায় একে বলা হয় "মুগা'ল্লাযাহ। তবে স্ত্রী যদি অন্য পুরুষকে বিয়ে করে এবং (তালাক বা স্বামী মরার মাধ্যমে) স্বাভাবিকভাবে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে তখন ওই নারী চাইলে তার ১ম স্বামীকে পুনরায় বিয়ে করতে পারবে।

তালাক দেওয়ার পদ্ধতিঃ তালাক দেওয়ার বেশ কয়েকটি পদ্ধতি রয়েছে। যথা..

পদ্ধতিঃ ১. উত্তম পদ্ধতিঃ তালাকের উত্তম পদ্ধতি হল এক তালাক দিয়ে ছেড়ে দেয়া। ফিক্বহের পরিভাষায় একে বলা হয় "আহসান তালাক" তথা তালাক দেবার উত্তম পদ্ধতি। এতে দুটো সুবিধা পাওয়া যায়। যেমন..

সুবিধাঃ ১. স্বামী চাইলে ইদ্দতের ভিতর তালাক ফিরিয়ে নিয়ে সংসার ঠিকিয়ে রাখতে পারবে।

সুবিধাঃ ২. ইদ্দত পার হয়ে গেলে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। তখন স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে তারা সাধারণ নারী পুরুষে পরিণত হবে। তখন স্ত্রী ইচ্ছা করলে তার পছন্দ মত অন্য পুরুষকে বিয়ে করতে পারবে অথবা আবার নতুন করে ১ম স্বামীকে বিয়ে করতে পারবে। ফিক্বহের পরিভাষার এর নাম বিবাহ নবায়ন। এভাবে দুই বার করা যায়।

এক এক করে তালাক দেওয়ার সুবিধাঃ উপরে বলা হয়েছে এক তালাক দিয়ে ছেড়ে দিলে দুটি সুবিধা পাওয়া যায়। এর একটি হচ্ছে উভয়ে সম্মত হলে পরে আবার বিবাহ নবায়ন করা যায়। এ ভাবে ২ বার করা যায়। এ ব্যাপারে বিধান দিয়ে নাযিল হয়েছে..

তালাক দুই বার (দেওয়া যায়। ১ম ও ২য় বার তালাক দেওয়ার পর স্বামী চাইলে স্ত্রীকে) আইনগত ভাবে ফিরিয়ে রাখবে অথবা সুন্দর ভাবে বিদায় দেবে। স্ত্রীকে দেয়া (মোহর বা উপহার থেকে) কিছু রেখে দেয়া (স্বামী/স্বামী পরিবারের জন্য) বৈধ নয়। স্বামী-স্ত্রী যদি মনে করেঃ তারা আল্লাহর বিধান (পরস্পরের অধিকার) মেনে চলতে পারবে না এবং তোমরা (অভিভাবক/আদালত/সমাজ/সরকার) ও যদি মনে করঃ তারা আল্লাহর বিধান মেনে চলতে পারবে না, আর এমতাবস্থায় স্ত্রী (যদি তালাক চায় এবং) তালাকের বিনিময়ে স্বামীকে কিছু দেয় তবে এটা গ্রহণ করা যাবে। (মনে রেখো!) এসব হলো আল্লাহর সীমানা (তথা বিধান, তাই) তোমরা এসব অতিক্রম করো না। কারণ যারা আল্লাহর সীমানা অতিক্রম করে তারা অপরাধী। (২ বাকারাহঃ ২২৯)

আইন ও বিধানঃ তালাক রাজয়ী' হোক বা বাইন, তিনবার তালাক দেবার পর স্বামী-স্ত্রী একে অপরের জন্য কঠিনতর হারাম হয়ে যায়। ফিক্বহের পরিভাষায় একে বলা হয় "মুগা'ল্লাযাহ"। মুগা'ল্লাযাহ হয়ে গেলে স্বামী-স্ত্রী আর একে অন্যের জন্য হালাল থাকে না। তখন ওই নারী যদি স্বাভাবিক ভাবে অন্য পুরুষকে বিয়ে করে এবং তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে তখন ১ম স্বামীর জন্য সে আবার স্বাভাবিক হতে পারবে এবং চাইলে ১ম স্বামীকে আবার বিয়ে করতে পারবে। তবে হিল্লা বিয়ের নামে আমাদের সমাজে যে নাটক করা হয় এটা দ্বীন নিয়ে তামাশার শামিল। দ্বীন নিয়ে এমন তামাশা করা কোনো অবস্থাতেই বৈধ নয়।

পদ্ধতিঃ ২. বৈধ পদ্ধতিঃ স্ত্রীর যখন স্রাব থাকে না তখন ১ম তালাক দেওয়া, তারপর আবার স্রাব এসে চলে যাবার পর আবার ১ তালাক দেওয়া, তারপর আবার স্রাব এসে চলে যাবার পর ৩য় তালাক দেওয়া। এটা হল তালাকের বৈধ পদ্ধতি।

পদ্ধতিঃ ৩. অবৈধ পদ্ধতিঃ একসাথে ৩ তালাক দেওয়া তালাকের অবৈধ পদ্ধতি। কুরআন বা হাদীছে এক সাথে ৩ তালাক দেওয়ার কোনো বৈধতা পাওয়া যায় না। মহান আল্লাহ ৩ বারে ৩ তালাকের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, যা সূরাহ বাকারার ২২৯তম আয়াত থেকে বুঝা যায়। একত্রে ৩ তালাক দিলে তা পতিত হবে কি না? এ ব্যাপারে ফাক্বীহ ইমামদের থেকে ৩ টি অভিমত পাওয়া যায়। যথা..

অভিমতঃ ১. একত্রে ৩ তালাক দিলে তালাক হয়ে যাবে, যদিও এটি অবৈধ কাজ। হানাফী আলীমগণ সাধারনত এ অভিমতটি মেনে চলেন

অভিমতঃ ২. একত্রে ৩ তালাক দিলে তালাক হবে না, কারনঃ এটি অবৈধ কাজ। শাফিয়ী আলীমগণ সাধারনত এ অভিমতটি মেনে চলেন

অভিমতঃ ৩. একত্রে ৩ তালাক দিলে ১ তালাক হবে, কারণ সে তালাক দিয়েছে তাই তালাক হবে আর ৩ হবে না কারণ এটি অবৈধ কাজ। এ অভিমতটি ইবনু তাইমিয়্যাহর অভিমত হিসেবে খ্যাত।

পদ্ধতিঃ ৪. বাইন তালাকঃ বাইন তালাক বিবাহ বিচ্ছেদকারী তালাক। বাইন তালাক দিলে সাথে সাথে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়। বাইন তালাক দেবার পর স্বামীর হাতে আর ক্ষমতা থাকে না। স্বামী চাইলেও এ তালাক আর ফিরাতে পারবে না। তখন তারা হয়ে যায় অন্য দশজন নারী পুরুষের মত। অর্থাৎ ১ম ও ২য় বার এমন তালাক দেবার পর উভয়ের সম্মতি হলে তারা আবার বিয়ে করতে পারবে। বাইন তালাক দেওয়ার অনেকগুলো পদ্ধতি রয়েছে। যেমন.. তালাক দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে বউকে বলাঃ

- "তুমি আমার জন্য হারাম হয়ে গেছো"
- "আমার ঘর থেকে বের হয়ে যাও"
- স্বামী কোনো শর্ত দিয়ে যদি বলে "এমন করলে তুমি তালাক হয়ে যাবে" আর স্ত্রী যদি কাজটি করে ফেলে।
- "ইলা" করলেও বাইন তালাক পতিত হয় (এ সম্পর্কে আলোচনা সামনে আসিছে)
- "খুলা" করলেও বাইন তালাক হয় (এ সম্পর্কে আলোচনা সামনে আসিছে)
- সরকার বা আদালত কর্তৃক বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটালেও বাইন তালাক হয়, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

পদ্ধতিঃ ৫. ইলাঃ স্ত্রীর সাথে সঙ্গম না করার কসমকে "ইলা" বলে। এমন কসম করা অনৈতিক। এতে স্ত্রীর অধিকার নষ্ট হয়। তখনকার সময়ে আরব সমাজের প্রথা মত "ইলা" করলে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যেত। কিন্তু ইসলামী বিধানে "ইলা"কারীকে ৪ মাস অবকাশ দেয়া হয়। এ ব্যাপারে বিধান দিয়ে নাযিল হয়েছে..

(হে মুসলিমগণ!) তোমাদের যারা স্ত্রীর সাথে "ইলা" করবে তাদেরকে ৪ মাস সময় দেয়া হল। (৪ মাসের মধ্যে ইলা ভঙ্গ করে) ফিরে এলে (বিবাহ বহাল থাকবে।) আল্লাহ গাফূর রাহী'ম। (ইলা করার পর যদি ৪মাস অতিবাহিত হয়ে যায়) আর তোমরা যদি (ইলা ভঙ্গ না করে) তালাকের সিদ্ধান্ত করে ফেলো (তবে ৪ মাস পর স্বয়ংক্রিয় ভাবেই বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে।) আল্লাহ সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী। (বাকারাহঃ ২২৬-২২৭)

আইন ও বিধানঃ স্ত্রীর সাথে সঙ্গম না করার কসমকে "ইলা" বলে। এমন কসম করা অনৈতিক। এতে স্ত্রীর অধিকার নষ্ট হয়। তখনকার সময়ে আরব সমাজের প্রথা মত "ইলা" করলে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যেত। কিন্তু ইসলামী বিধানে "ইলা"কারীকে ৪ মাস অবকাশ দেয়া হয়।

ইলা করার ৪ মাসের মধ্যে স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করলে ইলা ভঙ্গ হয়ে যায় এবং কসম ভঙ্গের কাফফারাহ দিতে হয়। চার মাসের মধ্যে ইলা ভঙ্গ করে কাফফারাহ দিয়ে দিলে বিবাহ বিচ্ছেদ হয় না।

চার মাসের মধ্যে স্ত্রীর কাছে না গেলে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে যায় এবং ১ তালাক বাইন এর বিধান কার্যকর হয়। তখন স্বামীর হাতে আর ক্ষমতা থাকে না বরং ক্ষমতা চলে যায় স্ত্রীর হাতে। স্ত্রী ইচ্ছা করলে ইদ্দতের ভত্র বা ইদ্দতের পর ইদ্দতের পর ১ম স্বামীকেও বিয়ে করতে পারবে, আর ইদ্দত সমাপ্ত হয়ে গেলে যে কোনো পুরুষকে বিয়ে করতে পারবে।

পদ্ধতিঃ ৬. খুলাঃ তালাকের একটি পদ্ধতি হচ্ছে "খুলা"। স্ত্রী ইচ্ছা করলে স্বামীকে কিছু দেয়ার বিনিময়ে চুক্তি করে তালাক নিতে পারবে। কোনোকিছুর বিনিময়ে চুক্তি করে তালাক নেয়াকে "খুলা" বলা হয়। খুলার মাধ্যমে ১ তালাক বাইনের বিধান কার্যকর হয়।

পদ্ধতিঃ ৭. বিবাহ বিচ্ছেদঃ স্ত্রী চাইলে বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য আদালতে যেতে পারবে। আদালত তালাক দিতে পারবে না তবে বিবাহ ভেঙ্গে দিতে পারবে। আদালতের মাধ্যমে বিবাহ ভেঙ্গে দিলে ১ তালাক বাইনের বিধান কার্যকর হয়।

তালাক ফিরানোঃ রাজয়ী তালাক দিলে স্ত্রীর ইদ্দত পূর্ন হবার আগ পর্যন্ত স্বামী তা ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকার রাখে। তবে তালাক বাইন হলে বা সাধারন তালাকে ইদ্দত পার হয়ে গেলে স্বামী আর এ অধিকার রাখে না। এ ব্যাপারে নাযিল হয়েছে..

তালাকের পর স্ত্রীগণ ইদ্দতের সীমানায় পৌঁছে গেলেও তোমরা নিয়ম মত তাদেরকে ফিরিয়ে রাখতে পারবে অথবা আইনগতভাবে ত্যাগ করতে পারবে। তবে স্ত্রীকে কষ্ট দেওয়ার জন্য এমন করলে পাপ হবে। তোমরা আল্লাহর বিধান নিয়ে উপহাস করো না। আল্লাহর নিয়ামত স্মরণ কর। তিনি তোমাদের দিয়েছেন কিতাব ও হিকমাহ (সুন্নাহ,) যেন তোমরা (এর বিধান সমূহ) মেনে নাও। তোমরা আল্লাহর তাক্বওয়া অর্জন করো। (জেনে রাখো!) আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে মহাজ্ঞানী। (আল্লাহর ভয়ে কুফর শিরক ও পাপাচার থেকে বেঁচে থাকাকে তাকওয়া বলে) (বাকারাহঃ ২৩১)

আইন ও বিধানঃ রাজয়ী' তালাকের পর স্ত্রী ইদ্দতের সীমানায় পৌছে গেলেও স্বামী ইচ্ছা করলে তালাক ফিরিয়ে নিতে পারবে। তবে ইদ্দত শেষ হয়ে গেলে আর পারবে না, বাইন তালাক দিলেও পারবে না। স্ত্রীকে তালাক দেবার পর কষ্ট দেবার কু-মতলবে ফিরিয়ে আনা অন্যায় ও পাপ।

বিবাহ নবায়ন স্বামী-স্ত্রীর অধিকারঃ তালাক রাজয়ী হক বা বাইন। ১ম বার বা ২য় বার তালাকের পর ইদ্দত পূর্ন হয়ে যাওয়া স্বত্বেও প্রাপ্তন স্বামী-স্ত্রী যদি পুনরায় সংসার করতে চায় তবে তাদের জন্য সুযোগ রয়েছে, তারা বিবাহ নবায়নের মাধ্যমে এ সুযোগ গ্রহন করতে পারবে। এটা আল্লাহ প্রদত্ব অধিকার। কেউ যেন তাদের এ অধিকার খর্ব না করে এজন্য সবাইকে সাবধান করে দিয়েছে আল-কুরআন। ইরশাদ হচ্ছে..

পটভূমিঃ মা'ক্বাল বিন ইয়াসার রাঃ'র বোনের বিয়ে হয়েছিল আবু-ল-বাদ্দা রাঃ'র সাথে। এক পর্যায়ে আবু-ল-বাদ্দা স্ত্রীকে তালাক দিলেন, স্ত্রীর ইদ্দত পূর্ণ হয়ে গেল। আবু-ল-বাদ্দা পুনরায় বিয়ের প্রস্তাব পাঠালেন, স্ত্রীও রাজি হয়ে গেলেন। কিন্তু বাঁধ সাধলেন মা'ক্বাল। তিনি বোনকে বললেন আরেকবার একে বিয়ে করলে তোর মুখ দেখা আমার জন্য হারাম হয়ে যাবে। এ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হয়েছে..

(হে মুসলিমগণ!) তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর ইদ্দত পূর্ণ হবার পর তারা উভয়ে নিয়মতান্ত্রিকভাবে পুনরায় বিয়ে করতে চাইলে তোমরা বাধা দিও না। এ নির্দেশ তাদের জন্য যারা আল্লাহ ও আখেরাতে ঈমান রাখে। এটা তোমাদের জন্য পরিচ্ছন্ন ও স্বচ্ছ (জীবন যাপনের উত্তম ব্যবস্থা। আসলে কোনটি ভাল আর কোনটি মন্দ, তা) আল্লাহই ভালো জানেন, তোমরা জানো না। (২ বাকারাহঃ ২৩২) (এ আয়াত নাযিলের পর মা'ক্বাল রাঃ বোনকে তার সাবেক স্বামীর সাথে বিয়ে দিয়ে ছিলেন)

তালাক সম্পর্কে প্রয়োজনীয় কিছু বিধানঃ

বিধানঃ ১. তালাক অর্থ বিবাহ বিচ্ছেদ। এক তালাক মানে একবার বিবাহ বিচ্ছেদ আর দুই তালাক মানে দুইবার বিবাহ বিচ্ছেদ। ইসলামী বিধানে তালাক দুই প্রকার। যথাঃ

- প্রত্যাবর্তনশীল তালাক। যে তালাক ফিরিয়ে আনা যায়। এর নাম রাজয়ী' তালাক।
- বিচ্ছিন্নকারী তালাক বা বাইন তালাকঃ যে তালাক বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিয়ে ফেলে, যে তালাক আর ফিরিয়ে নেওয়া যায় না।

বিধানঃ ২. স্পষ্টভাবে তালাক শব্দ উচ্চারন করে তালাক দিলে রাজয়ী' তালাক হয়। যেমনঃ কেউ তার স্ত্রীকে বললঃ আমি তোমাকে তালাক দিলাম। এতে ১ তালাক রাজয়ী' হয়।

বিধানঃ ৩. ইঙ্গিতমূলক শব্দ ব্যবহার করে তালাক দিলে বাইন হয়। যেমন কেউ তার স্ত্রীকে বললঃ তুমি আমার জন্য হারাম হয়ে গেছ, আমার ঘর থেকে বেরিয়ে যাও, ইত্যাদি।

তালাকের উদ্দেশ্যে এমন শব্দ ব্যবহার করলে ১ তালাক বাইন হয়। আর স্ত্রীকে ভয় দেখানোর জন্য বা উদ্দেশ্যহীনভাবে এমন করলে তালাক হয় না।

স্বামী যদি স্ত্রীকে কোনো শর্ত দিয়ে বলে "অমুকের ঘরে গেলে বা অমুক কাজ করলে তুমি তালাক হয়ে যাবে"। এরপর স্ত্রী যদি একাজ করে ফেলে তখন এক তালাক বাইন হয়।

বিধানঃ ৪. ১ বার বা ২ বার রাজয়ী' তালাক দেয়ার পর স্বামী চাইলে স্ত্রীর ইদ্দতের মধ্যে তালাক ফিরিয়ে আনতে পারবে। রাজয়ী তালাক ফিরিয়ে আনার নিয়ম হল মুখে বলবেঃ আমি তালাক ফিরিয়ে নিলাম, স্ত্রীকে চুম্বন করলে বা সঙ্গম করলেও রাজয়ী' তালাক ফিরিয়ে নেয়া হয়।

বিধানঃ ৫. রাজয়ী তালাকের পর ইদ্দত পার হয়ে গেলে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়। অর্থাৎ তখন রাজয়ী' তালাক বাইনে রূপান্তরিত হয়। তখন ওই মহিলা তার ইচ্ছামত যে কাউকে বিয়ে করতে পারবে, চাইলে প্রথম স্বামীকেও বিয়ে করতে পারবে। ২৩২তম আয়াতে এ বিধানই বর্ণিত হয়েছে।

বিধানঃ ৬. বাইন তালাক ১বার দিলেও বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়। তখন স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে স্বামীর ক্ষমতা থাকে না। তখন সংসার ঠিকিয়ে রাখার একমাত্র পথ বিবাহ নবায়ন। উভয়ের সম্মতিতে (ইদ্দতের মধ্যে বা ইদ্দতের পর) যে কোনো সময় তারা আবার বিয়ে করতে পারবে। রাজয়ী বা বাইন; যেকোনো তালাক ১বার বা ২বার দিলে এমন করা যায়। ৩তালাক দিলে আর সুযোগ থাকে না।

বিধানঃ ৭. রাজয়ী বা বাইন, কোনো প্রকার প্রদেয় তালাক রহিত হয় না। রাজয়ী' তালাক ফিরিয়ে নিলে বা বাইন তালাকের পর পুনরায় বিয়ে করলেও এ তালাক রয়ে যায়। অর্থাৎ এক তালাকের পর স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনলে আর ২ তালাক বাকি থাকবে, ২ তালাকের পর ফিরিয়ে আনলে আর ১ তালাক বাকি থাকবে।

বিধানঃ ৮. তালাক প্রাপ্ত নারীর ইদ্দত তিন "কুরু"। আরবী কুরু শব্দটি দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। মেয়েদের মাসিক স্রাবকে কুরু বলে। আবার দুই স্রাবের মধ্যবর্তী পবিত্রতার সময়কেও কুরু হলা হয়।

বিধানঃ ৯. হানাফী উলামাগণ কুরআনে বর্ণিত কুরু শব্দকে স্রাব অর্থে নিয়েছেন। তাই হানাফীদের মতে তালাকের ইদ্দত তিন স্রাব। আর শাফিয়ী' উলামাগণ নিয়েছেন পবিত্রতা অর্থে। তাই তাদের মতে তালাকের ইদ্দত তিন পবিত্রতা।

বিধানঃ ১০. ইদ্দতরত স্ত্রীর উচিত তার স্রাবের দিন তারিখ সম্পর্কে সঠিক তথ্য দেওয়া। এমনকি তার জরায়ুতে ভ্রূণ তৈরি হলে তাও বলে দেবে। এটা তার দায়িত্ব।

বিধানঃ ১১. স্ত্রী অবাধ্য হলে নিয়ম হলঃ প্রথমে বুঝানো। তাতে কাজ না হলে বিছানা আলাদা করে দিতে হয়। তাতেও সংশোধন না হলে হাল্কা সাজা দিতে হয়। তাতেও কাজ না হলে উভয় পরিবারের সালিশ ডেকে সতর্ক করে দিতে হয়। তাতেও কাজ না হলে এবং স্বামী তালাক দিতে চাইলে এক তালাক রাজয়ী দিয়ে ছেড়ে দিতে হয়।

বিধানঃ ১২. একত্রে তিন তালাক দেয়া বৈধ নয়। তবে অধিকাংশ আলীমের মতে দিলে হয়ে যায় কিন্তু এমন করলে পাপ হয়।

স্ত্রী যদি তালাক বা বিচ্ছেদ চায়ঃ স্ত্রী সরাসরি নিজেকে বা স্বামীকে তালাক দিতে পারে না। তবে অধিকার বঞ্চিত হয়ে বা নির্যাতন সহ্য করে ঘর সংসার করতেও স্ত্রী বাধ্য নয়। স্ত্রী তালাক চাইলে বা বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে চাইলে তার জন্য বেশ কয়েকটি পথ খোলা রেখেছে ইসলামী শারীয়াহ। যেমন..

পথঃ ১. স্বামী যদি তার স্ত্রীকে তালাকের ক্ষমতা অর্পণ করে থাকে তবে প্রদেয় ক্ষমতা বলে স্ত্রী নিজেকে তালাক দিতে পারবে। একে বলা হয় তাফওয়ীজ তালাক। আর এ ক্ষমতাকে বলা হয় "প্রদেয় ক্ষমতা" যার ইংলিশ হল "ডেলিগেটেড পাওয়ার"।
স্ত্রী বা তার পরিবার চাইলে বিবাহকালে অথবা বিয়ের পর যে কোনো সময় স্বামী থেকে (লিখিত বা মৌখিক) তালাকের ক্ষমতা নিয়ে নিতে পারবে। তখন স্ত্রী প্রদেয় ক্ষমতা বলে নিজেকে তালাক দিয়ে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারবে।

পথঃ ২. স্ত্রী ইচ্ছা করলে স্বামীর কাছে তালাক চাইতে পারবে, তালাকের জন্য স্বামীকে অনুরোধ করতে পারবে। এমনকি কিছু দেয়ার বিনিময়ে হলেও চুক্তি করে তালাক নিতে পারবে। কোনো কিছুর বিনিময়ে চুক্তি করে তালাক নেয়াকে "খুলা" বলা হয়। খুলা এক বাইন তালাকের সমান হয় এবং এতে ১ তালাক বাইনের বিধান কার্যকর হয়।

পথঃ ৩. স্ত্রী চাইলে বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য আদালতে যেতে পারবে। আদালত তালাক দিতে পারবে না তবে বিবাহ ভেঙ্গে দিতে পারবে। আদালতের মাধ্যমে বিবাহ ভেঙ্গে দিলে এক তালাক বাইনের সমান হয় এবং এতে ১ তালাক বাইনের বিধান কার্যকর হয়।

পথঃ ৪. অন্য সব কাজের মত তালাকের জন্যও উকিল নিযুক্ত করা যায় বা প্রতিনিধি বানানো যায় বা নিজের স্ত্রীকে তালাক দেবার জন্য অন্যকে ক্ষমতা (পাওয়ার অব এটর্নি) দেয়া যায়।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ আজকাল অনেক দেশে আইন করে স্ত্রীকে তালাকের ক্ষমতা দেয়া হয়। এটা আল্লাহর বিধানের সরাসরি লঙ্ঘন। (নারীর ইচ্ছায় বিবাহ বিচ্ছেদ চাইলে আদালতের মাধ্যমে বিবাহ ভেঙ্গে দিতে হয়। এটা ইসলামী বিধান মেনে সঠিক সমাধান)

তালাকের ইদ্দতঃ ইদ্দত অর্থ গণনা করা, সংখ্যা পূর্ণ করা। তালাকপ্রাপ্তা নারীগণ অন্যত্র বিয়ে হবার আগে একটি নির্ধারিত সময় অপেক্ষা করতে হয়। এ অপেক্ষাকালকে বলা হয় তালাকের "ইদ্দত"।
স্বামী মারা যাবার পরও অন্যত্র বিয়ে হবার আগে স্ত্রীকে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। একে বলা হয় স্বামী মরার ইদ্দত। তালাকপ্রাপ্তা নারীর ইদ্দত বা অপেক্ষাকাল তিন ক্বুরু। উল্লেখ্য আরবী ক্বুরু শব্দটি দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথাঃ
(১) ঋতু স্রাব। (২) দুই স্রাবের মধ্যবর্তী কাল।
তালাকপ্রাপ্তা নারীর ইদ্দতের মেয়াদ বর্ণনায় আল-কুরআনে শব্দ ব্যব্বহৃত হয়েছে "ক্বুরু"। ক্বুরু শব্দের যেহেতু দুটি অর্থ আছে তাই তালাক প্রাপ্তা নারীর ইদ্দত নিয়েও দু'টি মত পাওয়া যায়।
১. তালাকপ্রাপ্তা নারী তিন স্রাব অপেক্ষা করবে, এটাই তার ইদ্দত। হানাফী আলিমগণ এ মতটি গ্রহণ করেছেন।
২. তালাকপ্রাপ্তা নারী দুই স্রাবের মধ্যবর্তি তিন পবিত্রতা অপেক্ষা করবে, এটা-ই ইদ্দত। শাফিয়ী' আলিমগণ এ মতটি গ্রহণ করেছেন।

৩. তাকাল প্রাপ্তা নারীর যদি ঋতুস্রাব না হয় তবে তার ইদ্দত হবে ৩ মাস আর তালাক প্রাপ্তা নারী যদি গর্ভবতী হয় তবে তার ইদ্দত হবে সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত। সূরাহ তালাকের ১-৪ আয়াতে ইদ্দতের বিধান দিয়ে নাযিল হয়েছে..

১. হে নবী (এবং নবীর উম্মতগণ) তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দিলে ইদ্দত পালনের সুবিধা মত তালাক দেবে এবং (তালাকের পর) ইদ্দতের হিসাব রাখবে (এটা হল তোমাদের প্রভুর বিধান।) তোমরা তোমাদের রাব্ব (একমাত্র বিধানদাতা) আল্লাহর তাকওয়া অর্জন করবে। (আল্লাহর ভয়ে কুফর শিরক ও পাপাচার থেকে বেঁচে থাকার নাম তাকওয়া।)

তোমরা (তালাক দেওয়ার পর ইদ্দত পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত) স্ত্রীদেরকে তাদের ঘর থেকে বের করে দিও না। আর তারাও যেন নিজ থেকে বেরিয়ে না যায় (বরং স্বামীর সঙ্গে থেকেই ইদ্দত পালন করে।) তবে তাদের কেউ যদি সুস্পষ্ট অশ্লীল কাজ (যিনা) করে ফেলে (তখন তাদেরকে ঘর থেকে বের করে দেওয়াসহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে পারবে।)

এ সবই হল আল্লাহর সীমানা। যে ব্যক্তি আল্লাহর সীমানা লঙ্ঘন করলো সে নিজের উপর অবিচার করল। তুমি জান নাঃ আল্লাহ হয়ত অন্য (এ ব্যাপারে) কোনো উপায় বের করে দেবেন।

২-৩. স্ত্রীরা ইদ্দতের শেষ সীমায় পৌঁছে গেলেও তোমরা (স্বামী তার স্ত্রীকে) বিধান মত রেখে দিতে পারবে অথবা নিয়ম মত ছেড়ে দিতে পারবে। আর (এসব ব্যাপারে) বিচারিক জ্ঞান সম্পন্ন তোমাদের (মুসলিমদের) দুই ব্যক্তিকে সাক্ষী রাখবে। তোমরা সাক্ষী প্রতিষ্ঠিত করবে আল্লাহর জন্য (সাক্ষী হল বিচারের মূল। সাক্ষি ভুল হলে বিচার ভুল হবার সম্ভাবনাই বেশী। তাই ন্যায় বিচারের স্বার্থে আল্লাহর বিধান পালনের জন্য সাক্ষ্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখতে বলা হয়েছে।) যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতে ঈমান রাখে তাকে এমন আদেশ দেয়া হচ্ছে। যে ব্যক্তি আল্লাহর তাকওয়া অর্জন করে আল্লাহ তার জন্য পথ খুলে দেন এবং এমন জায়গা থেকে রিজকের ব্যবস্থা করেন যা সে ভাবতেও পারে না। যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আল্লাহ তার সিদ্ধান্ত অবশ্যই পরিপূর্ণ করেন। আল্লাহ সবকিছুর তাক্বদীর নির্ধারিত করে রেখেছেন। (৬৫ সূরাহ তালাকঃ ১-৩)

ঈমান ও আক্বীদাহঃ তাক্বদীর মহান আল্লাহর এক গোপন রহস্য। তাক্বদীরের উপর ঈমান (অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস) রাখা ফরজ এবং ঈমানের ৬টি মূলনীতির মাঝে ৫ম নম্বরে হচ্ছে তাক্বদীরের উপর ঈমান।

৪. আর যে সব নারীর ঋতুস্রাব (বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আর স্রাব) হবার সম্ভাবনা নেই, তাদের ইদ্দতের ব্যাপারে তোমরা যাতে সংশয়ে না পড় (এ জন্য আল্লাহ অন্য ব্যবস্থা করে দিয়েছেন) তারা ইদ্দত পালন করবে ৩ মাস এবং যাদের এখনো ঋতুস্রাব হয়নি তারাও (ইদ্দত পালন করবে ৩ মাস।) আর গর্ভবতী নারীরা ইদ্দত পালন করবে তাদের সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত। যে ব্যক্তি আল্লাহর তাকওয়া অর্জন করে আল্লাহ তার কাজকে সহজ করে দেন। (কুফর শিরক ও পাপাচার থেকে বেঁচে থাকার নাম তাকওয়া) (৬৫ সূরাহ তালাকঃ ৪)

আইন ও বিধানঃ

- স্বামী মারা যাবার পর বা তালাকের পর স্ত্রীকে অন্যত্র বিয়ে করার আগে কিছুকাল অপেক্ষা করতে হয়। এ অপেক্ষা কালকে ই'দ্দাহ বলে। উর্দু উচ্চারণে বলা হয় ইদ্দত।
- তালাকের পর ঋতুবতী নারীকে তিন "কুরু" ইদ্দত পালন করতে হয়। *(আসলে কুরু শব্দের দুই অর্থ। ঋতুস্রাব এবং দুই স্রাবের মধ্যবর্তী সময়। তাই হানাফীরা "কুরু" শব্দকে স্রাব অর্থে নিয়েছেন। আর শাফিয়ী' ফিক্বহ মতে দুই স্রাবের মধ্যবর্তী সময়)*
- যে নারীর ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে গিয়েছে বা স্রাব হয়নি সে তালাক প্রাপ্তা হলে তার ইদ্দত হলো ৩ মাস।
- গর্ভবতী নারী তালাক প্রাপ্তা হলে তার ইদ্দত সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত।
- স্বামী মারা গেলে স্ত্রীর ইদ্দত চার মাস দশ দিন।
- তালাকের পর স্ত্রী স্বামীর ঘরে থেকে ইদ্দত পালন করবে। *(১ম বা ২য় তালাকের ইদ্দতকালীন সময়ে স্ত্রী সেজে গোঁজে স্বামীর সামনে আসবে এবং তালাক ফিরিয়ে নিতে স্বামীকে উৎসাহিত করবে।)*
- ইদ্দতকালীন সময়ে স্ত্রীর যাবতীয় খরচ স্বামী বহন করবে, যেমন তালাকের আগে করত।
- ১ম বা ২য় বার রাজয়ী' তালাকের ইদ্দতকালীন সময়ে স্বামী তালাক ফিরিয়ে নিতে পারবে। *(ফিক্বহের পরিভাষায় এটাকে বলা হয় "রুজু" (তালাক ফিরিয়ে নেয়া)*
- মৌখিক, লিখিত বা দৈহিক পদক্ষেপের (আলিঙ্গন, চুম্বন বা সহবাসের) মাধ্যমে তালাক ফিরিয়ে নেয়া যায়।
- ইদ্দতের ভিতর তালাক ফিরিয়ে নিলে এ তালাকে বিবাহ ভঙ্গ হয় না। (তবে গণনা হিসেবে রয়ে যায়)
- ১ম ও ২য় বার রাজয়ী' তালাকের পর ইদ্দতের ভিতর তালাক ফিরিয়ে না নিলে এবং ইদ্দত পূর্ণ হয়ে গেলে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। তখন তারা হয়ে যায় সাধারণ নারী পুরুষের মত। ফিক্বহের পরিভাষায় এটাকে বলা হয় "বাইন"।
- এক তালাকের ইদ্দত পূর্ণ হয়ে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবার পর ওই নারী তার ইচ্ছামত অন্য পুরুষকে বিয়ে করতে পারবে এবং চাইলে যে স্বামী তালাক দিয়েছে তাকেও পুনরায় বিয়ে করতে পারবে। ফিক্বহ এর পরিভাষায় এটাকে বলা "তাজদীদু-ন-নিকাহ" বা বিবাহ নবায়ন।
- এভাবে তাজদীদু-ন-নিকাহ দুই বার করা যায় এবং প্রত্যেক বারই আগের প্রদেয় তালাক রয়ে যায়। অর্থাৎ এক তালাক দেয়ার পর তাজদীদু-ন-নিকাহ করলে স্বামী আর দুই তালাকের মালিক থাকবে। দুইবার এমন করলে স্বামী আর এক তালাকের মালিক থাকবে।
- তৃতীয় বার তালাক দেবার পর আর "তাজদীদু-ন-নিকাহ"র সুযোগ থাকে না। ৩ বারের পর এ নারী ওই পুরুষের জন্য কঠিন ভাবে হারাম হয়ে যায়। ফিক্বহের পরিভাষায় এটাকে বলা হয় "মুগা'ল্লাযাহ"।
- "মুগা'ল্লাযাহ" হয়ে যাবার পর তারা আর বিয়ে করতে পারবে না। তবে স্ত্রী অন্য পুরুষকে বিয়ে করলে "মুগা'ল্লাযাহ" কেটে যায়। তখন তারা আবার সাধারণ নারী পুরুষ হয়ে যায় এবং প্রদেয় সকল তালাক বাতিল হয়ে যায়। অর্থাৎ এখন যদি ওই নারীর বিবাহ ভেঙ্গে যায় তবে প্রথম স্বামী চাইলে উভয়ের সম্মতিতে আবার বিবাহ করতে পারবে এবং এ বিয়ের পর স্বামী নতুন করে তিন তালাকের মালিক হবে। (তালাক সম্পর্কে আর জানতে চাইলে দেখুন সূরাহ বাকারাহঃ ২২৯-২৩২)

বিঃ দ্রঃ= হিল্লা বিয়ের নামে আমাদের সমাজে যা করা হয় এটা আল্লাহর বিধান নিয়ে নাটকের শামিল। এমন করা বৈধ নয়। যারা এমন করে এরা সবাই অপরাধী।

অনুচ্ছেদঃ ১৩. স্বামী মারা গেলে স্ত্রীর ইদ্দত পালন করা

যে সব স্ত্রীর স্বামী মারা যাবে বা শহীদ হয়ে যাবে তাদের জন্য আরো একটি ফরজ দায়িত্ব হলো ইদ্দত পালন করা তথা নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত অন্য বিয়ে থেকে বিরত থাকা। এ বিষয়ে বিধান দিয়ে নাযিল হয়েছে..

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (234)

(হে মুসলিমগণ!) তোমাদের কেও স্ত্রী রেখে মারা গেলে স্ত্রীগণ ৪ মাস ১০দিন নিজেকে (অন্য বিয়ে থেকে) বিরত রাখবে, (এটাই বিধবার ইদ্দত) মেয়াদ পূর্ণ হবার পর স্ত্রীগণ তাদের নিজেদের ব্যাপারে আইনগত (বিয়ে করার বা না করার) সিদ্ধান্ত নিতে পারবে, এতে তোমাদের কোনো পাপ হবে না। আল্লাহ খবর রাখেন তোমাদের সকল কাজের। (বাক্বারাহঃ ২৩৪)

আইন ও বিধানঃ

- স্বামী মারা গেলে স্ত্রী ৪ মাস ১০ দিন অন্য বিবাহ থেকে নিজেকে বিরত রাখবে। এ সময়কে বলা হয় বিধবার ইদ্দত।
- স্বামী মারা গেলে ইদ্দত পালন করা (৪ মাস ১০ দিন অন্য বিয়ে থেকে বিরত থাকা) স্ত্রীর উপর ফরজ।
- স্ত্রীর উচিত ইদ্দতকালীন সময়ে (৪ মাস ১০ দিন) স্বামীর ঘরে অবস্থান করা। এটা ফরজ নয়। তাই স্ত্রী ইচ্ছা করলে বাইরে যেতে পারবে। তবে অসুবিধা না হলে অন্য কোথাও অবস্থান না করাই উত্তম।
- ইদ্দতকালীন সময়ে নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ঝুঁকি বা অন্য কারণে স্বামীর ঘর ছেড়ে অন্যত্র অবস্থান করলে পাপ হয় না
- ইদ্দতকালীন সময়ে মেহেদী লাগানো, মেকআপ করাসহ উগ্র সাজসজ্জা করা উচিত নয়। তবে নিয়মিত গোসল করা, শরীরের যত্ন হিসেবে স্বাভাবিক তেল, সাবান, শেম্পু, লোশন, ক্রীম, ইত্যাদি ব্যবহার করা দোষের নয়।
- ইদ্দত পূর্ণ করার পর ওই নারী নিজের (অন্য বিয়ে করার বা না করার) ব্যাপারে নিজেই সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।

অনুচ্ছেদঃ ১৪. আত্মীয়তা রক্ষা করা

আমাদের উপর অর্পিত আরো একটি ফরজ দায়িত্ব হলো আত্মিয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা তথা আত্মীয়তা রক্ষা করা। বিষয়টি আসলে খুবই স্পর্শকাতর। তাই এ ব্যাপারে একটি প্রবন্ধ নিম্নে পেশ করা হল..

আত্মীয়তা রক্ষার সীমা রেখা

প্রারম্ভিক কথাঃ মানব জীবনে আত্মীয়তার গুরুত্ব অপরিসীম। ইসলাম যেহেতু বিশ্ব মানবতার জন্য একমাত্র সঠিক জীবন আদর্শ। তাই ইসলামী শারীয়া'হ বিষয়টিকে খুব গুরুত্ব দিয়েছে। তবে বিষয়টি খুবই স্পর্শকাতর। কারণ এতে হেরফের হলে ফাসিক বা মুনাফিক হয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। যেমন..

- আত্মীয়তা রক্ষা করা অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি ফরজ এবং মুঅমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট। পক্ষান্তরে আত্মীয়তা নষ্ট করা মহাপাপ, এমন পাপ করলে মানুষ ফাসিক হয়ে যায়।
- অনেক মানুষ শুধু আত্মীয়তার কারণে অন্যায়ভাবে কাউকে সমর্থন করে থাকেন বা পক্ষ নিয়ে থাকেন। ইসলামী পরিভাষায় এটাকে বলা হয় "আ'স্বাবিয়্যাহ"।
- আস্বাবিয়্যাহ একটি জঘন্যতম মহাপাপ। এমন পাপ করলে মানুষ ফাসিক্ব হয়ে যায়।
- আত্মীয়দের কেউ ঈমানের চেয়ে কুফরকে বেশী পছন্দ করলে তাকে ওয়ালী বানানো নিষিদ্ধ। এমন কাউলে ওয়ালী (আপন বা সামাজিক মিত্র) বানালে কুফর হয়, এতে মানুষ মুনাফিক হয়ে যায়।

আশা করি বুঝতেই পারছেন। বিষয়টি কত স্পর্শকাতর। তাই এ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যক। আসলে আত্মীয়তা রক্ষা করা এবং বাস্তব জীবনে আত্মীয়তা রক্ষা করে চলা সহজ কাজ নয়। এ ব্যাপারে পরিপক্ক জ্ঞান না থাকলে বিষয়টি নিয়ে বিভ্রান্তির সম্ভাবনাই বেশী থাকে। তাইতো দেখা যায়..

- কেও কেও আত্মীয়তার নামে অতি বাড়াবাড়ি করে আস্বাবিয়াহ করে থাকেন,
- কেও কেও আত্মীয়তার নামে কুফর শিরকে সমর্থন দিয়ে মুনাফিক হয়ে যান
- কেও কেও বিষয়টিকে অবজ্ঞা করে ফাসিক হয়ে যান।

সুতরাং এসব বিষয় থেকে নিজেকে রক্ষা করে সঠিক পথে ঠিকে থাকতে হলে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যক। আর আবশ্যকতার কথা বিবেচনায় রেখেই আমাদের আজকের আয়োজন আত্মীয়তা রক্ষার সীমারেখা। বিষয়টিকে আমরা ৮টি অনুচ্ছেদে বিন্যস্থ করেছি।

১ম পরিচ্ছেদঃ আত্মীয়তা রক্ষার গুরুত্ব

২য় পরিচ্ছেদঃ আত্মীয়তা ছিন্ন করার পরিণতি
৩য় পরিচ্ছেদঃ অভদ্র আত্মীয়দের সাথে করণীয়
৪র্থ পরিচ্ছেদঃ আম্বাবিয়্যাহ (অবৈধ স্বজন প্রীতি)
৫ম পরিচ্ছেদঃ যে সব আত্মীয় ঈমানের চেয়ে কুফরকে বেশী পছন্দ করে
৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদঃ আত্মীয়তা রক্ষায় করণীয়
৭ম পরিচ্ছেদঃ দ্বীন ও আত্মীয়তা
৮ম পরিচ্ছেদঃ আত্মীয়তা রক্ষার নীতিমালা

এবার আসুন! প্রতিটি বিষয়ে একটু বিস্তারিত জেনে নেই।

১ম পরিচ্ছেদঃ আত্মীয়তা রক্ষার গুরুত্ব

ইসলামী বিধান মতে আত্মীয়তা রক্ষা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আত্মীয়তা রক্ষা করার তাগিদ দিয়ে অনেক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। নীচে এর কয়েকটি উল্লেখ করা হল। যেমন..

১. আত্মীয়তা রক্ষা করা ঈমানের দাবী। বর্ণিত হচ্ছে..

حديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت

আবু-হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেনঃ

- যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও আখেরাতে ঈমান রাখে সে যেন মেহমানকে সম্মান করে,
- যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও আখেরাতে ঈমান রাখে সে যেন আত্মীয়তা রক্ষা করে,
- যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও আখেরাতে ঈমান রাখে সে যেন কল্যাণকর কথা বলে নতুবা চুপ থাকে।

(বুখারীঃ তাফসীরঃ ৪৮৩০, মুসলিমঃ ১৯৮০, ২৫৫৪)

২. আত্মীয়তা রক্ষা করলে হায়াতে বরকত হয়, সম্পদে বরকত হয়। এ ব্যাপারে বর্ণিত হচ্ছে..

عن أنس أن رسول الله ﷺ قال من أحب أن يُبسط له في رزقه ويُنسأ له في أثره فليصل رحمه. متفق عليه.

আনাস থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেনঃ যে ব্যক্তি তার রিজিকে সচ্ছলতা আর হায়াতে বরকত কামনা করে সে যেন আত্মীয়তা রক্ষা করে। (বুখারী ও মুসলিম)

৩. যে ব্যক্তি আত্মীয়তা রক্ষা করে মহান আল্লাহ্ তার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখেন। বর্ণিত হচ্ছে..

عن أبي هريرة قال قال رسولُ الله ﷺ إِنَّ اللَّه تَعَالى خَلَقَ الخَلْقَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْهُمْ قَامَتِ الرَّحِمُ فَقَالَتْ هَذَا مقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيعَةِ قَالَ نَعَمْ أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قَالَتْ بَلَى قال فَذَلِكَ لَكِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ اقرؤوا إِنْ شِئْتُمْ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ] محمد [23- 22:متفقٌ عَلَيهِ.

আবু-হুরাইরাহ থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেনঃ "আল্লাহ্ই সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা। সব সৃষ্টি সমাপ্ত হবার পর আত্মীয়তা দাঁড়িয়ে বললঃ বিচ্ছিন্নতা (আত্মীয়তা ছিন্ন করা) থেকে আপনার নিকট সুরক্ষা কামনার এটাই উপযুক্ত সময় (সুতরাং ছিন্ন হওয়া থেকে আমাকে রক্ষা করুন।) আল্লাহ্ বললেনঃ হ্যাঁ.. (তাই করব।) যে তোমায় রক্ষা করবে আমি (আল্লাহ্) তার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করব আর যে তোমায় ছিন্ন করবে আমি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করব; এতে কী তুমি সন্তুষ্ট..? আত্মীয়তা বললঃ জি..! আল্লাহ্ বললেনঃ তোমাকে তাই দেওয়া হলো"।
এতোটুকু বলার পর রাসূল সা. বললেনঃ (আমার কথার প্রমাণ স্বরূপ) চাইলে পাঠ করঃ (জিহাদ বিমুখ হলে) তোমাদের থেকে আর কি প্রত্যাশা করা যায়? তখন ক্ষমতা পেলে তোমরা (ন্যায় সাম্য ও ইনসাফ বজায় রাখতে পারবে না, বরং তোমরা তখন) যমীনে ফাসাদ করবে, আত্মীয়তা ছিন্ন করবে। (কারণ জিহাদ বিমুখতা মানুষকে ভিতু বানায়। আর ভিতুরা সর্বদাই অবিচারী হয়ে থাকে।) যারা এমন হয়ে যায় আল্লাহ তাদের লা'নত করেন, তাদের বধীর করে দেন, তাদের দৃষ্টি অন্ধ করে দেন। (৪৭ মুহাম্মাদঃ ২২,২৩) (বুখারীঃ ৪৪৬৭, ৪৪৬৮, ৪৪৬৯ ও মুসলিম)

عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول اللهﷺ الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله

আ'ইশাহ রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেনঃ আত্মীয়তা আরশে ঝুলন্ত থেকে বলছেঃ যে আমাকে রক্ষা করবে আল্লাহ্ তার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করবেন আর যে আমাকে ছিন্ন করবে আল্লাহ্ তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন।
(বুখারী ও মুসলিম)

৪. আত্মীয়তা রক্ষা করা জান্নাতে প্রবেশের পথ সুগম করে। এ ব্যাপারে বর্ণিত হচ্ছে..

عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال قال رسول اللهﷺ يا أَيُّها النَّاسُ أفشوا السَّلامَ وأَطعِموا الطَّعامَ وصِلوا الأرحامَ وصلّوا باللّيلِ والنَّاسُ نيامٌ تدخلوا الجنَّةَ بسَلامٍ

আব্দুল্লাহ বিন সালাম রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেন হে মানুষ! তোমরা পরস্পরে..

- ✓ সালামের প্রচলন কর,
- ✓ (একে অপরকে বেশী বেশী দাওয়াত করে) খাবারের আয়োজন কর,
- ✓ আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা কর,
- ✓ রাতে যখন মানুষ ঘুমিয়ে থাকে তখন সালাত আদায় কর। আর (এ চারটি কাজ করে) শান্তিপূর্ণ ভাবে জান্নাতে প্রবেশ কর। (ইবন মাজাঃ শাইখ আলবানীর তাহকীক মতেও হাদীছটি সাহীহ)

অন্য বর্ণনা মতে আবু-আইয়্যুব আল-আনস্বারী রা. বলেনঃ একদা এক ব্যক্তি বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন কাজ করলে আমি জান্নাতে যেতে পারব..? রাসূল সা. বললেন..

- ✓ এক আল্লাহর ইবাদাত কর,
- ✓ আল্লাহর সাথে শিরক কর না,
- ✓ সালাত কায়েম কর,
- ✓ যাকাত আদায় কর
- ✓ আর আত্মীয়তা রক্ষা কর। (বুখারী ও মুসলিম)

আত্মীয়তা রক্ষায় করণীয় পদক্ষেপ সমূহঃ আত্মীয়-স্বজনের ব্যাপারে অতি বাড়াবাড়ি ও অতি ছাড়াছাড়ি দুটিই মন্দ কাজ। এ ব্যাপারে অতি বাড়াবাড়ি বা অতি ছাড়াছাড়ি মানুষকে ফাসিক বা মুনাফিক বানিয়ে দেয়। আর এজন্যই জানতে হবে; আত্মীয়তা রক্ষায় আমাদের করণীয় পদক্ষেপগুলো কেমন হওয়া উচিত। আত্মীয়তা রক্ষায় বাস্তব সম্মত কিছু পদক্ষেপ নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন সম্মানিত উলামাগণ। আপনাদের সুবিধার্থে এর সামান্যকিছু নিম্নে পেশ করা হল..

تختلف الطرق التي تتحقّق بها صلة الرحم فتكون بالمال وتقديم المساعدة والنّصرة وطلاقة الوجه وإرشادهم وتقديم النصح لهم مع الحرص على الدعاء لهم بالهداية ويشمل الدعاء كلّ مَن له حقٌّ بالصلة بالإضافة إلى عيادة المريض من الرحم وإجابة الداعي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن الجدير بالذكر أنّ صلة الرحم تستند إلى العُرف؛ فما اعتاد عليه الناس على أنّه من صِلة الرحم فهو صِلةٌ وما اعتادوا على أنّه قطيعةٌ فهو كذلك -خالد الخراز، موسوعة الأخلاق، الكويت :مكتبة أهل الأثر، صفحة 358-359. بتصرّف.

আত্মীয়তা রক্ষার জন্য আমাদেরকে স্থান, কাল, পাত্র ভেদে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। যেমন ..

- ✓ আর্থিক সাপোর্ট
- ✓ একে অপরকে উপহার দেওয়া,
- ✓ পরস্পরকে সাহায্য সহযোগিতা করা
- ✓ একে অপরের সাথে হাসি মুখে কথা বলা,
- ✓ পরস্পরকে সৎপথের সন্ধান দেওয়া
- ✓ একে অপরের কল্যাণ কামনা করা
- ✓ পরস্পরকে ভালো পরামর্শ ও সৎ উপদেশ দেওয়া
- ✓ আত্মীয়স্বজনের হেদায়াতের জন্য দোয়া করা
- ✓ রোগীর শুশ্রূষা করা
- ✓ (বিপদ, আপদ, মুসীবত ও খুশীর দিনে) একে অন্যের ডাকে সাড়া দেয়া
- ✓ সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজে নিষেধ করা
- ✓ সাধারণত সমাজে যেসব উত্তম কাজকে আত্মীয়তা রক্ষার মাধ্যম হিসেবে দেখা হয় এমন কাজ করা। ইত্যাদি

২য় পরিচ্ছেদঃ আত্মীয়তা ছিন্ন করার পরিণতি

ইসলামী বিধান মতে আত্মীয়তা ছিন্ন করা মহাপাপ এবং এর পরিণাম ভয়াবহ। আত্মীয়তা ছিন্ন করার পরিণাম উল্লেখ করে আল-কুরআনে একাধিক আয়াত এবং বিভিন্ন কিতাবে অনেক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। নীচে এর কয়েকটি উল্লেখ করা হল। যেমন..

পরিনতিঃ ১. যারা আত্মীয়তা ছিন্ন করে আখেরাতে তারা ক্ষতিগ্রস্থ হবে। ইরশাদ হচ্ছে..

وما يضل به إلّا الفاسقين الّذين ينقضون عهد اللّه من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر اللّه به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون

আল্লাহ্ বিভ্রান্ত করেন শুধু ফাসিকদেরকে, যারা আল্লাহর সাথেকৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, আল্লাহ যা (সমাজ, দ্বীন, আত্মীয়তা) একিভূত করণের নির্দেশ দিয়েছেন এগুলোকে ছিন্ন করে (বলে ধর্ম আর রাষ্ট্র আলাদা।) আর যমীনে ফাসাদ (পাপকাজ) করে। (যারা এমন করে) এরাই ক্ষতিগ্রস্থ। (২ বাক্বারাহঃ ২৭)

পরিনতিঃ ২. যারা আত্মীয়তা ছিন্ন করে স্বয়ং আল্লাহ তাদের উপর লা'নত করেন। ইরশাদ হচ্ছে..

فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم (22) أولئك الّذين لعنهم اللّه فأصمّهم وأعمى أبصارهم

(জিহাদ বিমুখ হলে) তোমাদের থেকে আর কি প্রত্যাশা করা যায়? তখন ক্ষমতা পেলে তোমরা (ন্যায় সাম্য ও ইনসাফ বজায় রাখতে পারবে না বরং) যমীনে ফাসাদ করবে এবং আত্মীয়তা ছিন্ন করবে। (কারণ জিহাদ বিমুখতা মানুষকে ভিতু ও অবিচারী বানায়) যারা এমন হয়ে যায় আল্লাহ তাদের লা'নত করেন, তাদের বধীর করে দেন, তাদের দৃষ্টি অন্ধ করে দেন।

(৪৭ মুহাম্মাদঃ ২২,২৩)

পরিনতিঃ ৩. আত্মীয়তা ছিন্নকারীর ইবাদাত কবুল হয় না। বর্ণিত হচ্ছে..

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اللهﷺ **قال إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة فلا يقبل عمل قاطع رحم** (أحمد 484/2 , حسنه الألباني في صحيح الترغيب 2538)

আবু-হুরাইরাহ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেনঃ প্রত্যেক বৃহস্পতিবার (দিবাগত) জুমার রাতে মানব জাতির আ'মাল (সাপ্তাহিক কর্ম বিবরণী বা কাজের রিপোর্ট মঞ্জুরির জন্য) পেশ করা হয়। তখন আত্মীয়তা ছিন্নকারীর আ'মাল কবুল করা হয় না। (আহমদঃ ২/৪৮৪, সাহীহ' আত-তারগীব লি-আলবানীঃ ২৫৩৮। শাইখ আলবানীর তাহ'ক্বীক মতে হাদীছটি হাসান।)

পরিনতিঃ ৪. আত্মীয়তা ছিন্নকারী ব্যক্তি জান্নাতে যেতে পারবে না। বর্ণিত হচ্ছে..

عن أبي محمد جبير بن مطعم أن رسول الله ﷺ قال **لا يدخل الجنة قاطع** . قال سفيان يعني قاطع رحم . متفق عليه

জুবাইর বিন মুত্বই'ম রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেনঃ আত্মীয়তা ছিন্নকারী জান্নাতে যেতে পারবে না।

(বুখারী ও মুসলিমঃ ২৫৫৬)

পরিনতিঃ ৫. আত্মীয়তা ছিন্ন করলে দুনিয়াতেও সাজা হয়, আখেরাতেও সাজা হয়। বর্ণিত হচ্ছে..

عن أبي بكر رضي الله عنه عن رسول اللهﷺ قال ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم.

আবু-বাকর রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেনঃ যে সব পাপের কারণে দুনিয়াতে সাজা তড়ান্বিত হয় এবং আখেরাতেও সাজা দেওয়া হয় এর অন্যতম হচ্ছে (ইসলামী সরকারের সাথে) বিদ্রোহ করা এবং আত্মীয়তা ছিন্ন করা।

(সূত্রঃ আবু-দাউদ, তিরমিযী, ইবন মাজা। হাদীছটি সাহীহ। শাইখ আল-বানীও হাদীছটিকে সাহীহ বলেছেন এবং সাহীহ আল-তারগীবে স্থান দিয়েছেন। ইমাম বুখারী ও তদীয় কিতাব "আদাবু-ল-মুফরাদ" এ হাদীছটিকে স্থান দিয়েছেন।)

৩য় পরিচ্ছেদঃ আদর্শহীন আত্মীয়দের সাথে করণীয়

প্রারম্ভিক কথাঃ আমাদের আত্মীয় স্বজনের কেউ যদি নীতিহীন ও আদর্শহীন হয়ে মন্দ পথে চলে যায়, যদি তারা দ্বীনের পথ ছেড়ে পাপের পথে পা বাড়ায়? তবে তাদের সাথে আমাদের আচরণ কেমন হবে? এটা এক বিরাট সমস্যা। চলুন! খুঁজে দেখি; এ সমস্যার সমাধানে ইসলাম কি বলে? আদর্শহীন আত্মীয়দের সাথে আমাদের করণীয় কেমন হওয়া উচিত এ বিষয়ে কয়েকটি বিধান আপনাদের সামনে পেশ করছি। যথা..

বিধানঃ ১. আমাদের কারো বাবা-মা, ভাইবোন বা অন্যান্য আত্মীয়স্বজন যদি খারাপ হয়ে যায়, তারা যদি মন্দ পথে চলে যায় তবে শারীয়া'হ বহির্ভুত কোনো ব্যাপারে তাদের কথা মানা যাবে না /মেনে নেওয়া যাবে না। তবে তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করতে হবে। এ ব্যাপারে ইরশাদ হচ্ছে..

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ (14) وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (15)

আমরা (মানে আল্লাহ নিজে। আরবী ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী অধিক সম্মান বুঝাতে বহুবচনে "আমরা" শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে) মানুষকে তার বাবা-মার ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছি; (হে মানুষ!) আমার শোকর আদায় কর এবং তোমার বাবা-মারও (শোকর আদায় কর। আল্লাহর নিয়ামতের গুরুত্ব অনুধাবন করে তাঁর আনুগত্য করার নাম শোকর আদায় করা। মানুষ যেন ভুলে না যায়) তার মা অনেক কষ্ট করে তাকে গর্ভে ধারণ করেছে, দুই বছর দুধ পান করিয়েছে। (শুনো!) আমার কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন। তবে (সাবধান!) তোমাদের বাবা-মা যদি কান্ডজ্ঞানহীন হয়ে যায় এবং শিরক (পাপ) করার জন্য তোমাদেরকে চাপ দেও তখন তাদের কথা মেনে নিও না। তবে দুনিয়ার জীবনে তাদের সাথে মা'রুফ (রীতি মত, বিধান মত) সহাবস্থান করবে। (আদর্শগত ভাবে) তোমরা শুধু তার পথই গ্রহণ কর যে আমার দিকে ধাবিত হয়। (মনে রেখো!) তোমরা সবাই আমার কাছে ফিরে আসবে আর আমি বদলা দেব তোমাদের সকল কাজের। (৩১ লুক্বমানঃ ১৪-১৫)

বিধানঃ ২. আমাদের কারো স্ত্রী, সন্তান বা পরিবারের অন্যকেউ খারাপ হয়ে গেলে তাদের সাথে আদর্শিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে, তাদের থেকে সাবধান থাকতে হবে; যেন তারা আপনাকে বিভ্রান্তির দিকে ঠেলে দিতে না পারে। ইরশাদ হচ্ছে..

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (14)

মুঅমিনগণ! তোমাদের কোনো কোনো স্ত্রী ও সন্তান তোমাদের শত্রু, (যারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ, হিজরত ও দ্বীনি কাজ থেকে তোমাদেরকে বিরত রাখে) তাই তাদের ব্যাপারে সাবধান থাকবে। তোমরা তাদের উপেক্ষা করবে, ক্ষমা করবে, মার্জনা করবে (এটাই তোমাদের জন্য উত্তম। আর মনে রাখবে) নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াময়। (৬৪ তাগা'বুনঃ ১৪)

বিধানঃ ৩. নীতিহীন, আদর্শহীন, অভদ্র আত্মীয়দের সাথে উত্তম ব্যবহার করা এবং সর্বক্ষেত্রে নিজের ব্যবহারকে উত্তম রাখাই আমাদের জন্য কল্যাণকর। বর্ণিত হচ্ছে..

عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى رسول الله فقال له يا رسول الله إنّ لي قرابة أصِلُهم ويقطعوني وأحسِنُ إليهم ويُسيئون إليَّ وأحلمُ عنهم ويجهلون عليَّ فقال لئن كنتَ كما قلتَ فكأنما تُسِفُّهمُ المَلَّ ولا يزال معك من اللهِ ظهيرٌ عليهم ما دمتَ على ذلك . رواه مسلم ، في صحيح مسلم

আবু-হুরাইরাহ রা. বলেনঃ একদা এক ব্যক্তি এসে বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার কিছু আত্মীয় আছে..

- আমি তাদের সাথে আত্মীয়তা রক্ষা করে চলি কিন্তু তারা আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে
- আমি তাদের সাথে উত্তম আচরণ করি কিন্তু তারা আমার সাথে অশোভ আচরণ করে,
- আমি তাদের ব্যাপারে সহনশীল আচরণ করি কিন্তু তারা আমার সাথে কাণ্ডজ্ঞানহীন আচরণ করে। (এখন আমি কি করব...?)

রাসূল সা. বললেনঃ তুমি যা বলছ তাই যদি হয় (তবে তোমার কাজ চালিয়ে যাও। কারণ তোমার আচরণে তাদের গাত্রদাহ এমন বেড়ে যাবে) যেন তুমি তাদের উপর গরম বালু নিক্ষেপ করছ। তাদের ব্যাপারে আল্লাহর সাহায্য তোমার সঙ্গী হবে যতদিন তুমি এমন থাকবে। (মুসলিম)

৪র্থ পরিচ্ছেদঃ আস্বাবিয়্যাহ (অবৈধ স্বজন প্রীতি)

প্রারম্ভিক কথাঃ ইতিমধ্যে আমরা জানতে পেরেছি; আত্মীয়তা রক্ষা করা আল্লাহর আদেশ এবং আত্মীয়তা ছিন্ন করা মহাপাপ। তবে আমাদের সমাজে অনেক মানুষ এমন আছেন যারা আত্মীয়তা রক্ষার নামে অবৈধ স্বজনপ্রীতি করেন, ইসলামী পরিভাষায় যাকে বলা হয় "আস্বাবিয়্যাহ"।

আ'স্বাবিয়্যাহ একটি নৈতিক ব্যাধি। মানুষকে পাপের পথে ঠেলে দিতে আ'স্বাবিয়্যাহ শয়তানের এক কার্যকরী পন্থা। আ'স্বাবিয়্যাহ একটি হারাম কাজ। তবে এ সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞানের অভাবে অনেকেই এমন হারামের সাথে জড়িয়ে পড়েন। তাই আসুন! আ'স্বাবিয়্যাহ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য জেনে নেই।

আ'স্বাবিয়্যাহ পরিচিতিঃ শুধুমাত্র নিজের পরিবার, আত্মীয়, সম্প্রদায়, জাতি বা বন্ধু হওয়ার কারণে অন্যায় ভাবে কাউকে নৈতিক ও আদর্শিক সমর্থন ও সহযোগিতা করার নাম আ'স্বাবিয়্যাহ। বর্ণিত হচ্ছে..

عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه، قال قلت يا رسول الله ما العصبية ؟ قال أن تعين قومك على الظلم

ওয়াছিলাহ বিন আসক্বা রা. বলেন, একদা আমি বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আ'স্বাবিয়্যাহ কি? তিনি বললেনঃ তোমার ক্বাওম (পরিবার, সম্প্রদায়, জাতি)কে অন্যায় ভাবে সমর্থন/সহযোগিতা করা।

(সূত্রঃ আবু-দাউদ, ইবনু মাজা, মিশকাত। শাইখ আলবাণীর তাহ'ক্বীক মত হাদীছটি দ্বাইফ।)

উল্লেখ্যঃ দ্বাইফ হাদীছ আক্বীদাহ বা বিধানের ক্ষত্রে দলীল হয় না। আমরাও এখানে আক্বীদাহ বা বিধান প্রমাণের জন্য হাদীছটি ব্যবহার করিনি। আমরা হাদীছটি ব্যবহার করেছি শুধুমাত্র সংজ্ঞা বুঝাতে, যার জন্য কোনো হাদীছের প্রয়োজন ছিল না, শুধুমাত্র উলামাদের মতামতই যথেষ্ট ছিল।

আ'স্বাবিয়্যাহর পরিণতিঃ ইসলামী সমাজের মৌলিক নীতিমালার মাঝে অন্যতম হচ্ছে ন্যায় সাম্য ও ইনসাফ বজায় রাখা আর আ'স্বাবিয়্যাহ ন্যায় সাম্য ও ইনসাফকে ধ্বংস করে দেয়। আ'স্বাবিয়্যাহ আল্লাহ্ ও রাসূলের নীতি বিরোধী অবৈধ কাজ। তাই এর পরিণতি বড় ভয়াবহ। আস্বাবিয়্যাহর পরিণতি সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও হাদীছে অনেক কথা বর্ণিত হয়েছে। নীচে এসব থেকে কয়েকটিমাত্র উল্লেখ করা হল।

পরিনতিঃ ১. যে ব্যক্তি আ'স্বাবিয়্যাহর সাথে জড়িয়ে পড়ে রাসূল সা. ও মুঅমিনদের সাথে তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। বর্ণিত হচ্ছে..

رواه أبو داود (5121) عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ **لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا إِلَى عَصَبِيَّةٍ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ** . وهو حديث ضعيف كما قال الألباني في ضعيف أبي داود

জুবাইর বিন মুতই'ম রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেন..

- যে ব্যক্তি আ'স্বাবিয়্যাহর প্রতি আহ্বান করল সে আমাদের কেউ নয়,
- যে ব্যক্তি আ'স্বাবিয়্যাহ রক্ষার্থে যুদ্ধ করল সে আমাদের কেউ নয়,
- যে ব্যক্তি আ'স্বাবিয়্যাহর উপর মারা গেল সে আমাদের কেউ নয়।

সূত্রঃ আবু-দাউদঃ ৫১২১। শাইল আলবাণীর তাহ'ক্বীক মত হাদীছটি দ্বাইফ। তবে মুসলিমঃ ১৮৫০, বুখারীঃ ৪৯০৫, মুসলিমঃ ২৫৮৪ শব্দগত পরিবর্তনসহ প্রায় অনুরূপ অর্থ বর্ণিত হয়েছে। তাই আবু-দাউদের হাদীছটি দ্বাইফ হলেও হাদীছের মর্ম বাণী সঠিক। এ হাদীছটি তথ্য বহুল এবং সাজানো গোছানো তাই এখানে উল্লেখ করা হল।

পরিনতিঃ ২. যে ব্যক্তি আ'স্বাবিয়্যাহর জন্য নিহত হল সে জাহিলিয়্যাতের (কুফুরের) উপর মারা গেল। বর্ণিত হচ্ছে..

وقد روى مسلم (1850) عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ يَدْعُو عَصَبِيَّةً أَوْ يَنْصُرُ عَصَبِيَّةً فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ

জুনদুব বিন আব্দুল্লাহ আল-বাজালী রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেনঃ যেব্যক্তি আ'স্বাবিয়্যাহর (অবৈধ স্বজন প্রীতির) অন্ধ পতাকার (ভ্রান্ত নীতির) সমর্থক বা সাহায্যকারী হিসেবে নিহত হল সে জাহিলিয়্যাতের (কুফরের) পথে নিহত হল। (মুসলিমঃ ১৮৫০)

পরিনতিঃ ৩. আ'স্বাবিয়্যাহর প্রতি আহ্বান করা জাহিলিয়্যাতের প্রতি আহ্বানের শামিল। বর্ণিত হচ্ছে..

وروى مسلم (2584) عَنْ جَابِرٍ قَالَ اقْتَتَلَ غُلَامَانِ غُلَامٌ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَغُلَامٌ مِنْ الْأَنْصَارِ؛ فَنَادَى الْمُهَاجِرُ أَوْ الْمُهَاجِرُونَ يَا لَلْمُهَاجِرِينَ! وَنَادَى الْأَنْصَارِيُّ يَا لَلْأَنْصَارِ! فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَا هَذَا ؟! دَعْوَى أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ ؟ ! قَالُوا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا أَنَّ غُلَامَيْنِ اقْتَتَلَا فَكَسَعَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ. قَالَ فَلَا بَأْسَ؛ وَلْيَنْصُرْ الرَّجُلُ أَخَاهُ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا؛ إِنْ كَانَ ظَالِمًا فَلْيَنْهَهُ فَإِنَّهُ لَهُ نَصْرٌ. وَإِنْ كَانَ مَظْلُومًا فَلْيَنْصُرْهُ

জাবির রা. বলেনঃ একদা দুই বালক ঝগড়া বাঁধাল। একজন মুহাজির আর একজন আনসার (এক পর্যায়ে তা গোত্রীয় রূপ ধারণ করল।) মুহাজির (তার পক্ষ নেওয়ার জন্য) মুহাজিরদের প্রতি আহ্বান করল এবং আনসার (তার পক্ষ নিতে) আনসারদের প্রতি আহ্বান করল। (শোরগোল শুনে) রাসূল সা. বেরিয়ে এসে বললেনঃ এসব কি..? (আমার উম্মতের মাঝে) জাহিলিয়্যাতের আহ্বান?! লোকজন (বুঝে ফেলল এমন আহ্বানে রাসূল সা. অসন্তুষ্ট হয়েছেন। তাই বিষয়টি সামাল দিতে) বললঃ তেমন কিছু না, ইয়া রাসূলাল্লাহ! দুই বালক ঝগড়া বাধিয়েছে। একজন অন্যজনকে আঘাত করেছে। রাসূল সা. বললেনঃ এটা তেমন কিছু নয়। মানুষ যেন তার ভাইকে সাহায্য করে; সে জালিম হলেও, মজলুম হলেও..। জালিমকে জুলম থেকে বিরত রাখবে, এটাই তাকে সাহায্য করা হবে। আর মজলুমকে (যথাসাধ্য) সাহায্য করবে। (মুসলিমঃ ২৫৮৪)

পর্যালোচনাঃ আসলে আত্মীয়তার বন্ধন আল্লাহ্ প্রদত্ব। আমাদের বাবা-মা, ভাইবোন, ছেলেমেয়ে, ভাতিজা ভাতিজী, ভাগনা ভাগনী, চাচাচাচী, মামামামী, এরা সবাই আমাদের আত্মীয়স্বজন। আত্মীয়স্বজন আল্লাহর দান। দুনিয়ার জীবনে আমাদের সার্বিক সুবিধা ও মানবিক সমর্থনের জন্য আত্মীয়তার সম্পর্ক এক বিশেষ নিয়ামত। এমন সম্পর্ক টিকিয়ে রাখা আমাদের মানবিক দায়িত্ব। এটাই আল্লাহর বিধান। এটাই মালিকের আদেশ। আমরা নিজ থেকে কখনো আত্মীয়তা ছিন্ন করব না। কারণ এটা আমাদের মালিকের নিষেধ। তবে বিষয়টি যেহেতু খুবই স্পর্শকাতর, তাই এ ব্যাপারে সাবধান থাকতে হবে; যেন আমরা আত্মীয়তা ছিন্ন না করি, আবার আত্মীয়তা রক্ষার নামে আ'স্বাবিয়্যাতে জড়িয়ে না পড়ি !!

৫ম পরিচ্ছেদঃ যে সব আত্মীয় কুফরকে পছন্দ করে তাদের ব্যাপারে করণীয়

প্রারম্ভিক কথাঃ আমাদের কোনো আত্মীয় যদি কাফির, মুশরিক, নাস্তিক, মুরতাদ বা মুনাফিক হয়ে যায়, তারা যদি ঈমানের চেয়ে কুফরকে বেশী পছন্দ করে; তবে তাদের সাথে আমাদের সম্পর্ক কেমন হবে এবং করণীয় কি হবে? আমরা তাদের সাথে কি ধরণের আচরণ করব এবং কোন ধরণের সম্পর্ক রাখবো? এমন প্রশ্ন প্রায়ই আমাদের মাঝে ঘোরপাক খায়। পবিত্র কুরআন ও হাদীছে এমন প্রশ্নের উত্তরও সুস্পষ্টভাবে দেওয়া আছে। তাই আসুন! এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় কয়েকটি বিধান জেনে নেই।

বিধানঃ ১. আত্মীয়রা শুধুই আত্মীয়। দ্বীনী ব্যাপার আর আত্মীয়তা এক নয় বরং আলাদা দুটি পথ। তাই এ দুটি বিষয়কে আলাদা-ই রাখতে হবে। বর্ণিত হচ্ছে..

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ - الشعراء 214: دعا رسول الله ﷺ قريشاً فاجتمعوا فعمّ وخصّ وقال: يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئًا غير أن لكم رحمًا سأبُلُّها بِبِلالها رواه مسلم :كتاب الإيمان، باب في قوله تعالى :وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ]الشعراء214 :(1/ 192)، برقم..(204).

আবু-হুরাইরাহ রা. থেকে বর্ণিত, যখন নাযিল হলো "তোমার নিকট আত্মীয়দেরকে সাবধান করে দাও"। তখন নবী সাঃ কুরাইশদের জমা করলেন। তিনি সম্মিলিত এবং ব্যাক্তিগত ভাবে সম্বোধন করে বললেনঃ

- হে কায়া'ব বিন লুওয়াই পরিবার! নিজেদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও!
- হে মুররাহ বিন কায়া'ব পরিবার! নিজেদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও!
- হে আব্দু শামছ পরিবার! নিজেদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও!
- হে আব্দু মানাফ পরিবার! নিজেদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও!
- হে হাশিম পরিবার! নিজেদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও!
- হে আব্দুল মুত্তালিব পরিবার! নিজেদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও!
- হে মুহাম্মাদের মেয়ে ফাত্বিমাহ! নিজেকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও!

আমি তোমাদেরকে আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচাতে পারব না। তবে তোমাদের সাথে আমার আত্মীয়তা রয়েছে। তাই তোমাদের ব্যাথায় আমিও ব্যথিত হই। (মুসলিম)

বিধানঃ ২. যে সব আত্মীয় ঈমানের চেয়ে কুফরকে বেশী পছন্দ করে তাদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকলেও আদর্শিক মিত্রতা করা যাবে না এবং তাদের কেওকে আদর্শিক মিত্র বা অভিভাবক হিসেবে মেনে নেওয়া যাবে না। আমাদেরকে এ ব্যাপারে সাবধান থাকতে হবে। এ ব্যাপারে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে নাযিল হয়েছে..

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (23)

ওহে যারা ঈমান এনেছো! (শুনো!) তোমাদের বাবা-মা ও ভাইবোন যদি ঈমানের চেয়ে কুফরকে বেশী পছন্দ করে তবে তাদেরকে ওয়ালী (মিত্র/অভিভাবক) বানিও না /ওয়ালী হিসেবে মেনে নিও না। তোমাদের যে ব্যক্তি তাদেরকে ওয়ালী বানাবে /ওয়ালী হিসেবে মেনে নেবে সে অপরাধী হয়ে যাবে। (৯ তাওবাহঃ ২৩)

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (24)

(হে নবী!) বলে দাওঃ তোমাদের বাবা-মা, ছেলেমেয়ে, ভাইবোন, স্ত্রীগণ, আত্মীয়স্বজন, নিজ হাতে অর্জিত সম্পদ, নিজের ব্যবসা; যার লোকসানে তোমরা শঙ্কিত থাক, তোমাদের পছন্দের ঘরবাড়ী, (এসব) যদি আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল অথবা আল্লাহর পথে জিহাদের চেয়ে বেশী প্রিয় হয়ে যায় তবে অপেক্ষা কর; আল্লাহ তার আযাব পাঠিয়ে দিচ্ছেন। আর (জেনে রাখো!) আল্লাহ পাপিষ্ঠদের হেদায়াত করেন না (যদি তারা নিজ থেকে ফিরে না আসে।) (৯ তাওবাহঃ ২৪)

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদঃ আত্মীয়তা রক্ষায় করণীয়

এখন প্রশ্ন হলঃ আত্মীয়তা রক্ষায় আমাদের করণীয় কী? আমি/আপনি কখন আত্মীয়তা রক্ষাকারী হতে পারব? আত্মীয়তা রক্ষা করতে হলে আমাদেরকে কি করতে হবে, কোন ধরণের পদক্ষেপ নিতে হবে.? কি করলে আমরা আল্লাহর কাছে আত্মীয়তা রক্ষাকারী হিসেবে গণ্য হতে পারব..?

ইসলাম যেহেতু সর্বকালীন, সার্বজনীন। জীবনের সব সমস্যার সমাধান রয়েছে ইসলামী বিধানে। তাই অবশ্যই আমাদের উল্লেখিত প্রশ্নসমূহের সমাধানও ইসলামে থাকার কথা এবং আছেও। এ সকল প্রশ্নের সমাধান আছে রাসূল সাঃর কিছু হাদীছে। যেমন...

হাদীছঃ ১. ইসলামী বিধান মতে আত্মীয়তা রক্ষাকারীর পরিচিতি তুলে ধরে এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে..

عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله ﷺ ليسَ الواصِلُ بالمُكافِئِ ولَكِنِ الواصِلُ الذي إذا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وصَلَها

رواه البخاري في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو، الصفحة أو الرقم5991 :، صحيح.

আব্দুল্লাহ বিন আ'মর রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি (অন্য আত্মীয়ের মন্দ আচরণে অতিষ্ট হয়ে তার সাথে) অনুরূপ (মন্দ) আচরণ করল সে আসলে আত্মীয়তা রক্ষাকারী নয়। প্রকৃত অর্থে আত্মীয়তা রক্ষাকারী ওই ব্যক্তি; যে ছিন্নকারীর সাথেও আত্মীয়তা রক্ষা করে চলে। (বুখারী)

হাদীছঃ ২. সম্পদ ব্যয় বা সাহায্যের ব্যাপারে প্রথমে নিজেকে এবং নিজের পরিবারকে প্রাধান্য দিতে হবে। তারপর আত্মীয় স্বজন। বর্ণিত হচ্ছে..

عن جابر رضي الله عنه عن النبي ﷺ ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذى قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا . مسلم.

জাবির রাঃ থেকে বর্ণিত, নবী সা. বলেছেনঃ প্রথমে তোমার থেকে শুরু করবে। প্রথমে তোমার নিজের জন্য ব্যয় করবে। তোমার প্রয়োজন মিটিয়ে যা বাকি থাকবে এটা পরিবারের জন্য ব্যয় করবে। পরিবারকে দেওয়ার পর যদি বাকি থাকে তবে আত্মীয়দের দেবে। আর আত্মীয়দের দেওয়ার পর যদি বাকি থাকে তবে.. (অন্যদের দেবে। তোমার রোজী) এভাবেই ব্যয় করবে। (মুসলিম)

৭ম পরিচ্ছেদঃ দ্বীন ও আত্মীয়তা

রাসূল সা.র আত্মীয়স্বজনঃ আমাদের নবী মুহাম্মাদ সা. মক্কাহ নগরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। মক্কাহই ছিল তাঁর পিতৃভূমি। তাঁর পরিবার ও আত্মীয় স্বজনের আবাস ছিল মক্কাতেই। নবী সা.র আত্মীয় স্বজনের হাতেই ছিল মক্কাহর ক্ষমতা। তাঁর চাচাগণ ছিলেন মক্কাহর প্রভাবশালী নেতা।

আত্মীদের বিরোধিতাঃ রাসূল সা.র আত্মীয়দের অনেকেই ছিল ইসলাম বিরোধী। ইসলামকে চিরতরে স্তব্দ করে দিতে এবং মুসলিমদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দিতে তারা আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। শেষ পর্যন্ত মুহাম্মাদ সা.র উত্থান এবং ইসলামের জাগরণ ঠেকাতে ব্যর্থ হয়ে রাসূল সা.কে হত্যার পরিকল্পনা করে একদল হত্যাকারী নিয়োগ দিয়েছে। যারা রাতের আঁধারে রাসূল সা.র ঘর অবরোধ করে বাইরে অপেক্ষা করছিল যেন বের হলেই তাকে হত্যা করা যায়।

রাসূল সা.র পদক্ষেপঃ রাসূল সা. তখন আল্লাহর হুকুমে মক্কাহ থেকে হিজরত করে মাদীনাহ চলে যান। এ হিজরত কোনো কাকতালীয় ঘটনা ছিল না। দুই বছর আগ থেকেই রাসূল সা. হিজরতের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন এবং হিজরতের পটভূমি তৈরী করেছিলেন; তিনি মদীনার নেতাদের সাথে চুক্তি করে তাদের থেকে এই মর্মে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে; হিজরতের পর তারা মদীনার শাসন ক্ষমতা নবীর হাতে দিয়ে দেবে এবং নবীর আনুগত্য মেনে নেবে, ঐতিহাসিক ভাবে এ শপথ বাইয়াতে আক্বাবাহ নামে খ্যাত।

হিজরতের পর মাদীনার ক্ষমতা হাতে নিয়ে গড়ে তুলেন মাদীনাহ কেন্দ্রিক ইসলামী সরকার ও সমাজ। কারণ মদীনাহর লোকেরা আগ থেকেই মুসলিম হয়ে গিয়েছিল এবং রাসূল সা.র হাতে (সামাজিক ও রাজনৈতিক) বাইয়াত (আনুগত্যের শপথ) গ্রহণ করেছিল। যার অর্থ ছিল..

- রাসূল মাদীনায় গেলে তারা তাকে আশ্রয় দেবে এবং তার হাতে মাদীনাহর ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়া হবে।
- মাদীনাহবাসী তাদের একক নেতা হিসেবে তাকে মেনে নেবে এবং তার আনুগত্য করবে।
- তিনি যে ভাবে চালাবেন তারা সে ভাবেই চলবে। ইত্যাদি।

মাক্কাহবাসীর সীমালঙ্ঘনঃ কিন্তু মাক্কাহর নেতারা এটা মেনে নিতে পারল না। তারা নবগঠিত ইসলামী সমাজ ও সরকারকে উৎখাত করে মুহাম্মাদ সা. ও তাঁর অনুসারীদের হত্যা করতে উদ্যত হল।

হাতে অস্ত্র তুলে নিলেন রাসূল সাঃ মক্কাবাসীর এমন আচরণে ক্ষেপে উঠল ইসলাম প্রিয় মুসলিম জনতা। তারা নবী সা.র কাছে যুদ্ধের প্রস্তাব করল। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকেও যুদ্ধের অনুমোদন ও বিধান দিয়ে আয়াত নাযিল হল। তখন ইসলামী সরকারের প্রধান নির্বাহী হিসেবে যুদ্ধের হুকুম জারি করলেন রাসূল সা.। তিনি নিজেও হাতে অস্ত্র তুলে নিলেন। সাহাবাদেরকে আদেশ দিলেন অস্ত্র তুলে নিতে। শুরু হল যুদ্ধ, ধারাবাহিক যুদ্ধ, একের পর এক যুদ্ধ। ১০বছরের মাদানী জীবনে প্রায় ৮৭-৯০টি যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন রাসূল সা., যেসব যুদ্ধের অধিকাংশই ছিল রাসূলের আত্মীয়স্বজন তথা মক্কার কুরাইশ গোত্রের বিরুদ্ধে।

রাসূল সা.র বদ-দোয়াঃ রাসূল সা. শুধু যুদ্ধ করেই কান্ত হননি বরং মক্কাবাসীর আচরণে অতিষ্ট হয়ে তাদের বিরুদ্ধে বদ-দোয়াও করেছেন। বলেছেনঃ হে আল্লাহ্! তাদের উপর দুর্ভিক্ষ চাপিয়ে দাও। হাদোছে বর্ণিত হচ্ছে..

عن أبي هريرة أن النبي ﷺ كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة يقول اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة اللهم أنج سلمة بن هشام اللهم أنج الوليد بن الوليد اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر اللهم اجعلها سنين كسني يوسف وأن النبيﷺ قال غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله قال ابن أبي الزناد عن أبيه هذا كله في الصبح

আবু-হুরাইরাহ রা. থেকে বর্ণিত, (ফজর সালাতের) শেষ রাকায়াতে (রুকু থেকে) মাথা তোলার পর রাসূল সা. বলতেনঃ

- হে আল্লাহ! আ'ইয়্যাশ বিন আবু-রাবীয়া'হকে মুক্ত কর।
- হে আল্লাহ! সালামাহ বিন হিশামকে মুক্ত কর।
- হে আল্লাহ! ওয়ালীদ বিন ওয়ালীদকে মুক্ত কর। (উনারা তখন কাফিরদের হাতে বন্দী ছিলেন)
- হে আল্লাহ! (কাফিরদের কব্জা থেকে) অসহায় মুঅমিনদের মুক্ত কর।
- হে আল্লাহ! মুদ্বার (গোত্র)র উপর তোমার আযাবকে অবধারিত করে নাও।
- হে আল্লাহ! কয়েকটি বছরের জন্য তাদের উপর এমন দুর্ভিক্ষ চাপিয়ে দাও যেমন দিয়েছিলে ইউসুফের সময়ে (মিশর বাসীর উপর।)
- নবী সা. আরো বলেছেনঃ গিফার (গোত্র)কে মাফ করে দাও, আসলাম (গোত্র)কে শান্তি দাও। (হাদীছের একজন রাবী) ইবনু আবু-যিনাদ বলেছেনঃ এসব দোয়া হয়েছে সকালের সালাতে। (বুখারীঃ ৯৫২ বাংলা ইফাবা। কোনো কিতাবে এর ক্রমিক হয়েছে ৯৬১, আর কোনো কিতাবে ৯৭৫।)

বানিজ্যিক অবরোধঃ রাসূল সা. শুধু যুদ্ধ আর বদ-দোয়া করেই কান্ত হননি। কার্যকরি পদক্ষেপ হিসেবে তিনি নিজের আত্মীয়স্বজন তথা মক্কাবাসীর বিরুদ্ধে বানিজ্যিক অবরোধ আরোপ করেছিলেন এবং আশপাশের গোত্রগুলোকে সাবধান করে দিয়ে ছিলেন; কেউ যেন মাক্কাহ শহরে খাদ্য সরবরাহ না করে। সাথে সবাইকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছিলেনঃ যে বা যারা মাক্কাহবাসীকে খাদ্য সহায়তা করবে মুসলিমরা তাদেরকে শত্রু হিসেবে বিবেচনা করবে।

আরবে তখন ইসলাম একটি উদিয়মান শক্তি। মাদীনাহ তখন সামরিক শক্তিতে আঞ্চলিক পরাশক্তি হয়ে উঠছে। তাই রাসূলের হুশিয়ারিকে সবাই আমলে নিল এবং মাক্কায় খাদ্য সরবরাহ থেকে বিরত থাকল। ফলে মাক্কাহ শহরে খাদ্য সংকট দেখা দিল। শুরু হল দুর্ভিক্ষ। খাদ্যের অভাবে মক্কার লোকজন তখন মৃত জানোয়ার, কুকুরের মাংস, হাড় ফুটানো পানি, ইত্যাদি খেয়েছে। (দেখুনঃ সূরাহ মুঅমিনঃ ৭৭ তম আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে)

কুরাইশ নেতাদের পদক্ষেপঃ জাতির এমন দুর্দিনে মাক্কাহর নেতা আবু-সুফিয়ান নিরুপায় হয়ে মাদীনাহ এলো এবং রাসূল সা.র সাথে সাক্ষাৎ করে বললঃ মুহাম্মাদ! (উল্লেখ্য আবু-সুফিয়ান নবী সাঃর শশুড় ছিল) তুমি বলছঃ তুমি বিশ্ববাসীর জন্য রহমত? তবে কেন তোমার আত্মীয় বৃদ্ধদেরকে তরবারির আঘাতে আর বাচ্ছাদেরকে খাদ্যাভাবে ধ্বংস করে দিচ্ছ? বর্ণিত হচ্ছে..

عن مسروق قال كنا عند عبد الله فقال إن النبي ﷺ لما رأى من الناس إدبارا قال اللهم سبع كسبع يوسف فأخذتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة والجيف وينظر أحدهم إلى السماء فيرى الدخان من الجوع فأتاه أبو سفيان فقال يا محمد إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم وإن قومك قد هلكوا فادع الله لهم

(প্রসিদ্ধ তাবিয়ী) মাসরুক্ব বলেনঃ একদা আমরা আব্দুল্লাহ বিন মাসউদের সঙ্গে ছিলাম। তিনি বললেনঃ রাসূল সা. যখন দেখলেন (মাক্কাহর) মানুষের (ইসলাম ও মুসলিম) বিরোধিতা (সীমা ছাড়িয়ে গেছে) তখন তিনি (বদ-দোয়া করে) বললেনঃ হে আল্লাহ্! (তাদের উপর এমন) সাতটি (বছর অবধারিত করে দাও) যেমন ইউসুফের সময়ের সাত (বছর দুর্ভিক্ষ দিয়েছিলে। রাসূল সাঃর বদ-দোয়ার) ফলে তাদের উপর (দুর্ভিক্ষের) বছর নেমে এলো যা তাদের সবকিছু ধ্বংস করে দিলো। (দুর্ভিক্ষের তাড়নায়) মানুষ (শুকনো) চামড়া, মৃত পশু, গলিত মরদেহ খেয়েছে। ক্ষুধায় তাদের অবস্থা এমন হয়েছিল যে আকাশের দিকে তাকালে ধোয়াচ্ছন্ন মনে হত। তখন আবু-সুফিয়ান এসে বললঃ মুহাম্মাদ! তুমি আল্লাহর আনুগত্যের কথা বলছো, আত্মীয়তা রক্ষার কথা বলছো, আর তোমার গোত্র (খাদ্যাভাবে) ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে? তাদের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া কর। (বুখারীঃ ৯৫৩ বাংলা ইফাবা। কোনো কিতাবে এর ক্রমিক হয়েছে ৯৬২, আর কোনো কিতাবে ৯৭৬)

পর্যালোচনাঃ আসলে আত্মীয়স্বজন মানুষের উপকারী বন্ধু। জীবনের নানা ক্ষেত্রে আত্মীয়স্বজনের প্রয়োজন হয়। আত্মীয়তার বন্ধন খুব দৃঢ় বন্ধন। যে বন্ধনের টানে অনেক ভালো মানুষও লাইনচ্যুত হয়ে যায়। আবার অনেক মন্দলোকও বাধ্য হয়ে সৎপথে চলে আসে।

ইসলামে আত্মীয়ার গুরুত্ব অপরিসীম। আত্মীয়তা রক্ষা করা ফরজ। আত্মীয়তা ছিন্ন করা মহাপাপ। তথাপিও অনেক ক্ষেত্রে নবী রাসূলগণ পর্যন্ত নিজের আত্মীয়স্বজন ও গোত্র থেকে আলাদা হয়ে গেছেন। তাদের পাপাচারে অতিষ্ট হয়ে বদ-দোয়া করেছেন, আযাবের আহ্বান জানিয়েছেন। ফলে আল্লাহর আযাব তাদের উপর অবধারিত হয়েছে, আযাবে ধ্বংস হয়েছে গোটা জাতি।

আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সা.কেও নিজের আত্মীয়স্বজন ও গোত্রের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে হয়েছে। তিনিও তাদের জন্য বদ-দোয়া করেছেন, তাদের সাথে যুদ্ধ করেছেন। আপন চাচা আব্বাস, চাচাত ভাই আক্বীলসহ অনেক আত্মীয়কে বন্দি করেছেন, তাদের থেকে মুক্তিপণ আদায় করেছেন। নবীজির প্রিয় সাহাবীগণকেও নিজের বাবার বিরুদ্ধে, ছেলের বিরুদ্ধে, ভাইয়ের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে হয়েছে। কারণ আত্মীয়তার চেয়ে দ্বীন বড়। তাই তো ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে দেখা যায়..

- শুধু বিধর্মী হবার কারণে ছেলে তার বাবার সম্পদে অংশ পায় না, বাবা সন্তানের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়।
- মুসলিম হয়েও দারু-ল-হারবে (চুক্তিবিহীন কুফর দেশে) বসবাসের কারণে একে অপরের মিরাছ থেকে বঞ্চিত হতে হয়।

আসল ব্যাপারঃ আসল ব্যাপার হল আত্মীয়তা রক্ষার ক্ষেত্রেও রয়েছে নির্ধারিত নীতিমালা ও নির্ধারিত সীমারেখা। আল্লাহর নির্ধারিত নীতিমালা মেনে এবং এ সীমারেখার ভিতরে থেকেই আমাদেরকে আত্মীয়তা রক্ষা করে চলতে হবে। আত্মীয়তা রক্ষার নামে আল্লাহর নীতিমালার বাইরে গেলে বা আল্লাহর সীমারেখা লঙ্ঘন করলে ঈমান বিনষ্ট হয়ে আ'মাল ও ইবাদাত বরবাদ হয়ে যাবে। তাই কোনো অবস্থাতেই এটা লংঘন করা যাবে না।

কিন্তু আল্লাহর দেয়া নীতিমালা এবং আল্লাহর দেয়া সীমারেখা না জানার কারণে অনেক ক্ষেত্রে মানুষ ধোঁকায় পড়ে যায়। শয়তান তখন আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে মানুষকে ঈমানহারা করে। আর শয়তানের ধোঁকায় পড়ে মানুষ তখন আত্মীয়তা রক্ষার নামে আল্লাহর দেয়া নীতিমালা লঙ্ঘন করে, আল্লাহর পথ ছেড়ে অন্য পথ ধরে।

তাই এ ব্যাপারে আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা জানতে হবে, কুরআন হাদীছে বর্ণিত নীতিমালা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে হবে এবং এসব মেনে চলতে হবে। নিম্নে আত্মীয়তার ব্যাপারে অতি গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি নীতিমালা পেশ করা হল..

নীতিঃ ১. আত্মীয়স্বজন যদি নীতিহীন, আদর্শহীন হয়ে আল্লাহ্ ও রাসূলের অবাধ্য হয়ে যায় তবে তাদের আপন বা মিত্র হিসেবে মেনে নেয়া যাবে না। বরং তাদের থেকে আদর্শিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। ইরশাদ হচ্ছে..

لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (3)

(মনে রেখ) কিয়ামতের দিন তোমাদের আত্মীয়স্বজন, সন্তান-সন্ততি কোনো কাজে আসবে না। (সে দিন) তিনি সবাইকে পরস্পর থেকে আলাদা করে দেবেন। তোমরা যা কর আল্লাহ সব প্রত্যক্ষ করেন। (৬০ মুমতাহিনাহঃ ৩)

নীতিঃ ২. যেসব আত্মীয়স্বজন ঈমানের চেয়ে কুফরকে বেশী পছন্দ করে তাদের ওয়ালী তথা সামাজিক মিত্র বা অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করা বা মেনে নেওয়া যাবে না। ইরশাদ হচ্ছে..

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (23)

ওহে যারা ঈমান এনেছো! (শুনো!) তোমাদের বাবা-মা, ভাইবোন যদি ঈমানের চেয়ে কুফরকে বেশী পছন্দ করে তবে তাদেরকে ওয়ালী বানিও না /ওয়ালী হিসেবে মেনে নিও না। তোমাদের কেউ যদি তাদেরকে ওয়ালী বানায় /ওয়ালী হিসেবে মেনে নেয় তবে সে অপরাধী হিসেবে গন্য হবে। (৯ তাওবাহঃ ২৩)

নীতিঃ ৩. আল্লাহ্, আল্লাহর রাসূল, আল্লাহর দ্বীন এবং দ্বীনি কাজের চেয়ে আত্মীয়স্বজনকে বেশী ভালোবাসলে বা বেশী গুরুত্ব দিলে আল্লাহর আযাব অবধারিত হয়ে যায়। তাই এ ব্যাপারে সাবধান থাকতে হবে। ইরশাদ হচ্ছে..

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (24)

বলে দাওঃ তোমাদের বাবা-মা, ছেলেমেয়ে, ভাইবোন, স্ত্রীগণ, আত্মীয়স্বজন, নিজ হাতে অর্জিত সম্পদ, নিজের ব্যবসা; যার লোকসানে তোমরা শঙ্কিত থাক, তোমাদের পছন্দের ঘরবাড়ী, (এসব) যদি আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল অথবা আল্লাহর পথে জিহাদ অপেক্ষা বেশী প্রিয় হয়ে যায় তবে অপেক্ষা কর। আল্লাহ তার আযাব পাঠিয়ে দিচ্ছেন। আল্লাহ পাপিষ্ঠদের হেদায়াত করেন না। (৯ তাওবাহঃ ২৪)

নীতিঃ ৪. যে সব আত্মীয়স্বজন দ্বীনি কাজে বাঁধা হয়ে দাড়ায় এদেরকে আদর্শিক শত্রু হিসেবে দেখতে হবে। তবে পারিবারিক ভাবে এদের সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে। ইরশাদ হচ্ছে..

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (14)

ওহে যারা ঈমান এনেছো! (শুনো!) তোমাদের কোনো কোনো স্ত্রী ও সন্তান তোমাদের শত্রু, (যারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ, হিজরত, দ্বীনি কাজ ও দ্বীনের জন্য ত্যাগ স্বীকার থেকে বিরত রাখে) তাই তাদের ব্যাপারে সাবধান থাকো। তবে তাদের উপেক্ষা কর, ক্ষমা কর, মার্জনা কর (এটাই উত্তম হবে।) নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়াময়। (৬৪ তাগা'বুনঃ ১৪)

৮ম পরিচ্ছেদঃ আত্মীয়তা রক্ষার বিধান

দুনিয়া এক বিচিত্রময় জায়গা। দুনিয়ার মানুষগুলোও বিচিত্রময়। আমাদের আত্মীয়স্বজনও এ বৈচিত্রের বাইরে নয়। আসলে আত্মীয়স্বজন নানা ধরণের এবং নানা স্বভাবের হয়ে থাকেন। যেমন..

- নীতিবান আদর্শবান দ্বীনদার আত্মীয়।
- নীতিহীন আদর্শহীন দ্বীনহীন আত্মীয়।
- যে সব আত্মীয় পাপের পথে চলে এবং পাপের কথা বলে।
- যে সব আত্মীয় দ্বীনি কাজে বাঁধা দেয়।
- যে সব আত্মীয় ইসলামের চেয়ে কুফরকে বেশী ভালোবাসে।
- যে সব আত্মীয়স্বজন ইসলাম বিদ্বেষী ও ইসলাম বিরোধী হয়ে যায়।
- অভদ্র আত্মীয়স্বজন। ইত্যাদি।

আত্মীয়দের শ্রেণী, স্বভাব ও ধরণ বুঝে আত্মীয়তা রক্ষার নীতিমালাও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে, তাই আত্মীয়দের অবস্থা ও ধরন বুঝে বিধান প্রয়োগ করতে হবে। যেমন...

বিধানঃ ১. নীতিবান, আদর্শবান এবং দ্বীনদার আত্মীয়দের সাথে আত্মীয়তা রক্ষার সকল নীতিমানা ও বিধান মেনে চলতে হবে। কোনো অবস্থাতেই তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা যাবে না বা দূরত্ব বজায় রাখা যাবে না। তাদের ব্যাপারে আমরা মেনে চলব আল-কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ। যেমন ইরশাদ হচ্ছে..

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا ۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا (6)

নবী (নবীর প্রতিনিধি হিসেবে ইসলামী সরকার) মুঅমিনদের ব্যাপারে তাদের নিজের চেয়েও বেশী দায়িত্বশীল। নবীর স্ত্রীগণ তাদের মা। (মা হিসেবে নবীর স্ত্রীদের ভরণপোষণ করা জাতির কর্তব্য। জাতির পক্ষ থেকে এ দায়িত্ব পালন করবে সরকার।) আল্লাহর কিতাবে (বর্ণিত বিধান মতে) মুঅমিন মুহাজির আত্মীয়স্বজন পরস্পরের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। (এহচ্ছে দায়িত্বের সীমানা) তবে তোমরা তোমাদের আওলিয়াদের (মিত্রদের/দায়িত্বের আওতাধীন ব্যক্তিদের) ব্যাপারে আইনত দায়িত্ব পালন করবে। এসবই হলো কিতাবে লিপিবদ্ধ (বিধান।) (আহযাবঃ ৬)

জ্ঞাতব্যঃ ইসলামের সূচনাতে বিধান ছিলঃ ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি মারা গেলে রাসূল সা. তার জানাযা পড়াতেন না (যতক্ষণ না কেউ ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব নেয়।) আর উক্ত আয়াত নাযিলের পর রাসূল সা. ঘোষণা করলেনঃ মুঅমিনদের ব্যাপারে আমি তাদের নিজের চেয়েও বেশী দায়িত্বশীল, (আল্লাহ আমাকে এ দায়িত্ব দিয়েছেন) সুতরাং কেউ ঋণ রেখে মারা গেলে এটা পরিশোধের দায়িত্ব আমার আর সম্পদ রেখে মারা গেলে এটা তার উত্তরাধিকারীদের। (কুরতুবীঃ বুখারী, মুসলিম) (দেখুন বুখারীঃ ৪৪১৯ তাফসীর অধ্যায়)

আইন ও বিধানঃ খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, নিরাপত্তা, ইত্যাদি হচ্ছে মানুষের নাগরিক অধিকার। প্রতিটি নাগরিকের নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করা সরকারের দায়িত্ব। মানুষ তার নিজের অধিকারের ব্যাপারে যতটুকু দায়িত্ব শীল, সরকার এরচেয়ে বেশী দায়িত্বশীল হবে। সরকারকে এ দায়িত্ব দিয়েছে ইসলাম। তাই কেউ তার নিজের উপর, পরিবারের উপর, সন্তানের উপর বা দাসদাসীর উপর অবিচার করলেও সরকারকে এসব ঠেকাতে হবে। কেউ ঋণ রেখে মারা গেলে তার সম্পদ বন্টনের আগে রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে এটা পরিশোধ করতে হবে আর সম্পদ না থাকলে এ ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব সরকারের, ইসলামী সরকার এ ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করবে।

অন্য আয়াতে বলা হচ্ছে..

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۚ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (74) وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (75)

যারা ঈমান আনে, হিজরত করে, আল্লাহর পথে জিহাদ করে আর যারা এদেরকে আশ্রয় দেয়, সাহায্য করে, তারাই (তথা এ ৫ গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিরাই) আসল মুঅমিন। তাদের জন্য আছে সাধারণ ক্ষমা ও সম্মানজনক রিজক। আর

যারা পরে ঈমান আনবে, হিজরত করবে এবং তোমাদের সঙ্গী হয়ে জিহাদ করবে তারাও তোমাদের সঙ্গী হিসেবে বিবেচিত হবে। আল্লাহর কিতাবে (লিখিত বিধান মতে) নিকট আত্মীয়গণ একে অপরের ওয়ালী। (৮ আনফালঃ ৭৪-৭৫)

প্রাসঙ্গিক আলোচনাঃ ওয়ালী পরিচিতিঃ ওয়ালী অর্থ মিত্র, অভিভাবক, দায়িত্বশীল, কর্তৃত্বশীল, নীতিনির্ধারক, ইত্যাদি। ওয়ালী সম্পর্কে আল-কুরআনে যেসব কথা বলা হয়েছে এর সারসংক্ষেপ হল..

১. আল্লাহ সকল মুঅমিনের ওয়ালী। (বাক্বারাহঃ ২৫৭) এর মানে হচ্ছে আল্লাহ সকল মুঅমিনের জন্য একমাত্র কর্তৃত্বশীল নীতিনির্ধারিক।

২. আল্লাহ ছাড়া তোমাদের আর কোনো ওয়ালী নেই। (বাক্বারাহঃ ১০৭) এর মানে হচ্ছে আল্লাহ ছারা অন্যকে কর্তৃত্বশীল বা নীতিনির্ধারিক হিসেবে মানা যাবে না।

৩. এক মুঅমিন অন্য মুঅমিনের ওয়ালী। (তাওবাহঃ ৭১) এর মানে হচ্ছে দুনিয়ার সকল মুঅমিন অন্য সকল মুঅমিনের ব্যাপারে দায়িত্বশীল মিত্র।

৪. কোনো কাফিরকে ওয়ালী বানানো যাবে না। (নিসাঃ ১৪৪) এর মানে হচ্ছে কোনো কাফিরকে অভিভাবক বা মিত্র বানানো যাবে না।

৫. যে সব মুসলিম আত্মীয়-স্বজন ঈমানের চেয়ে কুফরকে বেশী ভালোবাসবে তাদেরকে ওয়ালী হিসেবে গ্রহন করা যাবেনা। (তাওবাহঃ ২৩) এর মানে হচ্ছে তাদেরকে অভিভাবক হিসেবে মেনে নেওয়া যাবে না।

আমরা কাকে ওয়ালী বানাব আর কাকে বানাব না। এসম্পর্কে মূলনীতি ঠিক করে দিয়েছেন মহান রাব্ব। আক্বীদার পরিভাষায় ইহাকে বলা হয় "আল-ওয়ালা ওয়া-ল-বারা"। এ সম্পর্কে জানতে আমাদের ইসলাম শিক্ষা সিলেবাসের ৪র্থ বই "ঈমানের উপর অবিচল থাকা" দেখে নিন।
"আল-ওয়ালা ওয়া-ল-বারা"

ইসলাম সর্বকালীন সার্বজনীন। ইসলামই মানব জাতির জন্য আল্লাহর মনোনীত একমাত্র জীবন আদর্শ। জীবনের সকল বিষয়ে মৌলিক নীতিমালা ঠিক করে দিয়েছে ইসলাম। বন্ধুত্ব মানব জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই ব্যাপারটি এড়িয়ে যায়নি ইসলাম। শারীয়া'হ বিধান মতে বন্ধুত্বের কয়েকটি ধাপ রয়েছে। যথাঃ

ক. সাধারণ বন্ধু, রাফিক্বঃ রাফিক্ব অর্থ কোমল, নমনীয়। চলার পথে, কর্মক্ষেত্রে বা সমাজের সদস্য হিসেবে মানুষের মাঝে পরস্পরে সম্পর্ক গড়ে উঠে। এক সময়ে এ সম্পর্ক হৃদ্যতায় রূপ নেয়। মানুষ তখন একে অন্যের প্রতি কোমল ও নমনীয় হয়ে যায়। এমন সম্পর্কের উপর গড়ে উঠা বন্ধুকে বলা হয় সাধারণ বন্ধু, রাফিক্ব।

খ. বিশ্বস্থ বন্ধু, সাদীক্বঃ সাদীক্ব অর্থ বিশ্বস্থ। ধীরে ধীরে মানুষের সম্পর্ক আরো গভীর হয়। এক পর্যায়ে একে অন্যকে বিশ্বাস করতে শুরু করে। একে অপরকে বিশ্বাস করে নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপারেও শামিল করে নেয়। এমন বন্ধুকে বলে সাদীক্ব, বিশ্বস্থ বন্ধু।

রাফিক্ব ও সাদীক্ব এদুই ধরণের বন্ধুত্বের মূলভিত্তি মানবতা। মানুষ হিসেবে যে কারো সাথে এমন বন্ধুত্ব হতে পারে। এতে শারীয়া'হ কোনো বাধানিষেধ আরোপ করেনি।

গ. অন্তরঙ্গ বন্ধু বা আদর্শিক বন্ধু, খালীলঃ খালীল অর্থ অতি আপনজন, একান্ত বন্ধু, অন্তরঙ্গ বন্ধু। দিনে দিনে মানুষের সম্পর্ক আরো গভীর হয়। এক সময় বন্ধুত্বের সম্পর্ক এমন পর্যায়ে পৌছে যায় যে, এক বন্ধু অন্য বন্ধুর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়। এমন অন্তরঙ্গ ও আদর্শিক বন্ধুকে বলে খালীল, একান্ত বন্ধু বা অন্তরঙ্গ বন্ধু।
এমন বন্ধুত্বের মূল বিষয় আন্তরিক ভালোবাসা বা একনিষ্ঠ ভালোবাসা। এমন বন্ধুত্ব সবার সাথে করা ভালো নয়। মন্দলোকের সাথে এমন সম্পর্ক করলে বিভ্রান্তির সম্ভাবনাই বেশী। তাই রাসূল সাঃ এমন বন্ধুত্বের ব্যাপারে সাবধান করে দিয়েছেন। বর্ণিত হয়েছে..

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم **المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل**..رواه أحمد، والترمذي، وأبو داود، والبيهقي

আবু-হুরাইরাহ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ মানুষ তার খালীলের আদর্শে আদর্শবান হয়। তাই সে যেন ভেবে দেখে; কাকে সে খালীল বানাবে। (আহমদ, আবু-দাউদ, তিরমিযী। ইমাম নববী বলেছেনঃ হাদীছটি সাহীহ।)

ঘ. ওয়ালীঃ ওয়ালী অর্থ মিত্র, অভিভাবক, দায়িত্বশীল। বন্ধুত্বের সম্পর্ক যখন এমন পর্যায়ে পৌছে যায় যে, এক বন্ধু আরেক বন্ধুর দায়ভার নিতে বা বন্ধুর জন্য কোনো ঝামেলায় জড়াতেও দ্বিধা করে না। অর্থাৎ যে বন্ধুত্বের সাথে অভিভাবকত্বসহ অনেক দায়ভার এসে যায়। এমন বন্ধুকে বলে ওয়ালী।

কে ওয়ালী হবেঃ ওয়ালী ব্যক্তি হতে পারে, পরিবার হতে পারে, সম্প্রদায় হতে পারে, জাতি হতে পারে বা রাষ্ট্র হতে পারে। ওয়ালীর সাথে সামাজিক অভিভাবকত্বও জড়িত। সামাজিক চুক্তি, শান্তি চুক্তি, সামরিক চুক্তি, ইত্যাদির মাধ্যমেও পরস্পরের ওয়ালী হওয়া যায়। ওয়ালী হবার অনেক পদ্ধতি ও সূত্র রয়েছে। যথা...

- জন্ম সূত্রে মানুষ একে অপরের ওয়ালী হয়। যেমনঃ বাপ সন্তানের ওয়ালী হবে যদি সে মুঅমিন হয়।
- সামাজিক সূত্রে মানুষ একে অপরের ওয়ালী হয়। যেমনঃ স্বামী তার স্ত্রীর ওয়ালী, সরকার জনতার ওয়ালী হবে যদি তারা মুঅমিন হয়।
- কোনো কাফির, মুশরিক, নাস্তিক বা মুরতাদ (যতই আপন হক না কেন) মুঅমিনের ওয়ালী হতে পারবে না।
- চুক্তির মাধ্যমেও একে অপরকে ওয়ালী বানানো যায়। ব্যক্তির সাথে, পরিবারের সাথে, সম্প্রদায়ের সাথে, জাতির সাথে এবং রাষ্ট্রের সাথে চুক্তি করে একে অপরকে ওয়ালী বানাতে পারবে।

ওয়ালী হবার বা ওয়ালী বানাবার মূল ভিত্তি ঈমান। মুসলিমগণ শুধু ঈমানের ভিত্তিতেই একে অপরের ওয়ালী হতে পারবে বা ওয়ালী বানাতে পারবে। কাফির, মুশরিক বা মুনাফিক কোনো মুঅমিনের ওয়ালী হতে পারে না। এদের সাথে এমন সম্পর্ক রাখা পাপ ও বিভ্রান্তির পথ। প্রকৃত মুঅমিন না হলে আপন বাবা, মা, ভাই, বোনদের সাথেও এমন সম্পর্ক রাখতে বারণ করা হয়েছে। (দেখুন সূরাহ তাওবাহঃ ২৩)
সুতরাং...

- কাফির পিতা মুসলিম সন্তানের ওয়ালী হয় না। তাই মুসলিম সন্তান মারা গেলে কাফির পিতা তার সম্পদের উত্তরাধিকারী পায় না।
- কাফির সন্তান মুসলিম পিতা মাতার ওয়ালী হয় না। তাই মুসলিম পিতা মাতা মারা গেলে কাফির সন্তান তাদের সম্পদে অংশ পায় না।
- কাফির বা মুশরিক স্বামী মুসলিম স্ত্রীর ওয়ালী হয় না। তাই স্বামী মুরতাদ হয়ে গেলে বা কাফিরের স্ত্রী মুসলিম হয়ে গেলে তাদের বিবাহ ভেঙ্গে যায়। এবং এই স্ত্রী তালাক ছাড়াই অন্য মুসলিমকে বিয়ে করতে পারে। (এসম্পর্কে জানতে আমাদের সিলেবাসের ৪র্থ বইয়ে "আল-ওয়ালা ওয়া-ল-বারা" পাঠটি পড়ে নিন)

বিধানঃ ২. যে সব আত্মীয়স্বজন নীতিহীন আদর্শহীন হয়ে পাপের পথে চলে গেছে তাদের সাথে আমরা ভালো ব্যবহার করব তবে তাদের নীতি আদর্শ গ্রহণ করব না, পাপের পথে তাদের সঙ্গী হব না। তাদের ব্যাপারে মেনে চলব আবু-হুরাইরাহ রা. থেকে বর্ণিত মুসলিমের হাদীছ, যা এ অধ্যায়ের ৫ম অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে উৎসাহ দেয়া হয়েছে; আত্মীয়স্বজন খারাপ হয়ে গেলেও তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করতে।

বিধানঃ ৩. যেসব আত্মীয় পাপের পথে চলে এবং পাপের কথা বলে। তাদের ব্যাপারে আমরা মেনে চলব সূরাহ লুক্বমানের ১৫তম আয়াতের বিধান। যেখানে বলা হয়েছেঃ

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (15)

আর বাবা-মা যদি কান্ডজ্ঞানহীন হয়ে যায় এবং শিরক (পাপ) করার জন্য তোমার উপর চাপ প্রয়োগ করে, তবুও তাদের কথা মেনে নেওয়া যাবে না। তবে দুনিয়ার জীবনে তাদের সাথে মা'রুফ (রীতিনীতি, আইন, বিধান) মত সহাবস্থান করবে। আর (আদর্শগত ভাবে) শুধু তার পথই গ্রহণ করবে যে আমার দিকে ধাবিত হয়। তোমরা সবাই আমার কাছে ফিরে আসবে, আমিই বদলা দেব তোমাদের সকল কাজের। (৩১ লুকমানঃ ১৫)

বিধানঃ ৪. যে সব আত্মীয় ইসলামের চেয়ে কুফরকে বেশী ভালোবাসবে আমরা তাদেরকে আত্মীয় হিসেবে মেনে নিলেও আপন বা সামাজিক মিত্র অথবা অভিভাবক হিসেবে মেনে নেব না। এ ব্যাপারে আমরা মেনে চলব সূরাহ তাওবাহর ২৩ তম আয়াতের বিধান। যেখানে বলা হয়েছেঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (23)

মুঅমিনগণ! তোমাদের বাবা-মা, ভাইবোন যদি ঈমানের চেয়ে কুফরকে বেশী পছন্দ করে তবে তাদেরকে ওয়ালী (অভিভাবক বা সামাজিক মিত্র) বানিও না /ওয়ালী হিসেবে মেনে নিও না। তোমাদের যে ব্যক্তি তাদেরকে ওয়ালী বানাবে /ওয়ালী হিসেবে মেনে নেবে সে অপরাধী হয়ে যাবে। (৯ তাওবাহঃ ২৩)

বিধানঃ ৫. আমাদের যেসব আত্মীয় দ্বীনি কাজে বাঁধা দেবে বা বাঁধা হয়ে দাঁড়াবে আমরা তাদের সাথে আত্মীয় হিসেবে ভালো ব্যবহার করব তবে তাদেরকে আদর্শিক শত্রু মনে করব। তাদের ব্যাপারে মেনে চলব সূরাহ তাগা'বুনের ১৪তম আয়াত। যেখানে বলা হয়েছে..

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (14)

মুঅমিনগণ! তোমাদের কোনো কোনো স্ত্রী ও সন্তান তোমাদের শত্রু, (যারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ, হিজরত, দ্বীনি কাজ ও দ্বীনের জন্য ত্যাগ স্বীকার থেকে বিরত রাখে) তাই তাদের ব্যাপারে সাবধান থেকো। তাদের উপেক্ষা কর, ক্ষমা কর, মার্জনা কর (এটাই উত্তম) নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়াময়। (৬৪ তাগা'বুনঃ ১৪)

বিধানঃ ৬. আমাদের যে সব আত্মীয় ইসলাম বিদ্বেষী বা ইসলাম বিরোধী হয়ে যাবে তাদের ব্যাপারে আমাদেরকে কঠোর হতে হবে। প্রয়োজনে তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নিতে হবে। যেমন করেছেন নবী সা.সহ অন্যান্য নবী, রাসূল ও সাহাবীগণ। যে কথা বলা হয়েছে এ অধ্যায়ের ৭ম অনুচ্ছেদে।

অনুচ্ছেদঃ ১৫. যৌনাঙ্গের হেফাজত করা

আমাদের উপর অন্যতম আরো একটি ফরজ দায়িত্ব হলো যৌনাঙ্গের হেফাজত করা। যৌনাঙ্গের হেফাজত করা পুরুষ, নারী সকলের জন্যই ফরজ। এ ব্যাপারে বিধান দিয়ে নাযিল হয়েছে..

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

(হে নবী!) মুঅমিন পুরুষদেরকে বলে দাওঃ তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং নিজ নিজ যৌনাঙ্গের হেফাজত করে (এর অবৈধ ব্যবহার থেকে বিরত থাকে।) পরিচ্ছন্ন জীবন যাপনের জন্য এটা খুবই উত্তম ব্যবস্থা। (তারা যেন জেনে রাখে) তাদের প্রতিটি পদক্ষেপের ব্যাপারে আল্লাহ অবগত। আর মুঅমিনাহ নারীদেরকে বলে দাওঃ তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং নিজ নিজ যৌনাঙ্গের হেফাজত করে...। (২৪ নূরঃ ৩০-৩১)

জ্ঞাতব্যঃ এখানে যৌনাঙ্গের হেফাজত বলতে বুঝানো হয়েছে অবৈধ যৌনাচার অর্থাৎ যিনা ও সমকামিতা থেকে বিরত থাকা।

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে..

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (1) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (2) وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ (3) وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ (4) وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (7)

মুঅমিনগণ অবশ্যই সফল (এখান থেকে ১১ আয়াতে মুঅমিনদের কথা বলা হয়েছে। প্রথম ৯ আয়াত মুঅমিনদের গুনাগুণ সম্পর্কে)

- যারা খুশু' সহকারে সালাত আদায় করে (অন্তর ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সমন্বয়ে একাগ্রতা ও নিষ্ঠার সাথে বিনীত ভাবে এবাদত করাকে খুশু' বলে)
- যারা লাগ'ও (পাপ কথা ও পাপ কাজ) পরিহার করে,
- যারা যাকাত আদায়ে কার্যকর ভূমিকা রাখে,
- যারা নিজের স্ত্রীগণ এবং অধীনস্থ দাসীগণ ছাড়া অন্যদের থেকে নিজেদের যৌনাঙ্গকে হেফাজতে রাখে, তবে এদের সাথে (স্ত্রী ও দাসীর সাথে যৌন মিলন) অপরাধ নয়।
- যে সব লোক (যৌন মিলনের জন্য) এদের (স্ত্রী/দাসী) ছাড়া অন্য কারো সন্ধান করল তারা পাপিষ্ঠ। (২৩ মুঅমিনূনঃ ১-৭)

পর্যালোচনাঃ মুসলিম হিসেবে একজন পুরুষ বা নারীর চরিত্র, প্রজজন এবং যৌন জীবনকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যাপারে ইসলামী শারীয়া'হ তিন স্তরের নিরাপত্তা বেষ্টনী বা বিধান দিয়েছে। যথাঃ হিজাব, সতর ঢাকা এবং যৌনাঙ্গের হাফাজত করা। এ তিনটিও আমাদের উপর ফরজ করা হয়েছে। তবে এর মাঝে যৌনাঙ্গের হেফাজত হচ্ছে মূল বিষয় আর হিজাব ও সতর ঢাকা যৌনাঙ্গ হেফাজতের জন্য নিরাপত্তা বেষ্টনী।

তাইতো কখনো কোনো কারণ বশত হিজাব না করার বা সতর খোলা রাখার অনুমোদন থাকলেও কোনো অবস্থাতেই যৌনাঙ্গের অবৈধ ব্যবহার অনুমোদিত হয় না।

অনুচ্ছেদঃ ১৬. সতর ঢাকা

আমাদের উপর আরো একটি ফরজ দায়িত্ব হলো নিজের সতরকে অন্য লোকদের থেকে ঢেকে রাখা তথা হিজাব করা। এ ব্যাপারে বিধান দিয়ে নাযিল হয়েছে..

فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ ۖ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ (22)

শয়তান ধোঁকা দিয়ে তাদের পদস্খলন ঘটাল। (শয়তানের কথায় প্রতারিত হয়ে আদম ও হাওয়্যা নিষিদ্ধ ফল খেয়ে ফেলল। আর) গাছটির স্বাদ গ্রহণ করতেই (জান্নাতের পোশাক তাদের শরীর থেকে খসে পড়ল এবং) তাদের সাওআত (লজ্জাস্থান/সতর) উন্মুক্ত হয়ে গেল। তারা জান্নাতের বৃক্ষপাতা দিয়ে নিজেদের সাওআত (লজ্জাস্থান/সতর) ঢাকতে শুরু করল। তখন রাব্ব তাদের ডেকে বললেনঃ আমি কী তোমাদেরকে ওই গাছ থেকে নিষেধ করিনি? আমি কী বলিনিঃ শয়তান তোমাদের সুস্পষ্ট দুশমন। (উলঙ্গপনা শয়তানের পছন্দ। তাই শয়তানের অনুকরণকারীরাও উলঙ্গপনা পছন্দ করে।) (৭ আ'রাফঃ ২২)

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ (26)

হে আদম সন্তান! আমি তোমাদের জন্য পোশাক (এর উপকরণ ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান) নাযিল করেছি, যেন তোমরা নিজেদের সাওআত (লজ্জাস্থান/সতর) ঢেকে রাখো এবং (এ পোশাক তোমাদের জন্য) "রিশ" (সৌন্দর্য বর্ধনের উপকরণও বটে। সুন্দর পোশাক মানুষের সৌন্দর্যকে আরো সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলে) তবে তাকওয়ার (পাপ মুক্ত থাকার) পোশাকই (তোমাদের জন্য) সর্বউৎকৃষ্ট (পোশাক। আর মনে রেখো!) এসবই হলো আল্লাহর বিধান, তোমরা এসব মেনে চলবে। (৭ আ'রাফঃ ২৬)

আইন ও বিধানঃ "সাওআত" শব্দটি এসেছে আরবী "সূ" শব্দ থেকে। "সূ" অর্থ মন্দ, খারাপ। যে সব বস্তু দেখতে সুন্দর নয় বা দেখতে ভালো লাগে না এসবকে বলা হয় "সাওআত"। উক্ত আয়াতে সাওআত বলে লজ্জাস্থান/সতর বুঝানো হয়েছে। লজ্জা নিবারণ করা এবং নিজের লজ্জা অন্য থেকে ঢেকে রাখা সভ্য মানুষের জন্য অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই নিজের লজ্জাস্থান বা সতরকে অন্যদের থেকে ঢেকে রাখা ফরজ করে দিয়েছে ইসলাম।

কুরআন আমাদেরকে নিজ নিজ "সাওআত" ঢেকে রাখার আদেশ দিয়েছে এবং বলেছে সাওআত খোলা রাখা শয়তানের পছন্দ। তবে আমাদের "সাওআত" বলতে কোন কোন অঙ্গকে বুঝানো হয়েছে? কুরআন এ কথাটি স্পষ্ট করে বলেনি। এ ব্যাপারে হাদীছের বক্তব্যও একক এবং সুস্পষ্ট নয়। (হয়ত এমন অস্পষ্টতার পিছনে স্থান কাল পাত্র ভেদে মানুষকে সুবিধা দেওয়াই আল্লাহ ও রাসূলের লক্ষ হতে পারে, যা অনেক ব্যাপারেই হয়ে থাকে।) সুতরাং বিষয়টি সুস্পষ্ট না থাকার কারণে ফিক্বহী ইমামগণের সামনে ভিন্ন মতের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং উনারাও ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। ইসলামী শারীয়া'হ মতে পুরুষ ও নারীর শরীরের কতটুকু ঢেকে রাখা আবশ্যক এ বিষয়ে ফিক্বহী ইমামগণের মতামত নিম্নে পেশ করা হলো..

পুরুষের সতরঃ পুরুষের সতর নিয়ে প্রসিদ্ধ তিনটি অভিমত পাওয়া যায়..

অভিমতঃ ১. শুধু মলদ্বার ও মূত্রদ্বার ডেকে রাখাই যথেষ্ট। অর্থাৎ উড়ু সতরের অন্তর্গত নয় (দলীল উপরের আয়াত যেখানে সাওয়াত ঢেকে রাখার কথা বলা হয়েছে। আর এ আয়াতের বিশ্লেষক দলীল হচ্ছে বুখারীর একটি হাদীছ যেখানে আনাস রা. বলেছেনঃ একদা রাসূল সা. তদীয় উড়ু উন্মুক্ত করেছেন এবং আনাস রা. রাসূল সা.র উড়ু দেখেছেন। এতে বুঝা যায় উড়ু সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়।)

অভিমতঃ ২. শুধু মলদ্বার ও মূত্রদ্বার ডেকে রাখা ফরজ তবে উড়ু ঢেকে রাখা মুস্তাহাব। (কারণ মলদ্বার ও মূত্রদ্বার ঢেকে রাখার কথা কুরআনে বলা হয়েছে যা ফরজ হবার জন্য যথেষ্ট দলীল হিসেবে বিবেচিত। আর উড়ু ঢেকে রাখার কথা অনেক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে যা দলীল হিসেবে মুস্তাহাব প্রমাণ করবে।)

অভিমতঃ ৩. পুরুষের সতর নাভীর নীচ থেকে হাটু পর্যন্ত। (এ অভিমতটি আমাদের সমাজে প্রসিদ্ধ। দলীলঃ উড়ু ঢেকে রাখার কথা অনেক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে।)

নারীর সতরঃ আজাদ নারীদের সতর হলো কব্জি পর্যন্ত হাত, মুখমণ্ডল এবং পায়ের পাতা ছাড়া সমস্ত শরীর। (এ মতটি-ই প্রসিদ্ধ তবে কারো কারো মতে হাত এবং মুখ মণ্ডলও ডেকে রাখবে।) স্বাধীন নারীরা তাদের মাহরাম ছাড়া অন্য পুরুষ থেকে এসব অঙ্গ ঢেকে রাখবে। মাহরামদের জন্য নারীদের মাথা, গলা, বুক (স্তনের উপরের অংশ) সমস্ত হাত এবং হাটু পর্যন্ত পা সতর নয়। আর স্বামীর জন্য স্ত্রীর কোনো অঙ্গই সতর নয়। দাসীর জন্য মুনিবের কোনো অঙ্গই সতর নয়।

দাসীর সতরঃ দাসীদের জন্য হিজার নেই। তাদের সতরের ব্যাপারে কুরআন বা হাদীছে স্পষ্ট করে কিছু বলা হয়নি। তবে ফাক্বীহদের কাছ থেকে এ ব্যাপারে দুটি মত পাওয়া যায়। আর তা হলো..

১. দাসীরদের সতর নাভী থেকে হাটু পর্যন্ত। দাসীর জন্য এতোটুকু ঢেকে রাখাই যথেষ্ট এবং এতোটুকু ঢেকে সালাত আদায় করলেই সালাত হয়ে যাবে।

২. আজাদ নারীরা তাদের মাহরাম পুরুষের জন্য যতটুকু ঢেকে রাখে দাসীরা মালীক ছাড়া অন্য পুরুষ থেকে ততটুকু ঢেকে রাখবে।

অনুচ্ছেদঃ ১৭. হিজাব

আমাদের নারীদের উপর আরো একটি ফরজ দায়িত্ব হলো হিজাব করা। হিজাব আসলে ব্যক্তিগত ফরজ হলেও সমাজের উপর এর প্রভাব অনেক বেশী। তাই এটাকে সামাজিক ফরজও বলা চলে। এ ব্যাপারে নাযিল হয়েছে..

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (31)

আর মুঅমিনাহ নারীদের বলে দাওঃ

- তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং নিজের যৌনাঙ্গের হেফাজত করে আর
- তারা যেন (মাহরাম ছাড়া অন্য পুরুষের সামনে) নিজেদের সৌন্দর্য্য প্রকাশ না করে, তবে যতটুকু (সাধারণত) প্রকাশ হয়ে যায় (ততটুকু প্রকাশ করা দোষের নয়।)
- তারা যেন তাদের বক্ষদেশ ওড়না দিয়ে ঢেকে রাখে

- তারা যেন (অন্য লোকদের কাছে) নিজের সৌন্দর্য্য প্রদর্শন না করে। তবে আপন স্বামী, নিজের বাপদাদা, স্বামীর বাপদাদা, নিজের ছেলে, স্বামীর ছেলে (যারা অন্য স্ত্রীর গর্ভ থেকে জন্মেছে) নিজের ভাই, ভাইয়ের ছেলে, বোনের ছেলে, আপন নারীগণ, নিজের মালিকানাধীন দাস, যৌন কামনাহীন পুরুষ এবং এমন বালক যারা নারীদের গোপন বিষয় বুঝে না (এসব পুরুষের সামনে সৌন্দর্য্য প্রকাশে পাপ হয় না।)
- (নারীরা যেন পথ চলার সময়) তাদের গোপন সৌন্দর্য সম্পর্কে ধারণা দেবার জন্য পা দিয়ে (জমীনে সজোরে) আঘাত না করে।

হে মুঅমিনগণ! তোমরা সবাই (পাপের পথ ত্যাগ করে) আল্লাহর দিকে ফিরে আসো, এতেই তোমাদের সাফল্য।

(২৪ নূরঃ ৩১)

জ্ঞাতব্যঃ এখানে মুঅমিনাহ নারীদের বলা হয়েছে..

- তারা যেন নিজের যৌনাঙ্গের হেফাজত করে, মানে অবৈধ ব্যবহার থেকে নিজের যৌনাঙ্গকে বাঁচিয়ে রাখে।
- তারা যেন (মাহরাম ব্যতীত অন্য) পুরুষদের কাছে নিজেদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে।

সুতরাং যৌনাঙ্গের হেফাজত তথা অবৈধ যৌন সঙ্গম থেকে বিরত থাকা পুরুষ ও নারী সকলের উপরই ফরজ। আর নারীদের জন্য বিশেষ ফরজ হচ্ছে অনুমোদিত মাহরাম পুরুষ ছাড়া অন্য পুরুষের সামনে নিজের সৌন্দর্য প্রকাশ না করা। এ দুটি বিষয়ে আয়াতের বাণী সুস্পষ্ট। তাই এ ব্যাপারে দ্বিমতের কোনো সুযোগ নেই। ফলে কোনো দ্বিমত সৃষ্টি হয়নি।

তবে এরপর বলা হয়েছে **"যতটুকু সাধারণত প্রকাশ হয়ে যায়"** (ইল্লা মা যাহারা মিনহা) মানে নারী সৌন্দর্যের যতটুকু সাধারণত প্রকাশ হয়ে যায় ততোটুকু প্রকাশের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। তবে কোন কোন অঙ্গ বা কতটুকু প্রকাশ করা যাবে; কথাটি স্পষ্ট করে বলা হয়নি। তাই এখানে দ্বিমতের অবকাশ তৈরি হয়েছে এবং দ্বিমত সৃষ্টি হয়েছে। এবার আসুন এ সম্পর্কে একটু বিস্তারিত জেনে নেই।

"যতটুকু সাধারণত প্রকাশ হয়ে যায়" (ইল্লা মা যাহারা মিনহা) এর মর্ম বুঝাতে তাফসীর জালালাইনে লিখা হয়েছেঃ মুখমন্ডল ও কব্জি পর্যন্ত হাত। (অর্থাৎ সাধারণ ভাবে নারীর মুখমণ্ডল ও কব্জি পর্যন্ত হাত পরপুরুষের সামনে উন্মুক্ত থাকতে পারবে।)

বিষয়টি উল্লেখ করে ইমাম কুরতুবী লিখেছেন এ বিষয়ে কয়েকটি মতামত পাওয়া যায়। যেমন..

১. ইবন মাসউদ রা. বলেছেঃ সাধারন সৌন্দর্য মানে পোশাকের সৌন্দর্য।

২. আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর রাঃ বলেছেনঃ মুখমণ্ডল।

৩. আ'ত্বা ও আওযায়ী বলেছেনঃ মুখমণ্ডল, হাত ও পোশাক।

৪. ইবন আব্বাস রাঃ, ক্বাতাদাহ গং বলেছেনঃ মেকআপ, হাতের বালা, মধ্যহাত পর্যন্ত লাগানো মেহদী, কানের দুল, আল-ফাতাখ (মেয়েদের হাতে বা পায়ে লাগানো অলংকার) এবং এ জাতীয় অলংকারাদী। এসব (অলংকার পরিহিত অবস্থায়) আগত পুরুষকে দেখানো বৈধ।

এতোটুকু বর্ণনা করার পর ইমাম কুরতুবী একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন। আ'ইশাহ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেনঃ যে নারী আল্লাহ ও আখেরাতে ইমান রাখে সে যেন বালিগাহ হয়ে যাবার পর তার মুখমণ্ডল এবং হাতের এতোটুকু (মধ্যহাত ধরে দেখিয়েছেন) ব্যতীত অন্য সৌন্দর্য্য প্রকাশ না করে।

তারপর ইমাম ক্বুরতুবী বলেছেনঃ এটাই হাসান বসরীর মত। তিনি বলেছেনঃ মুখমণ্ডল ও কব্জি পর্যন্ত হাত খুলে রাখা মানুষের সাধারণ অভ্যাস এবং সালাত ও হাজ্জের মত ইবাদাতেও এতোটুকু খুলে রাখার বিধান রয়েছে। তাই আয়াতের এ অর্থ বুঝাই উত্তম।

আবু-দাউদে বর্ণিত এক হাদীছে আ'ইশা রা. বলেনঃ একদা (আমার বোন) আসমা বিনত আবু-বাকর আমার কাছে এলেন। তার পড়নে দাসীদের মত (সর্ট) কাপড় ছিল। রাসূল সা. এটা অপছন্দ করলেন এবং বললেনঃ আসমা! মেয়েদের ঋতুস্রাব (বালিগাহ) হয়ে গেলে তার এতোটুকু ছাড়া অন্য অঙ্গ খোলা রাখা উচিত নয়। একথা বলে তিনি মুখমণ্ডল ও কব্জি পর্যন্ত হাতের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। ইমাম কুরতুবী বলেছেনঃ সাবধানতার জন্য এটাই সবচেয়ে উত্তম ব্যবস্থা।

বর্ণিত আছে একদা উম্মু মাকতুমের ছেলে অন্ধ সাহাবী রাসূল সাঃর কাছে এলেন, সেখানে রাসূল সাঃ'র দুজন স্ত্রী উম্মু সালামাহ ও মাইমূনাহ উপস্থিত ছিলেন। রাসূল সা. উনাদেরকে হিজাব করতে বললেন। উনারা উত্তর দিলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেতো অন্ধ। রাসূল সা. বললেনঃ তোমরা তো অন্ধ নও, তোমরা তো দেখতে পাও।

(হাদীছটি বর্ণনা করার পর ইমাম ক্বুরতুবী বলেছেনঃ (অধিকাংশ) মুহাদ্দিছগণের মতে হাদীছটি সাহীহ নয়। (তবে কারো কারো মতে সাহীহ।)

সূত্রঃ উল্লেখিত মতামতসমূহ তাফসীর কুরতুবী থেকে আনা হয়েছে এবং তাফসীত তাবারীতেও অনুরূপ ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

ফিক্বহ বিশ্লেষনঃ

১. (ইমাম আবু-হানীফাহ রাহি.'র বিশিষ্ট শিষ্য) মুহাম্মাদ বিন হাসান আল-শাইবানী রাহি. তদীয় কিতাব "আল-আসল" এ উল্লেখ করেছেন..

يقول محمد بن الحسن الشيباني في كتاب الأصل (٢ /٢٣٥-٢٣٦) أما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ، ولا حرمة ، ممن يحل له نكاحها : فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا ؛ إلا الوجه والكف ، ولا بأس أن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ، ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها. وهذا قول أبي حنيفة.

وقال الله تبارك وتعالى وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ففسر المفسرون أن ما ظهر منها : الكحل والخاتم والكحل زينة

الوجه والخاتم زينة الكف فرخص في هاتين الزينتين . ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها . فإن كان ذلك فليس ينبغي له أن ينظر إليه

"স্বাধীন নারী তার স্বামী ও মাহরাম পুরুষ ব্যতীত অন্য পুরুষের সামনে মুখমণ্ডল আর হাত ছাড়া অন্য অঙ্গ খোলা রাখবে না আর পুরুষরাও স্বাধীন নারীর মুখ ও হাত ছাড়া অন্য অঙ্গের দিকে (ওই অঙ্গ খোলা অবস্থায়) দৃষ্টি দেবে না তবে মুখ ও হাতের দিকে দৃষ্টি দিতে সমস্যা নেই। এটাই আবু-হানীফাহর মাযহাব।

কারণ আল্লাহ্ তায়া'লা বলেছেন মুঅমিনাহ নারীদের বলে দাওঃ তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং নিজ নিজ যৌনাঙ্গের হেফাজত করে। আর তারা যেন তাদের সৌন্দর্য্য প্রকাশ না করে তবে যতটুকু (সাধারণত) প্রকাশ হয়ে যায়..। এখানে "যতটুকু সাধারণত প্রকাশ হয়ে যায়" এর বিশ্লেষণে মুফাসসীর ইমামগণ বলেছেনঃ কুহুল (মেকআপ) আর আংটি। মেকআপ মুখের সুন্দর্য আর আংটি হাতের সুন্দর্য। তাই এ দুই অঙ্গ খুলে রাখা অনুমোদিত এবং মুখ ও হাতের দিকে দৃষ্টিপাতে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু দৃষ্টিপাতে যদি ওই নারীর প্রতি কামভাব এসে যায় তবে তাকানো উচিত নয়। (আল-আসলঃ ২/২৩৫ ও ২৩৬)

উল্লেখ্য ইমাম আবু-হানীফাহ রাহি.'র নিজের লেখা তেমন কোনো কিতাব নেই। উনার মাযহাবের মূল কিতাবসমূহের অধিকাংশই উনার শিষ্য মুহাম্মাদ বিন হাসান আল-শাইবানীর লিখা।

২. ইমাম মালিক রাহি.'র মাযহাব সম্পর্কে উনার শিষ্যদের বক্তব্য হচ্ছে..

حيث هناك نصوص ظاهرة عن الإمام مالك منقولة عنه في المدونة والعتبية على أن الوجه والكفين ليسا بعورة ، لكن يمكن أن يكابر فيها هؤلاء المعاندون بغرور ، وقد فهمها علماء المالكية على وجهها ، أنها تدل على جواز كشف الوجه والكفين . وهو مذهب مالك الذي ينقله عنه أتباع مذهبه المتقدمون منهم والمتأخرون في مدرستيهم المشرقية والمغربية : كإسماعيل القاضي و ابن أبي زيد القيرواني و القاضي عبد الوهاب البغدادي و ابن عبد البر و ابن رشد الجد والحفيد و المازري و القاضي عياض وغيرهم

অর্থাৎ ইমাম মালিক রাহি.র প্রথম সারির ও পরবর্তী সময়ের শিষ্যদের মাঝে কাজী ইসমাইল, ইবনু আবী-যাইদ, কাজী আব্দুল ওয়াহহাব, ইবনু আব্দু-ল-বিরর, ইবনু রুশদ, আল-মাযুরী, কাজী ইয়াদ্বসহ আরো অনেকেই ইমাম মালিক থেকে বর্ণনা করেছেন, ইমাম মালিকের মাযহাব হলঃ মুখ আর হাত সতর নয়, মুখ আর হাত খোলা রাখা বৈধ।

সূত্রঃ কথাগুলো বর্ণিত হয়েছে মালিকী মাযহাবের দুটি প্রসিদ্ধ কিতাব "আল-মুদাউওয়ানাহ এবং আল-আ'তাবিয়্যাতে।

৩. ইমাম শাফিয়ী রাহিঃ তদীয় কিতাব "আল-উম্ম" এ লিখেছেন..

قال الشافعي في الأم : (1/ 109) وعورة الرجل ما دون سرته إلى ركبتيه ، ليس سرته ولا ركبتاه من عورته وعلى المرأة أن تغطي في الصلاة كل بدنها ما عدا كفها ووجهها . «وقال أيضا» : (1/109) وعورة الرجل ما وصفت ، وكل المرأة عورة ؛ إلا كفيها ووجهها ، وظهر قدميها عورة .
ونقل المزني عن الشافعي أنه فسر الآية { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا } ، بأنها الوجه والكفان

অর্থাৎঃ পুরুষের সতর হল নাভির নীচ থেকে হাটু পর্যন্ত। নাভী আর হাটু সতরের অন্তর্গত নয়। আর নারী তার হাত আর মুখ ছাড়া সমস্ত শরীর ঢেকে রাখবে। (আল-উম্মঃ ১/১০৯)

ইমাম শাফিয়ী' আরো লিখেছেনঃ পুরুষের সতর হল যা আমি বলেছি আর নারীর সমস্ত দেহটাই সতর, শুধু কব্জি পর্যন্ত হাত, মুখমণ্ডল আর পায়ের পাতার উপরের অংশ ছাড়া। (আল-উম্মঃ ১/১০৯)

ইমাম মুযানী ইমাম শাফিয়ী' থেকে বর্ণনা করেছেন উক্ত আয়াতে "যতটুকু সাধারণত প্রকাশ হয়ে যায়" এ বাক্যের তাফসীরে ইমাম শাফিয়ী বলেছেনঃ মুখমণ্ডল আর হাত।

সূত্রঃ ফিক্বহ বিশ্লেষণের মতামতগুলো আনা হয়েছে ডঃ শরীফ হাতিম বিন আরিফ আল-আউনী হাফিঃর ব্যক্তিগত ওয়েবসাইট থেকে।

৪. হাম্বলী মাযহাব সম্পর্কে ইসলাম ওয়েব (ফতোয়া নঃ ৫০৭৯৪) এ লিখা হয়েছে.. (ইমাম) ইবনু কুদামাহ বলেছেনঃ নারীদেহ পুরুটাই সতর।

পর্যালোচনাঃ এই হল সাহাবী, তাবিয়ী' এবং মুজতাহিদ ইমামগণের মতামতের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। কিন্তু যত দিন যেতে থাকে এ বিষয়ে আলিমগণ অধিক হারে কঠিন মতের দিকে ঝুঁকে পড়েন। তাই পরবর্তী আলিমগণের অনেকেই মুখ এবং হাত না খোলার পক্ষে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করেছেন। এর কারণ হিসেবে উনারা বলেছেনঃ দিনে দিনে নারী ঘটিত ফিতনাহ বেড়েই চলছে। তাই..

হানফী মাযহাবের ৩য় সারির ফাক্বীহ শামসুল আইম্মা 'সারাখসি' এ বিষয়ে লিখেন.. মুখমন্ডল ও হাতের তালুর দিকে দৃষ্টিপাতের বৈধতা কেবল তখন, যখন কামভাব সহকারে দৃষ্টিপাত না হয়। পক্ষান্তরে যদি সে জানে যে, দেখলে কুধারনা সৃষ্টি হতে পারে, তবে তার জন্য নারীর কোনো অঙ্গের দিকেই দৃষ্টিপাত করা জায়েয নয়। (আল-মাবসূত)

আল্লামা শামী 'রুদ্দুল মুহতার' গ্রন্থে লিখেন.. যদি কামভাবের আশঙ্কা অথবা সন্দেহ হয়, তবে নারীর মুখ মন্ডলের দিকে দৃষ্টিপাত করা নিষিদ্ধ হবে। কেননা কামভাব না হওয়ার শর্তে দৃষ্টিপাত করা বৈধ হয়েছে। তাই শর্তটি অনুপস্থিত হলে দৃষ্টিপাত বৈধ হবে না। এ বিধানটি পূর্ববর্তীদের সময়কালেও ছিল।

আল্লামাহ ইবনু নুজাইম ফতোয়া ক্বাদীখানে লিখেছেনঃ মহিলারা প্রয়োজন ছাড়া পরপুরুষের সামনে মুখ খুলবে না।

মালিকীদের মাঝে কাদ্বী ইবনু-ল-আরাবী "আহকামু-ল-কুরআন" গ্রন্থে লিখেছেনঃ নারীদেহ পুরাটাই সতর...।

শফিয়ীদের মাঝে ইমাম বাইদ্বাওয়ী তদীয় গ্রন্থে লিখেছেন.. নারীদেহ পুরাটাই সতর...

ইমাম নবওয়ী "আল-মিনহাজ" নামক কিতাবে লিখেছেনঃ নারীরা পরপুরুষের সামনে মুখ খুলবে না..।

পরিশেষে এবিষয়ে হানাফী মাযহাবের কিছু বিধান উল্লেখ করে আলোচনার ইতি টানতে চাই..

হানাফী মাযহাবের একটি প্রসিদ্ধ "মাতান" গ্রন্থ "মুখতাস্বার আল-কুদুরী" (মাযহাব বর্ণনার মূল কিতাবকে মাতান বলা হয়।) হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ কিতাব "আল-হিদায়াহ" হচ্ছে মুখতাস্বার আল-কুদুরীর ব্যাখ্যা গ্রন্থ। হানাফী মাযহাবের রীতিনীতি মতে মাতান গ্রন্থের গুরুত্ব ব্যাখ্যা গ্রন্থের চেয়ে বেশী আর ব্যাখ্যা গ্রন্থের গুরুত্ব ফতোয়ার কিতাবের চেয়ে বেশী। নিম্নে মুখতাস্বার আল-কুদুরী থেকে এ বিষয়ের কিছু বিধান উল্লেখ করা হল..

আইন ও বিধানঃ পুরুষের জন্য আজনবী (যাদেরকে বিয়ে করা স্থায়ী ভাবে হারাম নয়) নারীর মুখমণ্ডল ও কব্জা পর্যন্ত হাত দেখা বৈধ। তবে কামভাব এসে গেলে বিনা প্রয়োজনে মুখ দেখবে না।

- পুরুষ বিচারক কোনো নারীর বিচার করলে তার মুখমণ্ডল দেখতে পারবে যদিও কামভাব এসে যায়।
- পুরুষ সাক্ষী কোনো নারীর ব্যাপারে সাক্ষ্য দিলে তার মুখমণ্ডল দেখতে পারবে যদিও কামভাব এসে যায়।
- পুরুষ চিকিৎসক নারীর শরীরের রুগ্ন অংশ দেখতে (এবং স্পর্শ করতে) পারবে
- এক পুরুষ অন্য পুরুষের নাভি থেকে হাটু পর্যন্ত দেখবে না, বাকি অংশ দেখতে পারবে।

- মহিলারা পুরুষের এতোটুকু দেখতে পারবে যতটুকু অন্য পুরুষ দেখতে পারে।
- এক নারী অন্য নারীর নাভী থেকে হাটু পর্যন্ত দেখবে না। বাকি অঙ্গ দেখতে পারবে।
- পুরুষ তার স্ত্রীর বা দাসীর সব দেখতে পারবে, এমনকি গোপনাঙ্গও দেখতে পারবে।
- মাহরাম পুরুষ তার মাহারিম (যাদের বিয়ে করা চিরতরে হারাম) নারীর মুখমণ্ডল, মাথা, বুক (স্তনের উপরের অংশ) হাটুর নীচ ও বাহু দেখতে পারবে। তবে পিট, পেট, উরু দেখবে না।
- পুরুষের জন্য নারীর যে অঙ্গ দেখা বৈধ এটা স্পর্শ করাও বৈধ। (দেখুনঃ মুখতাস্বার আল-কুদুরী বৈধ অবৈধ অধ্যায়)
- আর মাহরাম পুরুষগণ নারীর মাথা, চুল, হাত, গলা, বুক (স্তনের উপরের অংশ) হাটু পর্যন্ত পা, ইত্যাদি দেখতে পারবে।

পর্যালোচনাঃ

- আল্লাহর কিতাবে সুস্পষ্ট ভাবে হিজাবের কথা বলা হয়েছে তাই হিজাব করা ফরজ। হিজাব না করলে মহাপাপ হবে এবং ওই নারী ফাসিক হয়ে যাবে আর হিজাবের বিধানকে অমান্য বা অবজ্ঞা করা কুফর। কোনো মুসলিম এমন করলে সে মুনাফিক হয়ে যাবে।
- মুখ মণ্ডল এবং হাত ঢেকে রাখার কথা বা খুলে রাখার কথা কোনোটাই আল-কুরআনে স্পষ্ট করে বলা হয়নি এবং ঢেকে রাখার ব্যাপারে মুতাওয়াতির মানের কোনো হাদীছও নেই তাই এটা ফরজ হবে না এবং এজন্য কাউকে বাধ্য করা বা সাজা দেওয়া যাবে না। তবে এ ব্যাপারে অনেক হাদীছে ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাই ঢেকে রাখাকে উত্তম বলা যাবে।
- আল-কুরআনের বিশ্লেষণে যেসব হাদীছ বর্ণিত হয়েছে এসবের অনেকটিতেই মুখ মণ্ডল ও হাত খুলে রাখার অনুমতি দেওয়া হয়েছে তাই বিষয়টিকে মন্দকাজ হিসেবে উপস্থাপনের অবকাশ নেই।
- অধিকাংশ সাহাবী, তাবিয়ী' ও ইমামগণের ভাষ্যমতে মুখমণ্ডল ও কব্জি পর্যন্ত হাত খুলে রাখা অনুমদিত। তাই বিষয়টি নিয়ে অতি বাড়াবাড়ি করা উচিত নয়।
- কিন্তু পরবর্তীতে ফিতনাহ ফাসাদ বেড়ে যাবার কারণে আলীমগণ এ বিষয়ে কঠিন থেকে কঠিন হয়ে পড়েছেন এবং কঠোর মতামত দিয়েছেন। আসলে এসবই সময়ের কারণে উলামা সমাজের পরামর্শ। তাই এগুলো মেনে চলা উত্তম হবে তবে ফরজ হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনাঃ নারী পুরুষের কথা বলা ও সামাজিক সংমিশ্রন

প্রারম্ভিক কথাঃ উপরের ৩ পাঠে আমরা যৌনাঙ্গের হেফাজত, সতর ঢেকে রাখা এবং হিজাব নিয়ে আলোচনা করেছি। এরই প্রাসঙ্গিক আলোচনা হিসেবে নারী পুরুষের কথা বলা ও সামাজিক সংমিশ্রন বিষয়টি এসেছে। আসলে নারী ও পুরুষের পরস্পরে কথা বলা ও সামাজিক সংমিশ্রনের বিষয়টি খুবই স্পর্শ কাতর। তাই এ বিষয়ে কুরআন ও হাদীছ থকে সঠিক সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করা হল। যাতে করে মানুষ সঠিক বিষয়টি জানতে পারে এবং সে অনুযায়ী চলতে পারে।

একটি ভুল সংশোধনঃ অনেকে মনে করেন নারী কন্ঠও সতর। এ ব্যাপারে উনারা ("স্বাওতু-ল-মারআতি আ'ওরাতুন" মানে নারী কন্ঠও সতর বা গোপনীয় বিষয়) আরবী বাক্যটিকে এমনভাবে উপস্থাপন করেন; যেন মানুষ মনে করে এটি একটি হাদীছ বা বিধান। অথচ আসলে এটি কোনো হাদীছও নয়, কোনো বিধানও নয় বরং এটি একটি বানানো ও সাজানো কথা। এ ব্যাপারে কুরআন ও হাদীছের বানী এবং ইসলামী বিধান একদম সুস্পষ্ট। যেমন..

১. নারী পুরুষের কথা বলাঃ হিজাব দুই ভাবে করা যায়ঃ নিজেকে দেয়ালের আড়ালে রেখে অথবা কাপড় দিয়ে শরীর ঢেকে রেখে। নারী পুরুষের সাধারন এবং স্বাভাবিক কথা বলা হিজাব পরিপন্থি নয়, হিজাব ঠিক রেখে নারী ও পুরুষ একে অন্যের সাথে কথা বলতে পারবে। মহান আল্লাহ তায়া'লা আল-কুরআনে এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট বিধান দিয়ে একাধিক আয়াত নাযিল করেছেন। নিম্নে কুরআন ও হাদীছ থেকে কথা বলার কিছু কারন, ধরন ও বিধান পেশ করা হল। যেমন..

প্রয়োজনীয় কথাঃ সামাজিক, পারিবারিক বা অন্যকোনো প্রয়োজনে পুরুষরা নারীদের সাথে এবং নারীরা পুরুষের সাথে কথা বলতে পারবে। ইরশাদ হচ্ছে..

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ

(হে মুঅমিনগণ!) তোমরা (নবী পরিবারের) নারীদের কাছে কিছু চাইলে বা তাদেরকে কিছু জিজ্ঞেস করলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে বা জিজ্ঞেস করবে। তোমাদের ও তাদের অন্তরের (পরিচ্ছন্নতার) জন্য এটাই পবিত্রতম (পন্থা, ৩৩আহযাবঃ ৫৩)

সাধারণ কথাঃ হিজাব বজায় রেখে নারীরা সাধারন ভাবেই পুরুষের সাথে কথা বলতে পারবে। এ ব্যাপারে নাযিল হয়েছে..

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا (32)

হে নবীর স্ত্রীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মত নও, তোমরা মুত্তাক্বী হলে (পরপুরুষের সাথে) আকর্ষনীয় (ভঙ্গিতে) কথা বলবে না, কারণ রুগ্ন মনের ব্যক্তিরা এতে প্রভাবিত হয়ে পড়ে, বরং তোমরা (অন্য পুরুষের সাথে) মা'রুফ (সাধারণ ভাবে/সামাজিক রীতি মেনে) কথা বলবে। (৩৩ আহযাবঃ ৩২)

আইন ও বিধানঃ পরপুরুষের সাথে কথা বলা হারাম নয়। তবে পরপুরুষের মন জয় করার জন্য ইনিয়ে বিনিয়ে ইশারা ইঙ্গিতে আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে।

কোনো প্রস্তাব করতে গিয়ে কথা বলাঃ মানব সমাজ নারী ও পুরুষের মিশ্রিত সমাজ। এ সমাজে পুরুষ ও নারীর একে অন্যের প্রতি অনেক দায়িত্ব থাকে এবং কথাও বলতে হয়, যেমনঃ কোনো বিষয়ে প্রস্তাব, অভিযোগ বা রিপোর্ট করা, ইত্যাদি। রাসূল সা.র সময়ে সাহাবী নারীগন রাসূল সা.র সাথে এবং অন্য পুরুষদের সাথে কথা বলেছেন। যেমন..

عن جابر أن امرأة قالت: يا رسول الله، ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه، فإن لي غلاما نجارا؟ قال " :إن شئت " فعملت المنبر

জাবির রা. থেকে বর্নিত, একদা এক মহিলা এসে বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার এক কাঠমিস্ত্রি গোলাম আছে, আমি তাকে দিয়ে আপনার বসার জন্য কোনো কিছু বানিয়ে দেই? নবী সা. বললেনঃ "তুমি চাইলে একটি মিম্বর বানিয়ে দিতে পার"। (বুখারীঃ ৪৩৬, বাংলা ইফাবা)

জ্ঞান অর্জন ও শিক্ষা বিষয়ক কথাঃ রাসূল সা.র সময়ে ৫ ওয়াক্ত সালাত, জুমুয়া'হ সালাত, ঈদ সালাতসহ সকল সালাতে এবং শিক্ষা মূলক সকল হালাকায়/প্রগ্রামে পুরুষের সঙ্গে নারীরাও অংশ গ্রহন করতেন এবং তখনকার সময়ে পুরুষ ও নারীরদের মাঝে কোনো প্রকার দেয়াল বা পার্টিশন দেওয়া হত না, পুরুষ ও নারী সবাই একই কক্ষে বসে শিক্ষা গ্রহন ও সালাত আদায় করতেন। তখন নারীদের গায়ের কাপড়কেই হিজাব হিসেবে যথেষ্ট মনে করা হত। এ ব্যাপারে অনেক সাহীহ হাদীছ বিদ্যমান আছে। এসব হাদীছ থেকে মাত্র দুয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হল..

وفي الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أشهد على رسول الله ﷺ لصلى قبل الخطبة قال: ثم خطب، فرأى أنه لم يسمع النساء، فأتاهن، فذكرهن، ووعظهن، وأمرهن بالصدقة، وبلال قائل بثوبه، فجعلت المرأة تلقي الخاتم، والخرص، والشيء

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রা. বলেনঃ "আমি এই মর্মে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রাসূল সা. (ঈদের দিনে) খুৎবাহর আগে সালাত আদায় করতেন তারপর খুৎবাহ দিতেন। একদা তিনি লক্ষ্য করলেনঃ মহিলারা খুৎবাহ শোনতে পারছে না। (কারণ রাসূল সা.-র সময়ে পুরুষ, নারী, শিশু, সবাই ঈদ সালাতে অংশ গ্রহন করতেন এবং কোনো প্রকার পার্টিশন ছাড়াই উন্মুক্ত ময়দানে একত্রে ঈদ সালাত আদায় করতেন। প্রথমে থাকত পুরুষদের জায়গা, তারপর বালকদের, তারপর মহিলাদের। আর তখন সারা মদীনাহ ও আশপাশ মিলে একটাই ঈদ জামায়া'ত হত এবং এতে অনেক লোক সমাগম হত, তাই দূরে থাকার কারণে মহিলাগণ খুৎবাহ শোনতে পারেননি। খুতবাহ সমাপ্ত করার) পরে রাসূল সা. মহিলাদের কাছে এলেন, উনাদের সামনে আলোচনা করলেন, উনাদের উপদেশ দিলেন (এতে প্রতিয়মান হয় খুৎবাহ বুঝা এবং বুঝিয়ে দেওয়া কত গুরুত্বপূর্ণ) আর সাদাক্বাহ করার কথা বললেন। বিলাল তখন একটি কাপড় নিয়ে রাসূল সা.র কাছে দাড়িয়ে ছিলেন। মহিলারা তখন উনাদের আংটি, অলংকারাদি ও অন্যান্য বস্তু (সাদাকাহ হিসেবে বিলালের) এ কাপড়ে নিক্ষেপ করছিলেন। (বুখারীঃ ৯৬৪, মুসলিমঃ ৮৮৪)

পুরুষ ও নারীর সহশিক্ষাঃ রাসূল সা.র সময়ে শিক্ষা মূলক সকল হালাকায় পুরুষের সঙ্গে নারীরাও অংশ গ্রহন করতেন এবং তখন পুরুষ ও নারীদের মাঝে কোনো প্রকার দেয়াল বা পার্টিশন দেওয়া হত না, পুরুষ ও নারী সবাই একই কক্ষে বসে শিক্ষা গ্রহন করতেন এবং নারীদের গায়ের কাপড়কেই হিজাব হিসেবে যথেষ্ট মনে করা হত। হাদীছে বর্নিত হয়েছে..

عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت : سَمِعْتُ نِدَاءَ الْمُنَادِي مُنَادِى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُنَادِي (الصَّلاَةَ جَامِعَةً). فَخَرَجْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَصَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَكُنْتُ فِى صَفِّ النِّسَاءِ الَّتِى تَلِى ظُهُورَ الْقَوْمِ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلاَتَهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَضْحَكُ فَقَالَ لِيَلْزَمْ كُلُّ إِنْسَانٍ مُصَلاَّهُ . ثُمَّ قَالَ أَتَدْرُونَ لِمَ جَمَعْتُكُمْ ؟

ফাতিমাহ বিনত ক্বাইস রা. বলেনঃ আমি একদা রাসুলের বিশেষ ঘোষকের ঘোষনা শুনতে পেলাম। "আস-সালাতু জামিয়া'হ" (মানে সালাতে সমবেত হতে হবে। তখনকার দিনে বিশেষ প্রয়োজনে এমন ঘোষনা দেওয়া হত। এমন ঘোষনা শোনে অন্যান্যদের সাথে) আমিও মসজিদে চলে এলাম এবং রাসূল সা.র সাথে সালাত আদায় করলাম। আমি নারীদের কাতারে ছিলাম যা পুরুষদের পিছনে ছিল। সালাত সমাপ্ত করে রাসূল সা. মিম্বরে উঠে বসলেন, তার মুখে হাসি লেগে ছিল। তিনি বললেনঃ সবাই নিজ নিজ জায়গায় বসে থাকো। অতঃপর বললেনঃ তোমরা কি জানো কেনো তোমাদেরকে জমা করেছি?... (মুসলিমঃ ২৯৪২, হাদীছটি অনেক দীর্ঘ এবং এখানে দাজ্জালের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এটি তামীম আল-দারীর হাদীছ নামেও খ্যাত।)

নারীদের জন্য আলাদা শিক্ষাঃ রাসূল সা. নারীদের জন্য আলাদা ক্লাস বা হালাকার ব্যবস্থাও করেছেন। তাই নারীদের জন্য আলাদা শিক্ষার ব্যবস্থা করাও ভালো কাজ। যেমন বর্নিত হয়েছে..

روى البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله، فقال: اجتمعن في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا، فاجتمعن فأتاهنَّ رسول الله ﷺ فعلمهن مما علمه الله. ثم قال: ما منكنَّ امرأة تقدم بين يديها من ولَدها ثلاثة إلا كان لها حجاباً من النار. فقالت امرأة منهن: يا رسول الله، اثنين؟ قال: فأعادتها مرتين، ثم قال: واثنين، واثنين، واثنين

আবু-সাঈদ আল-খুদরী রা. থেকে বর্নিত, একদা রাসূল সা.র কাছে এক মহিলা এসে বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! পুরুষরা আপনার কাছ থেকে অনেক কিছু শিখছে (আর আমরা পিছনে রয়ে যাচ্ছি) আপনি আমাদের নারীদের জন্য একটি দিন নির্ধারণ করে দিন, আমরা আপনার কাছে আসব এবং আল্লাহ আপনাকে যে জ্ঞান দান করেছেন আমরা এ থেকে যতটুকু পারি অর্জন করব। (ওই নারীর কথা শোনে) রাসূল সা. বললেনঃ "তোমরা অমুক দিন অমুক জায়গায় জমা হবে"। নারীরা জমা হত এবং রাসূল সা. এসে উনাদেরকে বিদ্যা শিক্ষা দিতেন, যা আল্লাহ উনাকে শিখিয়েছেন। একদা তিনি বললেনঃ "তোমাদের যেসন নারী তাদের ৩ জন সন্তানকে আগে পাঠিয়ে দিয়েছে (মানে যে নারী ৩ সন্তানের মৃত্যুতেও সবর করেছে) তার জন্য এটা জাহান্নামের অন্তরায় হয়ে যাবে"। এক নারী বলে উঠলঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! দুইজন? মহিলাটি ২ বার প্রশ্নটি করল। রাসূল সা. বললেনঃ দুইজন, দুইজন, দুইজন। (বুখারী)

ব্যক্তিগত কথা বলাঃ মাঝে মাঝে নারীরা ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ করেও রাসূল সা.র সাথে কথা বলেছেন, জ্ঞান অর্জন করেছেন এবং পরামর্শ নিয়েছেন। যেমন বর্নিত হচ্ছে..

عن عائشة رضي الله عنها قالت: أن امرأة سألت النبي ﷺ عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل قال: «خذي فرصة من مسك فتطهَّري بها». قالت: كيف أتطهر؟ قال: «تطهَّري بها» قالت: كيف؟ قال: «سبحان الله، تطهَّري». فاجتبذتها إلي فقلت: تتبعي بها أثر الدم

আ'ইশাহ রা. বলেনঃ একদা এক মহিলা স্রাব পরবর্তি গোসল সম্পর্কে রাসূল সা.কে জিজ্ঞেস করল। তিনি তাকে গোসলের পদ্ধতি শিখিয়ে দিলেন। তারপর বললেনঃ "সুগন্ধীর টুকরা নিয়ে ভালোভাবে পরিচ্ছন্ন করে নেবে"। মহিলা (বিষয়টি বুঝতে পারল না। তাই) বললঃ এটা দিয়ে কীভাবে পরিচ্ছন্ন হব? রাসূল সা. বললেনঃ এটা দিয়ে পরিচ্ছন্ন করে নেবে। মহিলাটি আবার বললঃ কীভাবে? রাসূল সা. বললেনঃ সুবহান আল্লাহ! এটা দিয়ে পরিচ্ছন্ন করে নেবে"। আমি (আ'ইশাহ) তখন মহিলাকে আমার কাছে নিয়ে এলাম এবং বললামঃ শরীরে যেসব স্থানে স্রাবের রক্ত গেলেছে অখানে সুগন্ধি লাগিয়ে নেবে। (বুখারী ও মুসলিম)

একান্তে কথা বলাঃ মাঝে মাঝে নারীরা রাসূল সা.র সাথে একান্তে কথা বলেছেন, জ্ঞান অর্জন করেছেন এবং উনাদের সমস্যা সমাধানে পরামর্শ নিয়েছেন। যেমন বর্নিত হচ্ছে..

عن أَنَسِ بْنَ مَالِكٍ رض قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَخَلاَ بِهَا فَقَالَ وَاللهِ إِنَّكُنَّ لأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ . رواه البخاري ومسلم.

আনাস বিন মালিক রা. থেকে বর্নিত, তিনি বলেছেনঃ একদা এক আনসারী মহিলা নবী সা.র কাছে এলো, তিনি (পথের এক পাশে) ওই মহিলার সাথে একান্তে (কিছুক্ষন) কথা বললেন অতঃপর বললেনঃ আল্লাহর কসম! তোমরা আমার কাছে অধিক প্রিয়। (বুখারী ও মুসলিম)

২. সামাজিক সংমিশ্রনঃ মানব সমাজ যেহেতু নারী ও পুরুষের মিশ্রিত সমাজ। তাই মসজিদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, চিকিৎসা কেন্দ্র, বাজার, রাস্তা, সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান, ইত্যাদিতে নারী ও পুরুষের সংমিশ্রন ঘটবে এটাই স্বাভাবিক। তবে এক্ষত্রে সবাইকে হিজাব করতে হবে তথা নিজ নিজ সতর ঢেকে রাখতে হবে এবং অবৈধ স্পর্শ থেকে বেচে থাকতে হবে। রাসূল সা.র সময়ে এ সংমিশ্রন সমাজের সাভাবিক বিষয় ছিল। এসব বিষয়ে অনেক হাদীছ বিদ্যমান আছে। যেমন..

সালাতের জন্য সংমিশ্রনঃ রাসূল সা.র সময়ে নারীগণ মসজিদে নিয়মিত সালাতে, জুমুয়াহ সালাতে, ঈদ সালাতে তথা সকল সালাতেই শামিল থাকতেন এবং পুরুষের সঙ্গে একই জামায়াতে একই কক্ষে সালাত আদায় করতেন। এ ব্যাপারে অনেক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। যেমন..

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ ، وَيَمْكُثُ هُوَ فِي مَقَامِهِ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ . قَالَ : نُرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ لِكَيْ يَنْصَرِفَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ أَحَدٌ مِنْ الرِّجَالِ . رواه البخاري (875)

وعنها أيضا أَنَّ النِّسَاءَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كُنَّ إِذَا سَلَّمْنَ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ قُمْنَ وَثَبَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَنْ صَلَّى مِنَ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللَّهُ فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَامَ الرِّجَالُ . رواه البخاري (866)

উম্মু সালামহ রা. বলেনঃ রাসূল সা. সালাম সমাপ্ত করার সঙ্গে সঙ্গেই মহিলারা উঠে চলে যেতেন আর নবী সা. সামান্য সময় বসে তারপর উঠতেন। একজন রাওয়ী বলেছেন আমি মনে করি (আল্লাহ আ'লাম) তিনি এজন্য এমন করতেন যাতে পুরুষরা উঠার আগেই মহিলারা উঠে চলে যেতে পারে। (বুখারীঃ ৮৭৫)

অন্য এক বর্ণনায় উম্মু সালামাহ রা. বলেছেনঃ রাসূল সা.র যামানায় (মাসজিদে ফরজ সালাতে) সালাম ফিরানোর পর মহিলারা উঠে চলে যেতেন আর রাসূল সা. ও পুরুষগণ কিছুক্ষণ বসে থাকতেন (মহিলাদেরকে বেরিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দিতেন) পরে রাসূল সা. যখন উঠে যেতেন তখন অন্য পুরুষগণ ও উঠে চলে যেতেন। (বুখারীঃ ৮৬৬)

রাতের সালাতে নারীঃ রাসূল সা.র সময়ে ইশা ও ফজর সালাতেও নারীরা মসজিদে আসতেন এবং জামায়াতে শরীক হতেন। এ ব্যাপারে অনেক হাদীছ বর্নিত হয়েছে। যেমন..

عن عائشة أم المؤمنين قالت : إن كان رسول الله ﷺ ليصلي الصبح فينصرف النساء متلففات بمروطهن ما يعرفن من الغلس

আ'ইশাহ রা. বলেনঃ রাসূল সা. ফজরের সালাত এতো ভোরে আদায় করতেন যে, সালাত শেষ করে নারীরা চাদর মুড়ি দিয়ে যখন ঘরে ফিরতেন তখন অন্ধকারের কারনে তাদের চিনা যেত না। (বুখারী ও মুসলিম)

নফল সালাতে নারীঃ রাসূল সা.র সময়ে নফল সালাতের জামায়াতেও পুরুষের সঙ্গে নারীরা অংশ গ্রহন করতেন। বর্নিত হয়েছে..

صَلَّيْتُ أَنَا وَيَتِيمٌ فِي بَيْتِنَا خَلْفَ النبيِّ ﷺ وأُمِّي أُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا .الراوي : أنس بن مالك :أخرجه البخاري (727) ومسلم (658)

আনাস বিন মালিক রা. বলেনঃ আমি আর এক এতীম ছেলে আমাদের ঘরে নবী সা.র পিছনে (জামায়াতে নফল) সালাত আদায় করেছি, (আমাদের সঙ্গে আমার মা-ও জামায়াতে শরীক ছিলেন) আমার মা উম্মে সুলাইম ছিলেন আমাদের পিছনে। (বুখারীঃ ৭২৭, মুসলিমঃ ৬৫৮)

وقد روى البخاري (380) ومسلم (658) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ لَهُ فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ قُومُوا فَلِأُصَلِّ لَكُمْ قَالَ أَنَسٌ : فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدْ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَصَفَفْتُ وَالْيَتِيمَ وَرَاءَهُ ، وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا ، فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ.

আনাস বিন মালিক রা. থেকে বর্নিত, একদা আনাসের দাদী রাসূল সা.র জন্য খাবার রান্না করে উনাকে দাওয়াত করলেন। খাবার সমাপ্ত করে রাসূল সা. বললেনঃ আসো! তোমাদেরকে নিয়ে (নফল) সালাত আদায় করি। আনাস রা. বলেনঃ আমাদের একটি অতি পুরাতন চাটাই ছিল, তাতে অনেক দিনের ময়লা জমে ছিল, আমি গিয়ে চাটাইটি পানি দিয়ে ঘোয়ে নিয়ে আসলাম। রাসূল সা. তাতে দাড়ালেন। আমি আর এক ইয়াতীম ছেলে উনার পিছনে দাড়ালাম। আর মহিলারা দাড়িয়ে ছিলেন আমাদের পিছনে। রাসূল সা. আমাদেরকে নিয়ে দু রাকায়াত সালাত আদায় করলেন, তারপর চলে গেলেন। (বুখারীঃ ৩৮০, মুসলিমঃ ৬৫৮)

ফিতনা বা অস্বস্থিকর পরিবেশঃ আমাদের উপমহাদেশের কিছু মানুষ উনাদের মনগড়া ফিতনাহর দোহাই দিয়ে আল্লাহ ও রাসূলের নীতির বাইরে গিয়ে রাসূল সা.র অবাধ্য হয়েও নারীদেরকে মসজিদ ও জামায়াত থেকে বিরত রাখতে উঠে পড়ে লেগেছেন। অথচ রাসূল সা.র সময়েও মাঝে মাঝে অস্বস্থিকর পরিবেশ তৈরী হয়েছে তবুও নারীদেরকে মসজিদ থেকে বা জামায়াত থেকে বিরত রাখা হয়নি। যেমিন বর্নিত হয়েছে..

حديث ابن عباس عند الترمذي وصححه الألباني .قال :كانت امرأة تصلي خلف رسول الله ﷺ حسناء من أحسن الناس فكان بعض القوم يتقدم حتى يكون في الصف الأول لئلا يراها ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر فإذا ركع نظر من تحت إبطيه فأنزل الله تعالى :وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ.

ইবন আব্বাস রা. বলেনঃ রাসূল সা.র সময়ে (মদীনায়) একজন অতি সুন্দরী মেয়ে ছিল, সে রাসূল সা.র পিছনে সালাতের জামায়াতে শরীক হত। (মেয়েটি এতোই সুন্দরী ছিল যে তাকে একবার দেখলে বারবার দেখতে মনে হত) আর এজন্য অনেক সাহাবী সামনের লাইনে চলে যেতেন যাতে সালাতের মাঝে তার দিকে চুখ না যায় আর অনেকে ইচ্ছা করে পিছনের সারিতে দাড়াতেন এবং রুকতে গিয়ে বগলের নীচ

দিয়ে পিছনে তাকিয়ে তাকে দেখতেন। এতে নাযিল হল "আমি জানি তোমাদের কারা আগে চলে যায় আর কারা পিছনে থাকে" (সূরাহ হিজরঃ ২৪) (তিরমিযীঃ শাইখ আল-বানীর তাহকীক মতেও হাদীছটি সাহীহ)

বিঃ দ্রঃ = রাসূল সা. নিজেই পুরুষ ও নারীদের মিশ্র জামায়াত চালু করে ছিলেন। রাসূল সা.র পর খুলাফা রাশিদীন এবং তার পর অন্য খালীফাহগণও এ নিয়ম চালু রেখে ছিলেন, যা আজও আরব সমাজে বিদ্যমান আছে। আর এ নিয়ম চালু রেখেছেন চার মাযহাবের সকল ইমামগনও। এ ব্যাপারে বিশেষ আদেশও জারি করে গেছেন রাসূল সা.। কিন্তু আজকাল আমাদের দেশের কিছু মানুষ রাসূল সা.র আদেশ ও সুন্নাহ, খালীফাহগনের রীতিনীতি, চার মাযহাবের নিয়ম ওরীতি অমান্য করে নিজেদের মনগড়া মতাদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহর বান্দিদেরকে আল্লাহর ঘরে গমন ও জামায়াতে সালাত আদায় থেকে বিরিত রাখছেন।

একটি মিথ্যাচারঃ যারা নারীদেরকে মসজিদে আসতে নিষেধ করেন, উনাদের কেউ কেউ আবার সাহাবাদের উপর মিথ্যাচার করে বলে থাকেনঃ উমর রা. নাকি মসজিদে আসতে নারীদেরকে নিশেধ করেছেন এবং উনার সময়ে এ ব্যাপারে সাহাবাদের ইজমা বা ঐক্যমত্য হয়ে গেছে। অথচ এ ব্যাপারে বর্নিত আছে..

عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: "**كَانَتِ امْرَأَةٌ لِعُمَرَ تَشْهَدُ صَلاَةَ الصُّبْحِ وَالعِشَاءِ فِي الجَمَاعَةِ فِي المَسْجِدِ، فَقِيلَ لَهَا: لِمَ تَخْرُجِينَ وَقَدْ تَعْلَمِينَ أَنَّ عُمَرَ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَيَغَارُ؟ قَالَتْ: وَمَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْهَانِي؟ قَالَ: يَمْنَعُهُ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ :لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ**.رواه البخاري (900).

ইবন উমর রা. বলেনঃ উমর রা.র এক স্ত্রী মসজিদে এসে ফজর এবং ইশার জামায়াতেও শরীক হতেন, (অথচ উনার স্বামী উমর রা. এটি পছন্দ করতেন না) একদা উনাকে বলা হলঃ "আপনি কেন এমন করেন অথচ আপনি জানেন যে, আপনার স্বামী উমর এটি পছন্দ করেন না এবং তাতে উনার আত্ম-সম্মানে বাধে! উমরের স্ত্রী উত্তর দিলেনঃ তা হলে উনি আমাকে নিষেধ করেন না কেন? প্রশ্নকারী বললেনঃ উনি নিষেধ করেন না, রাসূল সা.র নিষেধাজ্ঞার কারনে। রাসূল সা. বলেছেনঃ "তোমরা আল্লাহর বান্দিদেরকে আল্লাহর ঘর মসজিদ থেকে বিরত রেখ না। (বুখারীঃ ৯০০)

এ ব্যাপারে "ইসলাম ওয়েব.নেট" এ ৮-৮-২০০২ এ এক প্রশ্নের জবাবে লিখা হয়েছে..

فلا يحق للرجل أن يمنع امرأته من الخروج إلى المسجد إذا استأذنته في ذلك ولم تكن هناك ريبة ولا خشية فتنة، لقوله ﷺ :لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد إذا استأذنوكم .رواه البخاري ومسلم

নারী যদি মসজিদে যাওয়ার অনুমতি চায় তাহলে তাকে ফিরানোর অধিকার কোনো পুরুষের নেই, যদি ভীতিকর পরিবেশ বা ফিতনার ভয় না হয়। কারনঃ রাসূল সা. বলেছেনঃ নারীরা যদি মসজিদে আসার অনুমিতি চায় তবে তোমরা নারীদেরকে মসজিদে আসা থেকে বিরত রেখো না। (বুখারী ও মুসলিম)

মসজিদে গমন নারীদের অধিকারঃ নারীরা সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই তারা মসজিদে গমনের পূর্ন অধিকার রাখে। যেব্যক্তি তাদেরকে এ অধিকার থেকে বঞ্চিত করবে তাদের বিরুদ্ধে হুশিয়ারী উচ্চারন করেছেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সা.। হাদীছে বর্ণিত হয়েছে..

عن ابن عمر رضي الله عنه عن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ :**إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمْ امْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلا يَمْنَعْهَا**، وفي رواية :**لا تَمْنَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله**، وفي رواية:**ائْذَنُوا لِلنِّسَاءِ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسَاجِدِ**

ইবন উমর রা. থেকে বর্ণিত, নবী সা. বলেছেনঃ নারীরা মসজিদে যাবার জন্য অনুমতি চাইলে তোমরা তাদেরকে মসজিদ থেকে বিরত রেখো না। অন্য বর্ণনা মতে (রাসূল সা. বলেছেনঃ) তোমরা আল্লাহর বান্দীদেরকে আল্লাহর ঘর মসজিদ থেকে বিরত রেখো না। অন্য বর্ণনা মতে (রাসূল সা. বলেছেন) রাতেও নারীদেরকে মসজিদে যাবার অনুমতি দিও। (মুসলিমঃ ৪৪২, বুখারীঃ ৫২৩৮)

৩. উৎসবে সংমিশ্রনঃ রাসূল সা.র সময়ে ঈদসহ ইসলামিক ও সামাজিক নানা উৎসবেও পুরুষের সঙ্গে নারীরাও শামিল হতেন, যেমন বর্ণিত হচ্ছে..

روى البخاري (324) ومسلم (890) **عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ** رضي الله عنها **قَالَتْ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالأَضْحَى الْعَوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلاَةَ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِحْدَانَا لا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ قَالَ لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا.**

উম্মু আ'ত্বিয়্যাহ রা. বলেনঃ রাসূল সা. আমাদেরকে আদেশ দিয়ে ছিলেন; আমাদের বালিকারা, অবিবাহিত যোবতীরা, এমনকি ঋতুস্রাব ওয়ালী নারীরা (তথা সকল মহিলারা) যেন ঈদ আল-ফিতর ও ঈদ আল-আদ্বহা সালাতে অংশ গ্রহন করি। তবে ঋতুস্রাব ওয়ালি নারী যেন সালাতে শরীক না হই, বরং কল্যাণকর কাজ তথা সামাজিক সম্মেলন ও খুতবাহ এবং (২য় খুতবায়) মুসলিমদের সঙ্গে যেন দোয়াতে শরিক হতে পারি। একদা আমি বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের একজনের (হিজাব করার মত) জিলবাব (ওড়না) নেই (সে কি করবে?) রাসূল সা. বললেনঃ (সেও যাবে) অন্য কোনো বোন তার জিলবাবে একে শরিক করে নেবে (মানে এক চাদরে দুই জন মাথা ঢেকে নেবে, তবুও ঈদ সালাতে হাজির হবে) (বুখারীঃ ৩২৪, মুসলিমঃ ৮৯০)

ফিক্বহ বিশ্লেষণঃ হানাফী ফিক্বহসহ সকল ফিক্বহ মতেই নারীরা পুরুষের সঙ্গে একই জামায়াতে সালাত আদায়ের বিধান রয়েছে। কোনো ফিক্বহ মতেই এটা নাজাইজ বা মাকরূহ নয়।

৪. একই আসনে বসাঃ প্রয়োজনীয় হিজাব ম্যন্টেইন করে একই সোফায় /একই খাটে এক পাশে নারী ও এক পাশে পুরুষ বসাতেও পাপ হয় না, যেমনটি হাদীছে বর্নিত হয়েছে..

حديث الرُّبَيِّع بِنْت مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ قالت : جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَدَخَلَ حِينَ بُنِيَ عَلَيَّ فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنِّي فَجَعَلَتْ جُوَيْرِيَاتٌ لَنَا يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِي يَوْمَ بَدْرٍ إِذْ قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ فَقَالَ : (دَعِي هَذِهِ وَقُولِي بِالَّذِي كُنْتِ تَقُولِينَ) رواه البخاري (4750)

রুবাইয়্যি' বিনত মুয়া'ওয়্যিয বিন আ'ফরা রা. বলেনঃ আমার বাসর রাতে নবী সা. আমার কাছে এসেছিলেন এবং আমার বিছানায় এমনভাবে বসেছিলেন যেমন এখন তুমি বসেছ। আমাদের কিশোরী মেয়েরা তখন "দাফ" (এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র) বাজিয়ে বদর যুদ্ধে নিহতদের বীরত্বগাথা সম্বলিত সঙ্গিত পরিবেশন করছিল। এদের একজন হঠাৎ বলে উঠল "আমাদের মাঝে একজন নবী আছেন যিনি আগামীর খবর জানেন"। নবী সা. (তাকে থামিয়ে দিয়ে) বললেনঃ "এসব বাদ দাও, যা বলছিলে তাই বলতে থাকো"। (বুখারীঃ ৪৭৫০)

আরো দুটি হাদীছঃ উল্লেখিত বিষয়টির সাথে সামঞ্জস্য পূর্ন আরো দুটি হাদীছ নিম্নে উল্লেখ করা হল..

روى البخاري (2789) ومسلم (1912) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ فَتُطْعِمُهُ وَكَانَتْ أُمُّ حَرَامٍ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَطْعَمَتْهُ وَجَعَلَتْ تَفْلِي رَأْسَهُ فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ

আনাস বিন মালিক রা. বলেনঃ রাসূল সা. প্রায়ই (আমার খালা) উম্মে হারাম বিনত মিলহান এর কাছে যেতেন। উম্মে হারাম ছিলেন উবাদাহ বিন স্বামিতের স্ত্রী, তিনি নবী সা.কে খাবার খাওয়াতেন। একদা রাসূল সা. তার কাছে গেলেন, তিনি খাবার খাওয়ালেন, তারপর রাসূল সা.র মাথার উকুন দেখতে /চুলে বিলি কাটতে লাগলেন, রাসূল সা. তখন ঘুমিয়ে পড়লেন। একটু পর তিনি হাসতে হাসতে জেগে উঠলেন.. (হাদীছটি অনেক দীর্ঘ তাই উল্লেখ করা হল না।) (বুখারীঃ ২৭৮৯, মুসলিমঃ ১৯১২)

বিঃ দ্রঃ= উম্মে হারাম রাসূল সা.র মাথায় হাত দিয়েছেন, চুলে বিলি কেটেছেন বা উকুন বাছাই করেছেন, একথা সাহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমানিত। বিষয়টির বিশ্লেষন ও কারন ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আলীমগণ ৩ ধরনের মন্তব্য করেছেন।
ব্যাখ্যাঃ ১. অনেকে বলেছেনঃ উম্মে হারামের সাথে নবী সা.র রিজায়ী (দুধের) সম্পর্ক ছিল।
ব্যাখ্যাঃ ২. অনেকে বলেছেনঃ উম্মে হারাম রাসূল সা.র মাহরাম ছিলেন। কেউ কেউ আবার এর উপর ঐক্যমত্য বর্ননা করেছেন।
ব্যাখ্যাঃ ৩. কেউ কেউ বলেছেনঃ এটা হল নবীদের বৈশিষ্ট। (আসল ব্যাপার আল্লাহই ভালো জানেন)

وروى مسلم (2331) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْخُلُ بَيْتَ أُمِّ سُلَيْمٍ فَيَنَامُ عَلَى فِرَاشِهَا وَلَيْسَتْ فِيهِ قَالَ فَجَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ فَنَامَ عَلَى فِرَاشِهَا فَأُتِيَتْ فَقِيلَ لَهَا هَذَا النَّبِيُّ ﷺ نَامَ فِي بَيْتِكِ عَلَى فِرَاشِكِ قَالَ فَجَاءَتْ وَقَدْ عَرِقَ وَاسْتَنْقَعَ عَرَقُهُ عَلَى قِطْعَةِ أَدِيمٍ عَلَى الْفِرَاشِ فَفَتَحَتْ عَتِيدَتَهَا فَجَعَلَتْ تُنَشِّفُ ذَلِكَ الْعَرَقَ فَتَعْصِرُهُ فِي قَوَارِيرِهَا فَفَزِعَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ مَا تَصْنَعِينَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَرْجُو بَرَكَتَهُ لِصِبْيَانِنَا قَالَ أَصَبْتِ.

আনাস বিন মালিক রা. বলেনঃ নবী সা. প্রায়ই (আমার আম্মা) উম্মে সুলাইমের ঘরে আসতেন এবং উনার অনুপস্থিতিতে উনার বিছানায় শোয়ে থাকতেন। একদা তিনি এসে উনার বিছানায় শোয়ে পড়লেন (আমার আম্মা তখন ঘরে ছিলেন না) কেউ একজন উনাকে জানালো "নবী সা. তোমার ঘরে এসে তোমার বিছানায় শোয়ে আছেন"। (এ কথা শোনে) তিনি ছুটে এলেন। নবী সা. ঘামছিলেন এবং চামড়ার বিছানার এক কোনে উনার ঘাম জমে ছিল। উম্মে সুলাইম উনার আতরদানী খুলে তাতে রাসূল সা.র ঘাম জমা করে সংরক্ষন করে রাখলেন, নবী সা. জেগে উঠলেন এবং বললেনঃ উম্মে সুলাইম! এসব কী করছো? তিনি বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আমাদের সন্তানদের জন্য এর বরকত রেখে দিতে চাই। (মুসলিমঃ ২৩৩১)

৫. দৃষ্টিঃ পুরুষ ও নারী যেহেতু একই সমাজে বাস করে তাই ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, ব্যবসায়িক, বিচার, শাসন, ভ্রমন, রাষ্ট্রীয়, ইত্যাদি নানা কারনে পরস্পরে কথা বলার যেমন প্রয়োজন পড়ে, তেমনি দৃষ্টি দেয়ার বা দেখা সাক্ষাৎ করারও প্রয়োজন পড়ে। আবার মাঝে মাঝে দৃষ্টির অপব্যবহার করে একে অন্যকে বিরক্ত, উত্যক্ত এবং অসম্মানও করা হয়। আর এসব বিষয় বিবেচনায় দৃষ্টি সাধারনত ৩ প্রকার হয়ে থাকেঃ সু-দৃষ্টি বা প্রয়োজনীয় দৃষ্টি, কু-দৃষ্টি ও সাভাবিক দৃষ্টি। যেমন..
প্রয়োজনীয় দৃষ্টিঃ চিকিতসা, অফিসিয়াল পরিচিতি, বিবাহের উদ্দেশ্যে বা অন্য প্রয়োজনে দেখা বা দৃষ্টি দেওয়া। এমন দৃষ্টি বা দেখা সম্পূর্ণরূপে বৈধ।
স্বাভাবিক দৃষ্টিঃ রাস্তায়, বাজারে, মসজিদে বা অন্য কোথাও দৃষ্টি পড়ে যাওয়া। এমন দৃষ্টি অবৈধ নয়। তবে হাদীছে এমন পরিস্থিতিতে পুনরায় দৃষ্টি দিতে নিষেধ করা হয়েছে।
কু-দৃষ্টিঃ কামনার সাথে দৃষ্টি দেওয়া, বারবার দেখা, ইত্যাদি। এমন কু-দৃষ্টি ধর্মীয় ও সামাজিক উভয় দৃষ্টিকোন থেকেই নিষিদ্ধ, বিষেষ করে নারীর প্রতি আরো কঠিনভাবে নিষিদ্ধ, কারন দৃষ্টির মাধ্যমেই নারীকে বেশী হেনস্থা ও উত্যক্ত করা হয়।

একই সমাজে বাস করার কারনে কখনো কখনো স্বাভাবিক ভাবেই নারী ও পুরুষ একে অন্যের প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন হয় বা দৃষ্টি পড়ে যায়। তাই নারীর প্রতি পুরুষের এবং পুরুষের প্রতি নারীর প্রয়োজনীয় দৃষ্টি এবং স্বাভাবিক দৃষ্টি নিষিদ্ধ করা হয়নি বরং দৃষ্টিকে সংযন, নিয়ন্ত্রিত ও অবনত রাখতে বলা হয়েছে। এ ব্যাপারে বিধান দিয়ে নাযিল হয়েছে..

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

(হে নবী!) মুঅমিন পুরুষদেরকে বলে দাওঃ তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি সংযত/নিয়ন্ত্রনে রাখে এবং নিজ নিজ যৌনাঙ্গের হেফাজত করে (এর অবৈধ ব্যবহার থেকে বিরত থাকে।) পরিচ্ছন্ন জীবন যাপনের জন্য এটা খুবই উত্তম ব্যবস্থা। (তারা যেন জেনে রাখে) তাদের প্রতিটি পদক্ষেপের ব্যাপারে আল্লাহ অবগত। আর মুঅমিনাহ নারীদেরকে বলে দাওঃ তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং নিজ নিজ যৌনাঙ্গের হেফাজত করে.. (২৪ নূরঃ ৩০-৩১)

অনুচ্ছেদঃ ১৮. তাহারাত বা পবিত্রতা অর্জন করা

প্রয়োজনের সময় শারিরিক ত্বাহারাত বা পবিত্রতা অর্জন আমাদের উপর অর্পিত আরো একটি ফরজ দায়িত্ব। এটা প্রতিটি মুসলিম নর ও নারীর উপর ফরজ হয়। তাহারাত বা পবিত্রতা সর্বকালীন ফরজ নয়। শুধু বিশেষ কিছু ইবাদাত এবং বিশেষ কাজের জন্য বিশেষ ধরণের ত্বাহারাত বা পবিত্রতাকে ফরজ করা হয়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ফিকহী পরিভাষাঃ বিষয়টিকে সুস্পষ্টভাবে বুঝার জন্য গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ফিকহী পরিভাষা জানা আবশ্যক। যথা..
১. তাহারাত ও নাজাসাতঃ পবিত্রতাকে আরবীতে ত্বাহারাত বলা হয় আর অপবিত্রতাকে বলা হয় নাজাসাত।
২. নাজাসাতের প্রকারভেদঃ নাজাসাত দুই প্রকার। আসল নাজাসাত (নাজাসাত হাক্কিকী) ও শুধু বিধিবদ্ধ নাজাসাত (নাজাসাত হুকমী)
৩. নাজাসাত হাক্কিকীঃ যে সব বস্তু আসল নাপাক এটাকে নাজাসাত হাক্কিকী বলে। যেমনঃ মল, মূত্র, রক্ত ইত্যাদি।
৪. নাজাসাত হুকমীঃ আসল নাপাক নয় তবে বিধিবদ্ধ ভাবে নাপাক ধরা হয় এমন নাপাককে বলা হয় নাজাসাত হুকমী তথা বিধিবদ্ধ নাপাক। যেমনঃ অযুহীন ব্যক্তি, জুনুবী (গোসল ফরজ হয়েছে এমন) ব্যক্তি, ইত্যাদি।

৫. হাদাছঃ ফিক্বহী পরিভাষায় নাজাসাত হুকমীকে বলা হয় হাদাছ। হাদাছ আবার দুই প্রকার হয়ে থাকে। বড় হাদাছ ও ছোট হাদাছ তথা হাদাছ আকবার ও হাদাছ আসগার।

৬. হাদাছ আকবারঃ যে হাদাছ থেকে শুধু অযুর মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করা যায় না বরং গোসলের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করতে হয় এটাকে হাদাছ আকবার (বড় হাদাছ) বলে।

৭. হাদাছ আসগারঃ যে হাদাছ থেকে শুধু অযুর মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করা যায় এটাকে হাদাছ আসগার (ছোট হাদাছ) বলে।

উল্লেখ্য তাহারাত বা পবিত্রতার দুটি ধাপ রয়েছে। যথাঃ বড় হাদাছ বা জানাবাত থেকে পবিত্রতা তথা ফরজ গোসল করে পবিত্রতা অর্জন করা আর ছোট হাদাছ থেকে পবিত্রতা তথা অযু করে পবিত্রতা অর্জন করা।

এবার আসুন! কোন কাজের জন্য কোন ধরণের তাহারাত প্রয়োজন হয় এ বিষয়গুলো একটু স্ববিস্তারে জেনে নেই। যেমন..

ক. স্বালাতঃ যে সব ইবাদাতের জন্য পরিপূর্ণ তাহারাত ফরজ করা হয়েছে এর অন্যতম একটি হচ্ছে স্বালাত। স্বালাত শুদ্ধ হওয়ার পূর্বশর্ত হচ্ছে পরিপূর্ণ তাহারাত। গোসল ফরজ থাকলে অবশ্যই গোসল করতে হবে আর গোসল ফরজ না হলে অযু করতে হবে, এটাই পরিপূরন তাহারাত। পরিপূর্ণ পবিত্রতা ব্যতীত স্বালাত শুদ্ধ হবে না। ইরশাদ হচ্ছে..

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (6)

হে মুঅমিনগণ! তোমরা যখন স্বালাতে দাঁড়াবে তখন..

- তোমাদের মুখমণ্ডল ধৌত করবে এবং কনুই পর্যন্ত উভয় হাত (ধৌত করবে,) তোমাদের মাথা মাসেহ করবে আর কায়া'ব (টাখনু) পর্যন্ত পাও (ধৌত করবে।)
- আর তোমরা জুনুবী হলে (সঙ্গম করলে বা বীর্যপাত হলে) উত্তমরূপে পবিত্রতা হাসিল করবে (তথা গোসল করবে।)
- তোমরা যদি অসুস্থ হও অথবা সফরে থাকো আর মলমূত্র ত্যাগ করে (অযুর জন্য) অথবা নারী স্পর্শ করে (তথা সঙ্গম করে গোসলের জন্য) পানি না পাও (অথবা পানি ব্যবহারে সক্ষম না হও) তখন (অযু ও গোসলের বদলে) পবিত্র স্বাঈ'দ (মাটি, বালু, পাথর) দিয়ে তায়াম্মুম করবে তথা মুখমণ্ডল ও হাত মাসেহ করে নেবে।

আল্লাহ তোমাদের উপর কষ্ট চাপিয়ে দিতে চান না, তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান এবং তোমাদের উপর তার নিয়ামতসমূহ পরিপূর্ণ করতে চান, যেন তোমরা শোকর আদায় কর। (৫ মা-ইদাহঃ ৬)

আইন ও বিধানঃ সালাতের আগে অবশ্যই তাহারাত অর্জন করতে হয়। কারণ সালাতের পূর্বশর্ত হচ্ছে তাহারাত। পূর্ন তাহারাত ব্যতীত সালাত শুদ্ধ হয় না। তাই স্বালাত আদায়ের আগে তাহারাত বা পবিত্রতা অর্জন করা আমাদের ফরজ দায়িত্ব।

স্বালাতের জন্য তাহারাতের ব্যাপারটিকে একেবারে স্পষ্ট করে বুঝার জন্য নিম্নে একটি হাদীছ উল্লেখ করা হল। বর্ণিত হচ্ছে..

عن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه **قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ لاَ يَقْبَلُ الله صَلاَةً بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلاَ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ .** رواه مسلم.

ইবনু উ'মার রা. বলেনঃ আমি রাসূল সা.কে বলতে শুনেছি "আল্লাহ (দুই ধরণের ইবাদাত) কবুল করেন না। (১) তাহারাত ব্যতীত স্বালাত আর (২) হারাম সম্পদ থেকে সাদাক্বাহ"। (মুসলিম)

দলীল বিশ্লেষণঃ উপরে উল্লেখিত সূরাহ মাইদার ৬ষ্ঠ আয়াতে সালাতের আগে পবিত্রতা অর্জনের কথা বলা হয়েছে। সুতরাং উল্লেখিত আয়াত এবং বর্ণিত হাদীছ থেকে বুঝা যায় পরিপূর্ণ তাহারাত সালাতের পূর্বশর্ত। আর বিষয়টি যেহেতু আল-কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত দ্বারা প্রমাণিত তাই এতে কারো দ্বিমত নেই এবং দ্বিমতের কোনো সুযোগও নেই।
তবে আরো ২টি ইবাদাতের জন্য পবিত্রতার প্রয়োজন বলেও অনেক ইমাম থেকে মতামত পাওয়া যায়। কিন্তু বিষয়টি যেহেতু অকাট্ট দলীল (আল-কুরআনের মুহকাম আয়াত অথবা মুতাওয়াতির মানের হাদীছ) দ্বারা প্রমাণিত হয়নি তাই এতে ভিন্নমতের সুযোগ তৈরি হয়েছে এবং ভিন্নমত পাওয়াও যায়। যেমন..

খ. তাওয়াফঃ অধিকাংশ ইমামের মতে তাওয়াফের জন্য পরিপূর্ণ তাহারাত আবশ্যক। অর্থাৎ গোসল ফরজ থাকলে গোসল করতে হবে নতুবা অযু করতে হবে এবং তারপর তাওয়াফ করবে। পরিপূর্ণ পবিত্রতা ব্যতীত তাওয়াফ শুদ্ধ হবে না। কারণ হাদীছে বর্ণিত আছে..

روى عبد الله بن عباس رضي الله عنه **أَنَّ رسول اللهﷺ قال الطَّوافُ حولَ البيتِ مثْلَ الصَّلاةِ، إلا أنّكم تتكلّمونَ فيهِ**

আব্দুল্লাহ বিন আ'ব্বাস রা. বর্ণনা করেন, রাসূল সা. বলেছেনঃ বাইতুল্লাহর তাওয়াফ সালাতের মত। তবে এতে কথা বলা যায়। (তিরমিযী। হাদীছটির সনদ সাহীহ।)

পর্যালোচনাঃ ইমাম নববী, ইমাম বাইহাক্বীসহ অনেকেই বলেছেন "এটা রাসূল সা.র হাদীছ নয় বরং বিশুদ্ধ বর্ণনা মতে এটা ইবন আব্বাস রা.র নিজের কথা"। (এ কথাটির সূত্র ও হাওয়ালা নিম্নে আরবীতে দেওয়া আছে।)

ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها **قالت لما أراد ﷺ أن يطوف توضأ وقد قال ﷺ خذوا عني مناسككم** . رواه مسلم .(1297)

বুখারী ও মুসলিমের এক বর্ণনায় এসেছে, আইশাহ রা. বলেনঃ নবী সা. তাওয়াফের আগে অযু করেছেন। আর মুসলিমের এক বর্ণনায় (১২৯৭) এসেছে নবী সা. বলেছেনঃ "তোমরা তোমাদের মানাসিক (ইবাদাতের নিয়ম কানুন) আমার থেকে শিখে নাও।

পর্যালোচনাঃ যারা বলেছেন তাওয়াফের জন্য অযু শর্ত নয় উনাদের কথা হচ্ছেঃ উল্লেখিত হাদীছ দুটি সাহীহ হলেও কোনো বিধানকে ফরজ বানানোর জন্য যথেষ্ট নয়। বরং এমন হাদীছ দ্বারা বেশী থেকে বেশী সুন্নত বা মুস্তাহাব প্রমাণ করা যেতে পারে। (এ কথাটির সূত্র ও হাওয়ালা নিম্নে আরবীতে দেওয়া আছে।)

ثبت في الصحيحين أن النبي ﷺ قال لعائشة لما حاضت افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي

বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে আ'ইশাহ রা.র ঋতুস্রাব শুরু হলে রাসূল সা. বলেছেন "অন্য হাজীগণ যা করে তুমিও তাই করবে। তবে (স্রাব থেকে) পবিত্র হওয়ার আগ পর্যন্ত তাওয়াফ করবে না।

পর্যালোচনাঃ যারা বলেছেন তাওয়াফের জন্য অযু শর্ত নয় উনাদের কথা হচ্ছেঃ উল্লেখিত হাদীছটি দ্বারা ঋতুস্রাব চলাকালীন সময়ে তাওয়াফ করতে বারণ করা হয়েছে এবং স্রাব বন্ধ হওয়ার পর তাওয়াফ করতে বলা হয়েছে। এর সাথে অযুর কোনো সম্পর্ক নেই। (এ কথাটির সূত্র ও হাওয়ালা নিম্নে আরবীতে দেওয়া আছে।)

ফিক্বহ বিশ্লেষণঃ অনেক ইমামের মতে তাওয়াফের জন্য অযু আবশ্যক হলেও ইমাম আবু-হানীফাহ, শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ রাহি.সহ কয়েকজন উলামার মতে তাওয়াফের জন্য অযু শর্ত নয়। বরং অযু ছাড়াও তাওয়াফ করা যাবে এবং তাওয়াফ হয়ে যাবে। কারণ উল্লেখিত দলীলসমূহ অযু ফরজ করার জন্য যথেষ্ট নয়।

উপরে উল্লেখিত তাওয়াফ বিষয়ে বর্ণিত বিধান সমূহের আরবী টেক্সট হচ্ছে..

وذهب بعض العلماء إلى أن الطهارة من الحدث ليست شرطاً للطواف وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله **واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية .**
وأجابوا عن أدلة القول الأول بالآتي :
أما حديث الطواف بالبيت صلاة فقالوا :لا يصح من قول النبي ﷺ وإنما هو من قول ابن عباس رضي الله عنهما **قال النووي في المجموع : الصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ,كَذَا ذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ الْحُفَّاظِ اهـ .**
وأما فعل النبي ﷺ وأنه طاف متطهراً فقالوا هذا لا يدل على الوجوب وإنما يدل على الاستحباب فقط ، لأن النبي ﷺ فعله ولم يَرِد أنه أمر أصحابه بذلك .
وأما قوله ﷺ لعائشة افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي فإنما منعها النبي ﷺ من الطواف لأنها حائض ، والحائض ممنوعة من دخول المسجد.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
والذين أوجبوا الوضوء للطواف ليس معهم حجة أصلاً ؛ فإنه لم يَنقل أحدٌ عن النَّبي ﷺ لا بإسناد صحيح ولا ضعيف أنه أمر بالوضوء للطواف، مع العلم بأنه قد حج معه خلائق عظيمة، وقد اعتمر عمَراً متعددة والناس يعتمرون معه فلو كان الوضوء فرضاً للطواف لبيَّنه النبيﷺ بياناً عامّاً، ولو بيَّنه لنَقل ذلك المسلمون عنه ولم يهملوه، ولكن ثبت في الصحيح أنه لما طاف توضأ، وهذا وحده لا يدل على الوجوب ؛ فإنه قد كان يتوضأ لكل صلاة، وقد قال :إني كرهتُ أن أذكر الله إلا على طهر . ... اهـ .
"مجموع الفتاوى" (21 / 273) .

গ. কুরআনের কপি স্পর্শ করাঃ মুস্বহাফ বা কুরআনের কপি স্পর্শ করার জন্যও অযু আবশ্যক বলে অনেকে মত প্রকাশ করেছেন। দলীল হিসেবে উনারা উল্লেখ করেন..

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ (77) فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ (78) لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (79)

নিশ্চয় এটা হল সম্মানিত কুরআন, এটা (সংরক্ষিত) আছে সুরক্ষিত কিতাবে (লাউহে মাহফূজে) এটাকে স্পর্শ করে কেবল তারাই যারা পূত ও পবিত্র। (৫৬ ওয়াক্বিয়া'হঃ ৭৭-৭৯)

লক্ষণীয়ঃ এ তিন আয়াতে ৪টি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বিষয়গুলো হচ্ছে..
৭৭ তম আয়াতের কুরআন কারীম শব্দটি, যার অর্থ সম্মানিত কুরআন (এখানে সুস্পষ্টভাবে কুরআনের কথা বলা হয়েছে)
৭৮ তম আয়াতের কিতাব মাকনূন তথা লাউহে মাহফূজ (এখানে সুস্পষ্ট ভবে কিতাব মাকনূন তথা লাউহে মাহফূজের কথা বলা হয়েছে)
৭৯ তম আয়াতের এটাকে স্পর্শ করে কেবল তারাই যারা পূত ও পবিত্র।

এ আয়াতে এটাকে স্পর্শকারীদের ব্যাপারে খবর বা তথ্য দেয়া হয়েছে। তবে "এটা" শব্দ ব্যবহার করে কি বুঝানো হয়েছে তা স্পষ্ট করে বলা হয়নি। অর্থাৎ এ ব্যাপারে বিধানটি সুস্পষ্ট নয়। এখানে "এটা" সর্বনাম দ্বারা যেমন কুরআন বুঝা যায়, তেমনি লাউহে মাহফূজও বুঝা যায়। আর আরবী ব্যাকরণের নিয়ম (সর্বনাম সাধারণত তার নিকটতম শব্দকে বুঝিয়ে থাকে) মানা হলে লাউহে মাহফূজ বুঝার সম্ভাবনাই বেশী। তাই এ আয়াতসমূহের অর্থ কয়েকভাবে বুঝা যেতে পারে। যেমন..

১. লাউহে মাহফূজে যে কিতাব রয়েছে এটাকে স্পর্শ করে কেবল তারাই যারা সৃষ্টিগতভাবে পূত ও পবিত্র তথা ফিরিস্তারা। ফিরিস্তা ছাড়া অন্য কেউ এটা স্পর্শ করতে পারে না।
যারা এমন তাফসীর করেন উনাদের মতে মুসলিম কাফির নির্বিশেষে সকল মানুষই দুনিয়ায় থাকা কুরআনের কপি তথা মুস্বহাফ স্পর্শ করতে পারবে।
এমত পোষণকারীদের আরো একটি যৌক্তিক প্রমাণ হলঃ আল-কুরআন পাঠানো হয়েছে মানবজাতির হেদায়াত স্বরূপ। অর্থাৎ মানুষ এটা পড়বে, বুঝবে এবং এর বিধান মেনে জীবন যাপন করবে। আর কোনো কিতাব মানতে হলে প্রথমে পড়তে হবে এবং বুঝতে হবে।
যে বা যারা এ কিতাবের বিধান মেনে নিয়ে বাস্তব জীবন পরিচালিতে করবে তারাই হবে মুসলিম। এখন যদি মুসলিম না হলে কেউ এটা ধরতেই না পারে তবে পড়বে কিভাবে, বুঝবে কি ভাবে? সুতরাং "মুসলিম না হয়ে কেউ কুরআন স্পর্শ করতে পারবে না" এমন বিধান কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্যের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ হয়ে যায়।

২. উক্ত আয়াতের আরো একটি তাফসীর হচ্ছেঃ লাউহে মাহফূজ থেকে কুরআন অবতীর্ণ করে কেবল তারাই যারা সকল প্রকার পাপ পঙ্কিলতা থেকে পূত ও পবিত্র তথা ফিরিস্তারা।

৩. উক্ত আয়াতের আরো একটি তাফসীর হচ্ছেঃ কুরআনের যে কপি আমাদের হাতে বিদ্যমান আছে এটাকে স্পর্শ করবে শুধু তারাই যারা কুফর শিরক থেকে পবিত্র। অর্থাৎ সকল মুসলিম কুরআন স্পর্শ করতে পারবে যদিও তার অযু না থাকে বা সে জুনুবী হয়।
যারা এমন কথা বলেন উনারা নিজেদের দলীল হিসেবে ওইসব হাদীছ উপস্থাপন করে থাকেন যেখানে বলা হয়েছে "মুঅমিন অপবিত্র হয় না"।

৪. উক্ত আয়াতের আরো একটি তাফসীর হচ্ছেঃ কুরআনের কপিকে স্পর্শ করবে শুধু তারাই যারা জুনুবী নয় অর্থাৎ যাদের উপর গোসল ফরজ হয়নি। যারা এমন তাফসীর করেছেন উনাদের মতে মুসলিম ব্যক্তি বিনা অযুতে কুরআন স্পর্শ করতে পারবে যদি সে জুনুবী না থাকে।

৫. উক্ত আয়াতের আরো একটি তাফসীর হচ্ছেঃ কুরআন স্পর্শ করবে শুধু তারাই যারা সকল প্রকার হাদাছ (অপবিত্রতা) থেকে পবিত্র। যারা এমন তাফসীর করেন উনাদের মতে বিনা অযুতে কুরআন স্পর্শ করবে না

৬. উক্ত আয়াতের আরো একটি তাফসীর হচ্ছেঃ কুরআন পাঠ করে কেবল তারাই যারা শিরক মুক্ত তথা তাওহীদে বিশ্বাসী। (অর্থাৎ আয়াতে স্পর্শ বলে পাঠ বুঝানো হয়েছে)

৭. উক্ত আয়াতের আরো একটি তাফসীর হচ্ছেঃ কুরআন পাঠের স্বাদ পায় এবং এর দ্বারা উপকৃত হয় কেবল তারাই যারা তাওহীদে বিশ্বাসী। সূত্রঃ এসব তাফসীর ও অভিমত তাফসীর কুরতুবী থেকে নেয়া হয়েছে।

ফিক্বহ বিশ্লেষণঃ আয়াতের বর্ণনা যেহেতু সুস্পষ্ট নয়, তাই বিনা অযুতে কুরআন স্পর্শ করা নিয়ে ভিন্ন মতের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং এ ব্যাপারে ফিক্বহী ইমামগণ থেকে ভিন্নমত পাওয়াও যায়। যেমন..

- অধিকাংশ উলামার মতে কেউ বিনা অযুতে কুরআন স্পর্শ করবে না। সাহাবাদের মাঝে আলী, ইবন মাসউ'দ, সায়া'দ বিন আবু-ওয়াক্কাস, সাঈদ বিন যাইদ রাঃহুম এবং পরবর্তিদের মাঝে ইমাম জুহরী, ইবরাহীম নাখয়ী, হাম্মাদসহ আরো অনেক ইমাম থেকে এমন অভিমত পাওয়া যায়। ফিক্বহী ইমামগণের মাঝে ইমাম শাফিয়ী' এবং ইমাম মালিক এ মতটি গ্রহণ করেছেন।
- ইবন আব্বাস, শায়'বী গং আলিমগণের মতে বিনা অযুতে কুরআন স্পর্শ করা যাবে। ফিক্বহী ইমামগণের মাঝে ঈমাম আবু-হানীফাহ রাহিঃ এ মতটি গ্রহণ করেছেন। তবে আবু-হানীফাহ থেকে অন্য আরেকটি মতও পাওয়া যায়। অন্যমতে তিনি বলেছেনঃ বিনা অযুতে শুধু উপরের অংশ এবং ভিতরের খালি অংশ স্পর্শ করবে যেখানে লেখা থাকে না। কুরআনের লেখা অংশ অযু ছাড়া স্পর্শ করবে না। (উল্লেখিত সকল মতামত কুরতুবী থেকে আনা হয়েছে)
- কাগজে, কাপড়ে, পাথরে, টাইলসে বা অন্যকিছুতে কুরআনের আয়াত লিখা থাকলেও উল্লেখিত নিয়ম কার্যকর হবে।
- কোনো ফ্রেইমে কুরআনের আয়াত লিখা থাকলে ফ্রেইমের উপরে যদি আলাদা গ্লাস, পলিথিন বা অন্যকিছু থাকে তবে সকলের মতেই বিনা অযুতে ধরতে পারবে। আর যদি লেমিনিটিং মেশিন দিয়ে একেবারে লাগিয়ে দেয়া হয় তবে উল্লেখিত ভিন্নমত কার্যকর হবে।
- জুনুবী ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত করবে না। তবে ইমাম মালিক বলেছেনঃ ঋতুবতী নারী কুরআন তিলাওয়াত করবে। দলীল হিসেবে তিনি বলেছেন যেহেতু কুরআন বা হাদীছে সরাসরি নিষেধ করা হয়নি এবং এতো দীর্ঘ দিন কুরআন থেকে দূরে থাকা একজন মুঅমিনের পক্ষে কল্যাণকর নয়। তাই ঋতুবতী নারী কুরআন পড়বে।
- যে সব নারী লাইব্রেরীতে, প্রিন্টিং প্রেসে বা এমন স্থানে কাজ করেন যেখানে কাজের প্রয়োজনে তাকে কুরআনের কপি স্পর্শ করতে হয় এমন অবস্থায় অনেকের মতে ঋতুস্রাব অবস্থায় ধরতে পারবে আর অনেকের মতে হাতে গ্লভস (হাত মোজা) পড়ে নিবে। (আল্লাহু আ'লাম)

পবিত্রতা অর্জনের উপায়ঃ পবিত্রতা অর্জনের মূল মাধ্যম হলো "অযু" ও "গোসল"। আর কোনো বৈধ কারণে অযু গোসল করতে সক্ষম না হলে "তায়াম্মুম"র মাধ্যমেও পবিত্রতা অর্জন করা যায়।

এবার আসুন! অযু, গোসল ও তায়াম্মুম সম্পর্কে একটু স্ববিস্তারে জেনে নেই..

অনুচ্ছেদঃ ১৯. অযু

আমাদের উপর অন্যতম আরো একটি ফরজ দায়িত্ব হলো প্রয়োজন হলে অযু করা। অযু সর্বকালীন ফরজ নয়। বরং যে সব ইবাদাতের জন্য অযু আবশ্যক বলে ক্বাত্বয়ী' (অকাট্ট) দলীল পাওয়া যায় শুধু ওই সকল কাজের জন্যই অযু ফরজ হয়। অযুর মাধ্যমে পরিপূর্ণ পবিত্রতা অর্জিত হয়। আমাদেরকে অযুর আদেশ দিয়ে মহান আল্লাহ তায়া'লা বলেছেন..

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

হে মুঅমিনগণ! তোমরা যখন সালাতে দাঁড়াবে তখন তোমাদের মুখমণ্ডল ধৌত করবে এবং কনুই পর্যন্ত উভয় হাত (ধৌত করবে) তোমরা তোমাদের মাথা মাসেহ করবে আর কায়া'ব (টাখনু) পর্যন্ত পাও (ধৌত করবে।) (৫ মা-ইদাহঃ ৬)

বিশেষ ইবাদাতের উদ্দেশ্যে পবিত্রতা অর্জনের জন্য অযু করতে হয়। সাধারণত মুখ মণ্ডল ধৌত করা, দুই হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করা, মাথা মাসেহ করা এবং দুই পা কা'ব (টাখনু) পর্যন্ত ধৌত করার নাম অযু।
অযুতে নিয়ত করা এবং বিসমিল্লাহ বলা আবশ্যক। নিয়ত না করলে অযুর ছাওয়াব পাওয়া যায় না আর বিসমিল্লাহ না বললে অযুর বরকত হাসিল হয় না। এছাড়া কুল্লি করা, নাকে পানি দেয়া ও কান মাসেহ করা অযুর সুন্নত কাজ। হাদীছে বর্ণিত হয়েছে..

وعن حمران أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فغسل كفيه ثلاث مرات ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول اللهﷺ توضأ نحو وضوئي هذا - .متفق عليه.

উছমান রা. একদা অযুর পানি আনালেন তারপর (জনসম্মুখে অযু করতে শুরু করলেন। প্রথমে)

- তিনি উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত ৩ বার ধৌত করলেন,
- তারপর কুল্লি করলেন, নাকে পানি দিলেন এবং নাক ঝাড়লেন।
- তারপর ৩ বার মুখ মণ্ডল ধৌত করলেন।
- তারপর ডানহাত কনুই পর্যন্ত ৩ বার ধৌত করলেন।
- তারপর বামহাত এভাবেই ধৌত করলেন।
- তারপর মাথা মাসেহ করলেন।
- তারপর ডান পা টাখনু পর্যন্ত ৩ বার ধৌত করলেন।
- তারপর একই ভাবে বাম পা ধৌত করলেন।
- অতঃপর বললেনঃ আমি রাসুল সা.কে এভাবেই অযু করতে দেখেছি যেভাবে আমি এখন অযু করলাম। (বুখারী ও মুসলিম)

বিঃ দ্রঃ = অযুর অঙ্গসমূহ ১বার ১বার করে ধৌত করা যায়, ২বার ২বার করে ধৌত করা যায়, ৩বার ৩বার করেও ধৌত করা যায়। আবার একই অযুতে কোনো অঙ্গ ১বার কোনো অঙ্গ ২বার এবং কোনো অঙ্গ ৩বার করেও ধৌত করা যায়। এ সকল অযুই রাসূল সা. থেকে প্রমাণিত। তবে ৩ বার ৩ বার করে অযু করা উত্তম বলে হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। যেমন..

عن عبد الله بن زيد أن النبيﷺ توضأ فغسل وجهه ثلاثا وغسل يديه مرتين مرتين ومسح برأسه وغسل رجليه مرتين
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد ذكر في غير حديث أن النبي ﷺ توضأ بعض وضوئه مرة وبعضه ثلاثا وقد رخص بعض أهل العلم في ذلك لم يروا بأسا أن يتوضأ الرجل بعض وضوئه ثلاثا وبعضه مرتين أو مرة

আব্দুল্লাহ বিন যাইদ রা. থেকে বর্ণিত, নবী সা. একদা অযু করছিলেন (আর আব্দুল্লাহ দেখছিলেন) তিনি মুখমণ্ডল ধৌত করেছেন ৩বার, উভয় হাত ধৌত করেছেন ২বার ২বার করে, মাথা মাসেহ করেছেন (১ বার) আর উভয় পা ধৌত করেছেন ২বার। (তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী বলেছেন হাদীছটি হাসান সাহীহ।)
অন্য বর্ণনায় এসেছে.. নবী সা. অযুর কোনো কোনো অঙ্গ ১বার করে ধৌত করেছেন আর কোনো কোনো অঙ্গ ৩বার করে ধৌত করেছেন। (এতোটুকু বর্ণনা করার পর ইমাম তিরমিযী বলেছেন) কোনো কোনো আলীমগণ এমন করাকে অনুমোদিত বলেছেন। উনারা বলেছেনঃ অযুর কোনো অঙ্গ ১বার, কোনো অঙ্গ ২বার আর কোনো অঙ্গ ৩বার করাতে কোনো সমস্যা হবে না।

ফিক্বহ বিশ্লেষণঃ হানাফী ফিক্বহ মতে অযুর ফরজ ৪টি তথা মুখ মণ্ডল ধৌত করা, দুই হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করা, এক চতুর্থাংশ মাথা মাসেহ করা আর দুই পা টাখনু পর্যন্ত ধৌত করা।

- মালিকী, শাফিয়ী' ও হাম্বলী ফিক্বহ মতে অযুতে নিয়ত করা আবশ্যক।
- কোনো কোনো ফিক্বহ মতে অযুর শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা, অযুতে কুল্লি করা এবং নাকে পানি দেওয়াও আবশ্যক।

প্রাসঙ্গিক আলোচনাঃ অযু ভঙ্গের কারণসমূহঃ শারীয়া'হ বিধান মতে এমন কিছু বিষয় রয়েছে যা করলে বা সংগঠিত হলে অযু নষ্ট হয়ে যায় এবং নতুন করে অযু করতে হয়, ফিক্বহী পরিভাষায় এগুলোকে বলা হয় "নাওয়াক্বিযু-ল-ওয়ুযু" তথা অযু ভঙ্গের কারণসমূহ। আমাদের ইবাদাত বন্দেগীর বিশুদ্ধতার জন্য এসব বিষয়ে জানা আবশ্যক। সুতরাং আসুন! জেনে নেই; কোন কোন কারণে অযু ভঙ্গ হয়ে যায় এবং নতুন করে অযু করতে হয়..

১. মলদ্বার অথবা মূত্রদ্বার দিয়ে কোনোকিছু বের হলে অযু নষ্ট হয়ে যায় এবং তখন (অযু প্রয়োজন হয় এমন কোনো ইবাদাতের জন্য) আবার নতুন করে অযু করতে হয়। অযুর ব্যাপারে বিধান দিয়ে মহান আল্লাহ তায়া'লা সুরাহ নিসার ৪র্থ আয়াতে বলেছেন..

أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ	অথবা তোমাদের কেউ যখন টয়লেট থেকে আসবে (তখন সে অযু করবে)

ফিক্বহ বিশ্লেষণঃ যেহেতু বিষয়টি আল-কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত দ্বারা প্রমাণিত তাই এতে ভিন্নমতের কোনো সুযোগ নেই এবং কেও ভিন্নমত পোষণ করেননি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনাঃ পেশাব পায়খানা থেকে পবিত্রতা অর্জনের উপায়

ক. পেশাবঃ পেশাব করার পর পেশাবের নির্গমনস্থান ধৌত করা অথবা টিসু বা অন্যকিছু দিয়ে পরিষ্কার করা মুস্তাহাব।

খ. পায়খানাঃ পায়খানা করার পর মলদ্বারে লেগে থাকা আবর্জনা পরিষ্কার করতে হয়। স্বাভাবিক ভাবে পাথর, মাটি বা টিসু দিয়ে পরিষ্কার করাই যথেষ্ট তবে পানি দিয়ে ধৌত করা উত্তম। বর্ণিত হচ্ছে..

قوله ﷺإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن، فإنهن تجزي عنه .رواه أحمد وأبو داود والنسائي من حديث عائشة رضي الله عنها، وقال الحافظ الدارقطني :إسناده صحيح،

আ'ইশাহ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেনঃ তোমাদের কেও টয়লেটে গেলে সে যেন ৩টি পাথর (৩টি মাটির ঢিলা বা ৩ টুকরা টিসু) সঙ্গে নিয়ে যায়, যার দ্বারা সে পরিচ্ছন্নতা অর্জন করবে। আর এটুকুই তার জন্য যথেষ্ট হবে। (আহমাদ, আবু-দাউদ। হাদীছটি সাহীহ)

ফিক্বহ বিশ্লেষণঃ পায়খানা করার পর ৩টি পাথর বা ৩টি মাটির দলা অথবা ৩পিস টিসু দিয়ে মলদ্বার মুছে নেওয়াই যথেষ্ট। তবে পানি দিয়ে ধৌত করা উত্তম। এ ব্যাপারে বর্ণিত হচ্ছে..

روى البخاري (150)ومسلم (271) **عن أَنَس بْن مَالِكٍ، قال :كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ، أَجِيءُ أَنَا وَغُلاَمٌ، مَعَنَا إِدَاوَةٌ مِنْ مَاءٍ ، يَعْنِي يَسْتَنْجِي بِهِ"** والْإِدَاوَة :إِنَاء صَغِير من جلد يتَّخذ للْمَاء ، كما في "فتح الباري "لابن حجر.(1/ 76)

আনাস বিন মালিক রা. বলেনঃ নবী সা. যখন হাজতের জন্য (পায়খানার জন্য) বের হতেন তখন আমি আর আরো একটি বালক এক ইদাওয়াহ পানি নিয়ে আসতাম। তিনি এ পানি দিয়ে ইস্তিঞ্জা (পরিচ্ছন্নতা হাসিল) করতেন। (বুখারীঃ ১৫০, মুসলিমঃ ২৭১) উল্লেখ্য চামড়া দিয়ে বানানো ছোট পানির পাত্রকে ইদাওয়াহ বলা হয়।

২. রক্ত, পুঁজ ও বমিঃ শরীর থেকে রক্ত, পুঁজ, বমি ইত্যাদি বের হলেও অযু নষ্ট হয়ে যাবে এবং এরপর (অযু প্রয়োজন হয় এমন কোনো ইবাদাত করতে হলে) আবার নতুন করে অযু করতে হবে। এটা হলো হানাফী ও হাম্বলীদের অভিমত। দলীল হিসেবে বর্ণিত হচ্ছে..

الأمر الثاني من نواقض الوضوء : سيلان الدم الكثير أو القيح أو الصديد أو القيء الكثير كما يرى الحنفية والحنابلة، لما رواه الإمام أحمد والترمذي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم **قَالَ :مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ أَوْ قَلْسٌ أَوْ مَذْيٌ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلاَتِهِ وَهُوَ فِي ذَلِكَ لاَ يَتَكَلَّمُ .أخرجه ابن ماجة .والراجح عدم النقض؛ لضعف الحديث.**

আ'ইশাহ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেন যে ব্যক্তি (সালাতের ভিতর) বমি করল অথবা নাক থেকে রক্ত বের হল অথবা পিত্ত বমি করল সে যেন ফিরে গিয়ে অযু করে এবং কোনো প্রকার কথাবার্তা না বলে। তারপর তার সালাত (যেখান থেকে চলে গিয়েছিল সেখান থেকেই) চালিয়ে যায়। (ইবনু মাজা। হাদীছটি দ্বাইফ)

ফিক্বহ বিশ্লেষণঃ হানাফী মতে রক্ত বের হলেই অযু ভঙ্গ হবে না বরং রক্ত বের হয়ে গড়িয়ে গেলে বা গড়িয়ে পড়লেই কেবল অযু ভঙ্গ হবে এবং বমি মুখ ভরে হলেই কেবল অযু ভঙ্গ হবে।
কিন্তু অন্য ইমামগণের মতে এসব কারণে অযু ভঙ্গ হবে না। কারণ হাদীছটি দ্বাইফ। আর দ্বাইফ হাদীছ বিধানের ক্ষেত্রে দলীল হিসেবে গণ্য হয় না।

৩. ঘুমঃ ঘুম অযু ভঙ্গের কারণ কী না? এ সম্পর্কে দুই ধরণের হাদীছ পাওয়া যায়। যথা..

لقوله صلى الله عليه وسلم **:العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ،** رواه أحمد وابن ماجة بإسناد حسن،

এক বর্ণনায় রাসূল সা. বলেছেনঃ চোখ হলো পায়ুপথের প্রহরী (যতক্ষণ চোখ সজাগ থাকবে ততক্ষণ পায়ুপথ দিয়ে কিছু বের হলে মানুষ এটা বুঝতে পারবে আর যখন চোখ ঘুমিয়ে পড়বে তখন পায়ুপথ দিয়ে কিছু বের হলেও মানুষ বুঝতে পারবে না।) সুতরাং যে ব্যক্তি ঘুমিয়ে পড়লো সে যেন অযু করে। (আহমাদ, ইবনু মাজা। হাদীছটি হাসান)

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে..

لقول أنس :كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم **ينامون ثم يصلون ولا يتوضأون** .رواه مسلم،

আনাস রা. বলেছেনঃ রাসূল সা.'র সাহাবাগণ (ইশার সালাতের জন্য অপেক্ষা করতে করতে) ঘুমিয়ে পড়তেন এবং অতঃপর (রাসূল সা. চলে এলে উনারা) সালাত আদায় করতেন, আর অযু করতেন না। (মুসলিম)

ফিক্বহ বিশ্লেষণঃ ঘুম সম্পর্কে উপরে দুটি হাদীছ উল্লেখ করা হয়েছে। উপরের হাদীছ থেকে বুঝা যাচ্ছে ঘুমালে অযু নষ্ট হয়ে যাবে এবং এরপর (অযু আবশ্যক হয় এমন কোনো ইবাদাত করতে চাইলে) পুনরায় অযু করতে হবে। আর নীচের হাদীছ থেকে বুঝা যায় ঘুমালে অযু নষ্ট হবে না এবং এরপর (অযু আবশ্যক হয় এমন কোনো ইবাদাত করতে চাইলে) পুনরায় অযু করতে হবে না।
আসলে ঘুম অযু বিনষ্টকারী কী না এ সম্পর্কে উল্লেখিত দুই ধরণের বেশ কয়েকটি হাদীছ বিদ্যমান আছে। তাই আমাদের উচিত বিষয়টিকে সূক্ষভাবে অনুধাবনের চেষ্টা করা আর এরই নাম ফিক্বহ।

তাই আসুন! বিষয়টি সম্পর্কে প্রসিদ্ধ চার ইমামের মতামত, বিশ্লেষণ এবং অনুধাবন সম্পর্কে জেনে নেই..
উপরের দুই প্রকার হাদীছ বিশ্লেষণ করে প্রসিদ্ধ চার ইমাম ঘুমকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা..

- অতি সামান্য ঘুমা বা হালকা ঘুম
- আর গভীর ঘুম।

অতঃপর উনারা মতামত দিয়েছেন "অতি সামান্য এবং হালকা ঘুমে অযু ভঙ্গ হবে না আর গভীর ঘুমে অযু বিনষ্ট হয়ে যাবে"। তবে হালকা ঘুম আর গভীর ঘুমের বিশ্লেষণ এবং সীমানা নির্ধারণ করা অনেক জটিল বিষয়। আর এজন্যই হালকা ঘুম আর গভীর ঘুমের সীমানা নির্ধারনের বিষয়ে উনারা একমত হতে পারেননি। তাই আপনাদের বুঝার সুবিধার্থে বিষয়টিকে আমরা স্ববিস্তারে বর্ণনা করছি..

- শোয়ে ঘুমালে অযু ভেঙ্গে যাবে কারণ এটা গভীর ঘুম। এটা হলো প্রসিদ্ধ চার ইমামের সম্মিলিত মতামত।
- কোনোকিছুতে হেলান না দিয়ে চেপে বসে ঘুমালে অযু ভঙ্গ হবে না। এটাও চার ইমামের সর্ব সম্মত মত।
- দাঁড়ানো অবস্থায়, রুকু অবস্থায়, সিজদাহরত অবস্থায় তথা সালাতের অবস্থায় ঘুমালে অযু ভঙ্গ হবে না। কারণ এমনভাবে ঘুমালে শরীরের অঙ্গসমূহ ঢিলা হয় না এবং ওইব্যক্তি তার মলদ্বারের নিয়ন্ত্রণ হারায় না। সুতরাং এমতাবস্থায় বাতাস বের হলে অবশ্যই সে জানতে পারবে। এটা হল ইমাম আবু-হানীফাহ রাহি.র মত, ইমাম আহমদ রাহিঃ থেকেও এমন একটি মত পাওয়া যায়।
- ইমাম শাফিয়ী রাহি.র মতে যদি কেও এমনভাবে ঘুমায় যে তার মলদ্বার উন্মুক্ত থাকে এবং বাতাস বের হওয়ার জন্য কোনো প্রকার প্রতিবন্ধক না থাকে তবে অযু বিনষ্ট হয়ে যাবে। যেমন রুকু, সাজিদাহ, দাঁড়ানো বা এমনভাবে বসে ঘুমিয়েছে যে তার পায়ুপথ উন্মুক্ত রয়েগেছে তবে অযু ভেঙ্গে যাবে।
- কোনো ব্যক্তি যদি কোনোকিছুতে হেলান দিয়ে চেপে বসে ঘুমায় তবে ইমাম আবু-হানীফাহ রাহিঃর মতে তার অযু নষ্ট হয়ে যাবে। কারণ এটা গভীর ঘুম। আর ইমাম শাফিয়ী' রাহিঃর মতে তার অযু ভঙ্গ হবে না। কারণ চেপে বসার কারণে বাতাস বের হবার সম্ভাবনা নেই।
- বিমান, রেলগাড়ি, বাস, কোচ বা গাড়ির সিটে বসা অবস্থায় ঘুমালেও উল্লেখিত বিধান কার্যকর হবে। (যদিও আজকাল কোনো কোনো হানাফী আলীমও এসব বাহনে চেপে বসে ঘুমালে অযু ভঙ্গ হবে না বলে মতামত দিয়ে থাকেন)

বিঃ দ্রঃ= কোন কোন ইবাদাতের জন্য অযু আবশ্যক বা ফরজ এসব বিষয় উপরে তাহারাত অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে বিধায় এখানে আর উল্লেখ করা হল না।

অনুচ্ছেদঃ ২০. গোসল

আমাদের উপর আরো একটি ফরজ দায়িত্ব হচ্ছে জুনুবী হলে অথবা (মুসলিম নারীদের) ঋতুস্রাব বা সন্তানের প্রসবের পরবর্তি স্রাব বন্ধ হওয়ার পর গোসল করা। গোসল ফরজ হয়ে গেলে গোসল করে পবিত্রতা অর্জন করতে হয়। এ মতাবস্থায় শুধু অযু করলে পবিত্রা অর্জন হয় না। আমাদেরকে গোসলের আদেশ দিয়ে মহান আল্লাহ তায়া'লা বলেছেন..

আর তোমরা জুনুবী হলে উত্তমরূপে পবিত্রতা হাসিল করবে (তথা গোসল করবে। ৫ মা-ইদাহঃ ৬)	وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا

গোসল ফরজ হওয়ার কারণসমূহঃ গোসল ফরজ হওয়ার অন্যতম একটি কারণ হচ্ছে জুনুবী হওয়া। আর জুনুবী হওয়া যৌনতা সংক্রান্ত ব্যাপার। পুরুষ বা নারী দুইভাবে জুনুবী হতে পারে। এ ছাড়া অন্য কারণেও তথা মেয়েদের হাইদ্ব ও নিফাস বন্ধ হওয়ার পরও গোসল ফরজ হয়। গোসল ফরজ হওয়ার কারণসমূহ হচ্ছে..

কারণঃ ১ যৌন সঙ্গমঃ নারী ও পুরুষ যৌন সঙ্গম করলে উভয়ের উপর গোসল ফরজ হয় এবং এ অবস্থাকে জুনুবী বলা হয়। যে কথা বলা হয়েছে সূরাহ মাইদাহর ৬ষ্ঠ আয়াতে। এ ছাড়া হাদীছে বর্ণিত হচ্ছে..

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم **إذا جلس بين شُعَبها الأربع ثم جَهَدها فقد وجب الغسل.** متفق عليه.زاد مسلم وإن لم يُنزِل

আবু-হুরাইরাহ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেনঃ পুরুষ যখন (সঙ্গমের জন্য) নারীর চার অঙ্গের মধ্যখানে বসবে (এমনভাবে বসবে যে পুরুষের কমর থাকবে নারীর দুই রানের মাঝে আর লিঙ্গের অগ্রভাগ থাকবে যোনির দুই কপাটের মধ্যখানে) অতঃপর (লিঙ্গ নারী যোনিতে প্রবেশ করিয়ে সঙ্গমের) কাজ শুরু করে দেবে তখন বীর্যপাত না হলেও (উভয়ের উপর) গোসল ওয়াজিব হয়ে যাবে। (বুখারী ও মুসলিম)

উপরের হাদীছে বর্ণিত বিষয়টিকে আরো স্পষ্টভাবে বুঝার জন্য নিম্নে আরো একটি হাদীছ উল্লেখ করা হল।

عن عائشة رضي الله عنها**قالت :قال رسول الله** صلى الله عليه وسلم **إذا قَعَد بين شُعَبِها الأربع، ثم مسَّ الختانُ الختانَ، فقد وجب الغسلُ** (رواه أحمد، ومسلم، والترمذي، وصححه، ولفظه) :**إذا جاوز الختانُ الختانَ وجب الغسل.**

আ'ইশাহ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেনঃ পুরুষ যখন (সঙ্গমের জন্য) নারীর চার অঙ্গের (দুই রান ও যোনির দুই কপাটের) মধ্যখানে বসবে অতঃপর পুরুষের খিতান যখন নারীর খিতান স্পর্শ করবে (অর্থাৎ লিঙ্গের অগ্রভাগ যোনির ভিতরে প্রবেশ করাবে) তখন (উভয়ের উপর) গোসল ওয়াজিব হয়ে যাবে। (মুসলিম, আহমদ, তিরমিযী। হাদীছটি সাহীহ।)

খিতান পরিচিতিঃ খিতান অর্থ খাতনার স্থান। পুরুষের খাতনা করার সময় লিঙ্গের যে স্থানে (অতিরিক্ত চামড়া) কাটা হয় ওই স্থান হচ্ছে পুরুষের খিতান আর নারীদের খাতনা করার সময় যোনিমুখের যে স্থান থেকে অতিরিক্ত চামড়া কেটে ফেলা হয় ওই স্থান হচ্ছে নারীর খিতান।

পুরুষের খিতান হচ্ছে লিঙ্গের অগ্রভাগের পরে আর নারীর খিতান হচ্ছে যোনিমুখের উপর। সে মতে পুরুষের খিতান তখনই নারীর খিতান স্পর্শ করবে যখন লিঙ্গের অগ্রভাগ যোনিমুখের ভিতরে চলে যাবে। আর তখনই গোসল ফরজ হয়ে যাবে।

প্রাসঙ্গিক বিষয়ঃ সঙ্গমের নিয়মঃ স্বামী-স্ত্রীর জন্য একে অপরের পুরা দেহ উপভোগ করাই বৈধ। তারা একে অপরের দেহের সবকিছুই দেখতে পারবে, ধরতে পারবে এবং সকল অঙ্গ নিয়ে খেলা করে মজা করতে পারবে এবং নানা পদ্ধতিতে সঙ্গম করতে পারবে। তবে সঙ্গম করতে হবে শুধুই যোনিপথে, পায়ুপথে সঙ্গম করা বৈধ নয়। এ সম্পর্কে নাযিল হয়েছে..

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (222)

পটভূমিঃ ইয়াহুদ সমাজে ঋতুবতী নারী সম্পর্কে নানা কুসংস্কারের প্রচলন ছিল। কিছু মানুষ তাদেরকে সম্পূর্ণ আলাদা করে দিত আর কেউ কেউ পায়ুপথে সঙ্গম করত। সাহাবাগণ তাদের করণীয় সম্পর্কে জানতে চাইলে নাযিল হয়..

(হে নবী!) লোকজন ঋতুবতী নারী সম্পর্কে জানতে চায়, বলে দাওঃ এটা বড়ই নোংরা/কষ্টকর (অবস্থা।) সুতরাং স্রাব চলাকালীন সময়ে তোমরা নারী (সঙ্গম) থেকে বিরত থাকবে, (স্রাব থেকে) পবিত্র হওয়া পর্যন্ত (সঙ্গমের জন্য) তাদের কাছে যাবে না। তারা যখন (স্রাব থেকে) উত্তমরূপে পবিত্র হয়ে যাবে তখন তাদের সাথে সঙ্গম করবে আল্লাহর নির্দেশিত পথে (তথা যোনি পথে, পায়ু পথে নয়। আর স্রাব অবস্থায় সঙ্গম করে ফেললে তাওবাহ করবে) নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে পছন্দ করেন যারা তাওবাহ করে, আল্লাহ তাদেরকে পছন্দ করেন যারা পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন করে। (বাক্বারাহঃ ২২২)

আইন ও বিধানঃ ঋতুকালে নারীর যোনি নোংরা থাকে, এ অবস্থায় সঙ্গম করলে নানা রোগের সৃষ্টি হয়। ঋতুবতী নারীর সাথে সঙ্গম করা বৈধ নয়। তবে সঙ্গম ব্যতীত অন্য সব (যেমন চুম্বন, আলিঙ্গন, ইত্যাদি) বৈধ আছে। স্রাব পরিপূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে গেলে (তথা সাদা স্রাব দেখা গেলে) নারী প্রথমে গোসল করবে, এ গোসল নারীর ফরজ দায়িত্ব। গোসলের পর ওই নারীর সাথে সহবাস করা যাবে।
ঋতুবতী নারীর সাথে সহবাস করলে ১ দিনার (৪.২৫ গ্রাম স্বর্ণ বা সমমূল্য) বা আধা দিনার সাদাক্বাহ দিতে হয়। স্বামী-স্ত্রী সহবাসকালে ইচ্ছামত নানা পদ্ধতি গ্রহণ করে আনন্দ করা অবৈধ নয়। তবে সঙ্গম করতে হবে যোনি পথে, পায়ুপথে সঙ্গম করা বৈধ নয়।
হাদীছে বর্ণিত হয়েছে..

فقد أخرج ابن أبي شيبة والترمذي وحسنه، والنسائي، وابن حبان عن ابن عباس قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأته من الدبر "صححه ابن خزيمة في صحيحه.

ইবন আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেনঃ আল্লাহ ওই ব্যক্তির প্রতি (রহমতের দৃষ্টিতে) তাকাবেন না যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে পায়ুপথে সঙ্গম করে। (তিরমিযী, নাসায়ী। ইবনু খুজাইমাহ হাদীছটিকে সাহীহ বলেছেন)

كما في مسند الإمام أحمد، وسنن أبي داود، والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :قال رسول الله ﷺ" ملعون من أتى امرأته في دبرها"

আবু-হুরাইরাহ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেনঃ যে ব্যক্তি পায়ুপথে স্ত্রী সঙ্গম করল সে অভিশপ্ত। (আবু-দাউদ, নাসায়ী, আহমাদ)

কারণঃ ২ বীর্যপাতঃ মানুষ জুনুবী হওয়ার ২য় কারণ হচ্ছে বীর্যপাত অর্থাৎ সঙ্গম ব্যতীত অন্যভাবে বীর্যপাত ঘটলে বা ঘটালে গোসল ফরজ হয়ে যায়। হাদীছে বর্ণিত হয়েছে..

عن أبي سعيدٍ الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسولُ الله ﷺ الماء من الماء. رواه مسلمٌ،

আবু-সাঈদ আল-খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেন "পানি পানির কারণে"। (মুসলিম)
অর্থাৎ পুরুষের লিঙ্গ অথবা নারীর যোনি থেকে যৌবনের পানি বের হলে (তথা বীর্যপাত হলে) পবিত্রতার জন্য পানি ব্যবহার করা (তথা গোসল করা) আবশ্যক হয়।
উল্লেখ্য পুরুষ ও নারীর যৌনাঙ্গ থেকে দুই ধরণের পানি বের হয়। এর একটি হলো যৌনরস, যাকে আরবীতে "মাযী" আর উর্দুতে "মযী" বলা হয়। আর অপরটি হলো যৌবনের পানি বা বীর্য, যাকে আরবীতে "মানী" আর উর্দুতে "মনী" বলা হয়।

মাযী পরিচিতিঃ মাযী বা মযী হচ্ছে যৌনরস যা সঙ্গমকালে নারীপুরুষ উভয়ের যৌনাঙ্গ থেকে অতি সূক্ষ মাত্রায় ধীরে ধীরে বের হয় এবং যোনি পথকে পিচ্ছিল করে রাখে যাতে যৌন মিলন আরো বেশী তৃপ্তিদায়ক ও আনন্দময় হয়। মযীর নির্গমন যৌন উত্তেজনাকে আরো তীব্র করে তুলে এবং দেহ মনে যৌবনের উন্মাদনাকে আরো বাড়িয়ে দেয়।

মানী পরিচিতিঃ মানী বা মনী হচ্ছে নারীপুরুষের বীর্য যা চরম উত্তেজনা শেষে তীব্র বেগে বের হয়। বীর্য বের হওয়ার মাধ্যমে নারী ও পুরুষের যৌন উত্তেজনার সমাপ্তি ঘটে এবং দেহ ক্লান্ত হয়ে পড়ে।

ফিক্বহী বিধানঃ কোনো কারণে দেহে যৌন উত্তেজনা সৃষ্টি হলে নারী ও পুরুষ উভয়েরই মযী বের হয়, মযী বের হলে অযু ভঙ্গ হয়ে যায় তবে গোসল ফরজ হয় না। আর যৌন বিষয়ক কল্পনা, একে অপরকে স্মরণ, বিপরীত লিঙ্গের প্রতি মানষিক আকর্ষণ, হস্তমৈথুন, ইত্যাদি যে কোনো কারণে নারী বা পুরুষের মনী বের হয়ে গেলে তথা বীর্যপাত ঘটলে গোসল ফরজ হয়ে যায়।

বিঃ দ্রঃ= হস্তমৈথুন অবৈধ কাজ এবং এটি একটি বাজে অভ্যাস। হস্তমৈথুন মানব স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর। হস্তমৈথুনের মাধ্যমে পুরুষ তার যৌবন হারায় আর নারী নষ্ট করে তার লাবন্যতা ও যৌবনের তৃপ্তি। সাথে পাপ এবং নানা যৌন রোগতো আছেই। তাই এমন বদ-অভ্যাস থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক।

কারণঃ ৩ হাইদ্ব বা নিফাসের স্রাব বন্ধ হওয়াঃ গোসল ফরজ হওয়ার আরো একটি কারণ হচ্ছে হাইদ্ব বা নিফাস বন্ধ হয়া। মহিলাদের ঋতুস্রাব (হাইদ্ব) অথবা সন্তান প্রসব সংলগ্ন স্রাব (নিফাস) বন্ধ হবার পর পবিত্রতা হাসিলের জন্য গোসল করতে হয় এবং এটাও ফরজ গোসল। এ ব্যাপারে ইরশাদ হচ্ছে..

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (222)

পটভূমিঃ ইয়াহুদ সমাজে ঋতুবতী নারী সম্পর্কে নানা কুসংস্কারের প্রচলন ছিল। কিছু মানুষ তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে আলাদা করে দিত আর কেউ কেউ পায়ুপথে সঙ্গম করত। সাহাবাগণ তাদের করণীয় সম্পর্কে জানতে চাইলে নাযিল হয়..

(হে নবী!) লোকজন ঋতুবতী নারী সম্পর্কে জানতে চায়, বলে দাওঃ এটা বড়ই নোংরা/কষ্টকর (অবস্থা।) সুতরাং স্রাব চলাকালীন সময়ে তোমরা নারী (সঙ্গম) থেকে বিরত থাকবে, (স্রাব থেকে) পবিত্র হওয়া পর্যন্ত (সঙ্গমের জন্য) তাদের কাছে যাবে না। তারা যখন (স্রাব থেকে) উত্তমরূপে পবিত্র হয়ে যাবে তখন তাদের সাথে সঙ্গম করবে আল্লাহর নির্দেশিত পথে (তথা যোনিপথে, পায়ুপথে নয়। আর স্রাব অবস্থায় সঙ্গম করে ফেললে তাওবাহ করবে) নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে পছন্দ করেন যারা তাওবাহ করে, আল্লাহ তাদেরকে পছন্দ করেন যারা পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন করে। (বাক্বারাহঃ ২২২)

গোসল পরিচিতি ও পদ্ধতিঃ পবিত্রতা হাসিলের নিয়তে সমস্ত শরীর ধৌত করার নাম গোসল। গোসলের নির্ধারিত কোনো পদ্ধতি নেই, যে কোনো ভাবে শরীর ধৌত হলেই গোসল আদায় হয়ে যায়। তবে গোসলের সুন্নাহ পদ্ধতি রয়েছে। সুন্নাহ পদ্ধতিতে গোসল করলে অতিরিক্ত ছাওয়াব পাওয়া যায়।

ফিক্বহ বিশ্লেষণঃ হানাফী মতে গোসলে কুল্লি করতে হয় এবং নাকে পানি দিতে হয়, এ ছাড়া গোসল শুদ্ধ হয় না। হানাফী মতে নিয়ত না করলেও গোসল হয়ে যায়। আর অন্য তিন ফিক্বহ মতে গোসলে নিয়ত করা ফরজ। তবে কোনো কোনো ফিক্বহ মতে কুল্লি করা বা নাকে পানি দেওয়া ফরজ নয়।

গোসলের সুন্নাহ পদ্ধতিঃ প্রথমে উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত ধৌত করবে তারপর যৌনাঙ্গ ধৌত করবে তারপর অযু করবে তারপর সমস্ত শরীর ধৌত করবে। বর্ণিত হচ্ছে..

عن عائشة رضي الله عنها :كَانَ رَسولُ اللهِ ﷺ إذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يَأْخُذُ المَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ حتَّى إذَا رَأَى أنْ قَدِ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ.

আ'ইশাহ রা. থেকে বর্ণিত, জানাবতের গোসল করতে গিয়ে রাসূল সা. প্রথমে উভয় হাত (কব্জি পর্যন্ত) ধৌত করতেন, তারপর ডান হাতে পানি ঢেলে বাম হাত দিয়ে ঘষিয়ে লজ্জাস্থান ধৌত করতেন, তারপর সালাতের অযুর মত অযু করতেন, তারপর একহাতে পানি ঢেলে অন্যহাতের আঙ্গুল দিয়ে চুলের গোঁড়ায় পানি পৌঁছাতেন, যখন নিশ্চিত হয়ে যেতেন যে চুলের গোঁড়ায় পানি পৌঁছেগেছে তখন তিনবার মাথায় পানি ঢালতেন, তারপর সমস্ত শরীর ধৌত করতেন, আর সবশেষে উভয় পা ধৌত করতেন। (মুসলিমঃ ৩১৬)

ফিক্বহ বিশ্লেষণঃ ফরজ গোসলকালে মাথার চুল ধৌত করার ব্যাপারে পুরুষ ও নারীর ব্যাপারে বিধানের ভিন্নতা রয়েছে। চুল যেহেতু নারীর সৌন্দর্যের বাহার তাই এ ব্যাপারে নারীকে বিশেষ ছাড় দেওয়া হয়েছে। ফরজ গোসলকালে পুরুষকে মাথার চুল খুলে ধৌত করতে হবে আর নারীগণ ইচ্ছা করলে চুল না ভিজিয়ে শুধু মাথা ধুয়ে নিলেই চলবে। বর্ণিত হচ্ছে..

لأن أم سلمة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت :إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ ؟ قَالَ :لا ، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ . أخرجه الإمام مسلم في صحيحه.

উম্মু সালামাহ রা. একদা রাসূল সা.কে জিজ্ঞেস করলেন, বললেনঃ আমি সাধারণত মাথার চুলকে শক্ত বেনী করে রাখি। জানাবতের গোসলের জন্য কী আমার চুল খুলতে হবে? রাসূল সা. বললেনঃ না.. (তোমার চুলের বেনী খুলতে হবে না। বরং) তুমি তিনবার মাথায় পানি ঢালবে অতঃপর শরীর ধৌত করবে, এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট আর এভাবেই তুমি পবিত্র হয়ে যাবে। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদঃ ২১. তায়াম্মুম

আমাদের উপর আরো একটি ফরজ দায়িত্ব হলো পানি ব্যবহারে সক্ষম না হলে অযু বা গোসলের বদলে তায়াম্মুম করা। মহান আল্লাহ তায়া'লা বলেছেন..

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ

তোমরা যদি অসুস্থ হও অথবা সফরে থাকো আর মলমূত্র ত্যাগ করে (অযুর জন্য) অথবা নারী স্পর্শ করে (তথা সঙ্গম করে গোসলের জন্য) পানি না পাও (অথবা পানি ব্যবহারে সক্ষম না হও) তবে (অযু ও গোসলের বদলে) পবিত্র স্বাঈ'দ (মাটি/বালু/পাথর) দিয়ে তায়াম্মুম করবে তথা মুখমণ্ডল ও হাত মাসেহ করবে। (৫ মা-ইদাহঃ ৬)

তায়াম্মুম করার সুন্নাহ পদ্ধতিঃ তায়াম্মুম দুই পদ্ধতিতে করা যায়। যথা..

১ম পদ্ধতিঃ তায়াম্মুমের নিয়তে মাটিতে একবার হাত স্পর্শ করে ওই হাত দিয়ে মুখমণ্ডল ও দুইহাতের কব্জি পর্যন্ত মাসেহ করবে। এ তায়াম্মুম-ই পবিত্রতা হাসিলের জন্য যথেষ্ট। বর্ণিত হচ্ছে..

وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما **قال :بعثني النبي ﷺ في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة ثم أتيت النبي ﷺ فذكرت ذلك له فقال :إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه** (متفق عليه، واللفظ لـ مسلم.

আ'ম্মার বিন ইয়াসার রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা রাসূল সা. আমাকে কোনো কাজে পাঠালেন, এক পর্যায়ে আমি জুনুবী হয়ে গেলাম আর (গোসল করার জন্য) পানিও খুঁজে পেলাম না। (তায়াম্মুমের ব্যাপারে আমার জানা ছিল কিন্তু তায়াম্মুমের পদ্ধতি জানা ছিল না) তাই আমি স্বাঈদ (মাটি বা বালি)র মধ্যে এমনভাবে গড়াগড়ি খেলাম যেমন গড়াগড়ি খায় দাব্বাহ (পশু/কীট। তারপর সালাত আদায় করলাম) ফিরে এসে আমি রাসূল সা.র কাছে বিস্তারিত বর্ণনা করলাম। তিনি বললেনঃ তোমার জন্য এমন করাই যথেষ্ট হত (এই বলে) তিনি উভয় হাত একবার মাটিতে রাখলেন তারপর একহাত দিয়ে অন্যহাত কব্জি পর্যন্ত মাসেহ করলেন এবং মুখমণ্ডল মাসেহ করলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

২য় পদ্ধতিঃ তায়াম্মুমের নিয়তে মাটিতে হাত স্পর্শ করে এ হাত দিয়ে মুখমণ্ডল মাসেহ করবে, পুনরায় মাটিতে হাত স্পর্শ করে এ দিয়ে দুই হাত কনুই পর্যন্ত মাসেহ করবে। এটা হলো তায়াম্মুমের ২য় পদ্ধতি। বর্ণিত হচ্ছে..

عن ابن عمر رضي الله عنهما **قال :قال رسول الله ﷺ التيمُّم ضربتانِ :ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المِرْفَقينِ؛** رواه الدارقطني

ইবন উমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেনঃ তায়াম্মুম হচ্ছে দুইবার হাত মারা। ১ বার মুখমণ্ডল মাসেহ করার জন্য আর ১ বার দুইহাত কনুই পর্যন্ত মাসেহ করার জন্য।

সূত্রঃ দারকুতনী। হাদীছটি দুইভাবে বর্ণিত হয়েছে। (১) মারফু' সনদে রাসূল সা.র বাণী হিসেবে (২) মাওকুফ সনদে আব্দুল্লাহ বিন উমর রা.র বাণী হিসেবে। মারফু' সনদে হাদীছটি দ্বাইফ, মানে বিধান প্রমাণের জন্য নির্ভরযোগ্য নয়। আর মাওকুফ সনদে (আব্দুল্লাহ বিন উমর রা.র বাণী হিসেবে) সাহীহ।

ফিকহ বিশ্লেষণঃ

- তায়াম্মুমের ২য় পদ্ধতিটি হচ্ছে হানাফী, শাফিয়ী' এবং মালিকী ফিকহের ইমামগণের পছন্দনীয় পদ্ধতি।
- ইমাম আহমাদ রাহিঃ তায়াম্মুমের ১ম পদ্ধতিতে পছন্দ করেছেন এবং বলেছেন এটাই যথেষ্ঠ।
- পানি না পেলে বা পানি ব্যবহারে সক্ষম না হলে অথবা পানি ব্যবহার স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হলে অযু ও গোসলের বদলে তায়াম্মুম করতে হয়।
- মাটি, বালি, পাথর অথবা এসব দিয়ে বানানো বস্তু (ইট, টাইলস, দেয়াল ইত্যাদি) দিয়ে তায়াম্মুম করা যায়।
- অযু ও গোসলের তায়াম্মুম এক-ই রকম হয় এবং একই ভাবে করতে হয়, শুধু নিয়ত ভিন্ন।
- অযু, গোসল ও তায়াম্মুমের মাধ্যমে মানুষের শরীর পবিত্র হয়। আর সালাত আদায়ের জন্য শরীরে জড়ানো পোশাক এবং সালাত আদায়ের স্থানও পবিত্র হতে হয়। এমনকি জুতা বা মোজা পরিধানরত অবস্থায় সালাত আদায় করলে শরীরে লেগে থাকা জুতা এবং মোজাও পবিত্র হতে হয়।

অনুচ্ছেদঃ ২২. প্রাসঙ্গিক আলোচনাঃ নাজাসাত

নাজাসাত পরিচিতিঃ নাজাসাত অর্থ নাপাক, অপবিত্র, নাজাসাত আসলে তাহারাতের বিপরীত শব্দ। ইসলামী রীতি মতে এমন কিছু ইবাদাত রয়েছে যা পালনকালে নিজের শরীর, পোশাক, ইবাদাতের স্থান, ইত্যাদি পবিত্র হতে হয়। যেমন..

- সূরাহ মাইদাহর ৬ষ্ঠ আয়াতে অযু, গোসল ও তায়াম্মুমের কথা বলা হয়েছে
- সূরাহ মুদ্দাচ্ছিরের ৪র্থ আয়াতে কাপড়/পোশাক পবিত্র করার কথা বলা হয়েছে,
- হাদীছে যমীন পাক এবং জোতা পাকের কথা বলা হয়েছে, ইত্যাদি।।

নাজাসাতের প্রকার ভেদঃ নাজাসাত সাধারণত দুই প্রকার হয়ে থাকে। যথা..

- **নাজাসাত হাক্বিক্বী বা আসল নাজাসাতঃ** ইসলামী শারীয়া'হ যে সব বস্তুকে বস্তুগতভাবে নাপাক হিসেবে চিহ্নিত করেছে এসব বস্তু হলো নাজাসাত হাক্বিক্বী বা আসল নাজাসাত। (যেমনঃ পেশাব, পায়খানা)
- **নাজাসাত হুকমীঃ** যে বস্তু আসলে নাজাসাত নয় তবে বিশেষ ইবাদাতের জন্য বিশেষভাবে পাক করে নিতে হয় একে বলা হয় নাজাসাত হুকমী তথা বিধিবদ্ধ অপবিত্রতা। (যেমনঃ জুনুবী মানুষ)

নাজাসাত হাক্বিক্বীর বিধানঃ নাজাসাত হাক্বিক্বী বস্তুটি নিজেও অপবিত্র এবং অন্যকেও অপবিত্র বানায় অর্থাৎ ওই বস্তু যেখানে লাগে সেখানকেও অপবিত্র বানিয়ে ফেলে। এমন কোনো বস্তু যুক্ত শরীর, কাপড় বা স্থান অপবিত্র হিসেবে বিবেচিত হবে। যেমন বর্ণিত হচ্ছে..

عن أبي هريرة أن خولة بنت يسار أتت النبي ﷺ فقالت يا رسول الله؛ إنه ليس لي إلا ثوب واحد، وأنا أحيض فيه، فكيف أصنع؟ قال إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه، فقالت فإن لم يخرج الدم؟ قال :يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره .رواه أبو داود وأحمد، وصححه الألباني.

আবু-হুরাইরাহ রা. থেকে বর্ণিত, একদা খাওলাহ বিনত ইয়াসার রা. নবী সা.'র কাছে এসে বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার একটি মাত্র কাপড় আছে, আমি স্রাব অবস্থায়ও ওই কাপড়ই পরিধান করে থাকি (এবং কাপড়ে প্রায়ই স্রাবের রক্ত গেলে যায়) এখন আমি কী করব? নবী সা. বললেনঃ স্রাব থেকে পবিত্র হওয়ার পর তুমি কাপড়টি ধোয়ে নেবে অতঃপর এ কাপড় পরেই সালাত আদায় করবে। খাওলাহ বললেনঃ রক্তের দাগ যদি না যায়? নবী সা. বললেনঃ রক্ত ধোয়ে ফেলাই যথেষ্ট হবে, রক্তের দাগ কোনো ক্ষতি করবে না। (আবু-দাউদ, আহমদ। হাদীছটি সাহীহ)

নাজাসাত হাক্বিকী যুক্ত বস্তু নিয়ে সালাত শুদ্ধ হবে না। যেমন বর্ণিত হচ্ছে..

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الْقَوْمُ، أَلْقَوْا نِعَالَهُمْ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاتَهُ، قَالَ مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَاءِ نِعَالِكُمْ؟ قَالُوا رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ جِبْرِيلَ ﷺ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا أَوْ قَالَ أَذًى وَقَالَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا.
رواه أحمد في المسند، والحاكم في المستدرك، وأبو داود في السنن
قال عنه الحاكم في المستدرك :هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، ووافقه الذهبي، كما صححه الألباني

আবু-সাঈদ আল-খুদরী রা. বলেনঃ একদা রাসূল সা. (সাহাবাদেরকে নিয়ে) সালাত আদায় করছিলেন (উল্লেখ্য তখনকার দিনে নবী সা. এবং সাহাবাগণ জোতা পায়ে রেখেই মসজিদে স্বালাত আদায় করতেন। স্বালাত রত অবস্থায়ই) হঠাৎ তিনি পায়ের জোতা খুলে বাম পাশে রেখে দিলেন। রাসূল সা.'র কান্ড দেখে অন্যরাও নিজ নিজ জোতা খোলে ফেললেন। সালাত সমাপ্ত করার পর রাসূল সা. জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমরা কেন জোতা খোলে রেখেছো? লোকজন বললঃ আমরা দেখলাম আপনি জোতা খোলে ফেলেছেন তাই আমরাও খুলেছি। রাসূল সা. বললেনঃ জীবরীল আ. এসে আমাকে বললেনঃ আমার জোতার নীচে নাপাকি রয়েছে তাই আমি খুলে ফেলেছি। অতঃপর রাসূল সা. বললেনঃ তোমরা যখন মসজিদে আসবে তখন জোতার তলা দেখে নিবে, তাতে কোনো নাপাকি দেখলে মুছে নেবে এবং এ জোতা পরেই সালাত আদায় করবে। (আহমদ, আবু-দাউদ। হাদীছটি সাহীহ)

উল্লেখ্য জোতা পায়ে মসজিদে যাওয়া এবং জোতা পায়ে সালাত আদায় করা সাহাবাদের সময়ে সাধারণ রীতি ও প্রথা ছিল।

নাজাসাত হাক্বিক্বীযুক্ত বস্তুকে পবিত্র করার বিধানঃ প্রতিটি হাক্বিক্বী নাজাসাতই অপবিত্র এবং এসব নাজাসাত যে বস্তুতে যুক্ত হয় বা মিশ্রিত হয় বা যে বস্তুর সাথে লেগে যায় এসব বস্তুও অপবিত্র হয়ে যায়। এমন সব অপবিত্র বস্তুকে ধোয়ে পবিত্র করতে হয় আর ধোয়া সম্ভব না হলে (যেমন যমীন, কার্পেট, ইত্যাদি) অপবিত্র স্থানে পানি ঢালতে হয় অথবা ঘষে পরিষ্কার করে শুকিয়ে নিতে হয়।

ফিক্বহ বিশ্লেষন; দিরহাম পরিমাণঃ নাজাসাত হাক্বিক্বী আসলে কঠিনতম নাজাসাত, তাই এসব বস্তু থেকে সাবধান থাকা আবশ্যক কিন্তু জীবনের তাকিদে আমাদেরকে এসব নাপাক বস্তুর সংস্পর্শে আসতে হয়, ফলে অনেক সময় এসব থেকে বেচে থাকা কঠিন হয়ে যায়।

ইসলাম যেহেতু মানবতার ধর্ম এবং ইসলামের বিধানগুলো যেহেতু বাস্তবমুখী হয় তাই ফিক্বহী বিধানে এ ব্যাপারেও আমাদেরকে কিছু ছাড় দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি হাক্বিক্বী নাজাসাতই এক দিরহাম পরিমাণ মাফ হয়ে থাকে। অর্থাৎ শরীরে, কাপড়ে বা অন্য কোথাও নাজাসাত লেগে থাকলে এটা যদি দিরহাম পরিমান বা এরচেয়ে কম হয় তবে এটা মাফ হয়ে থাকে, মানে এ বস্তুকে নাপাক হিসেবে ধরা হয় না। আর এরচেয়ে বেশী হলে নাপাক হিসেবে ধরা হয়।

ফিক্বহী কিতাবাদিতে এমন একটি বিধান পাওয়া যায়। তবে এর দলীল খুঁজতে গিয়ে তেমন কিছু পাওয়া যায়নি। দলীল হিসেবে যা পেয়েছি তা আপনাদের সামনে পেশ করা হল..

ومن أهل العلم من قدر ذلك بقدر الدرهم وحجتهم حديث أخرجه الدارقطني في سننه عن روح بن غطيف عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال تعاد الصلاة في قدر الدرهم من الدم وفي لفظ إذا كان في الثوب قدر الدرهم من الدم غسل الثوب وأعيدت الصلاة.
قال البخاري رحمه الله :حديث باطل، وروح هذا منكر الحديث .وقال ابن حبان رحمه الله :هذا حديث موضوع لا شك فيه لم يقله رسول الله ﷺ .ولكن اخترعه أهل الكوفة وكان روح بن غطيف يروي الموضوعات عن الثقات .وذكره ابن الجوزي رحمه الله في الموضوعات

আবু-হুরাইরাহ রা. থেকে বর্ণিত রাসূল সা. বলেছেনঃ (কোনো ব্যক্তি যদি তার শরীরে বা কাপড়ে রক্ত নিয়ে সালাত আদায় করে তবে) রক্ত দিরহাম পরিমাণ হলে সালাত পুনরায় আদায় করতে হবে। (আর দিরহামের চেয়ে কম হলে পুনরায় পড়তে হবে না) অন্য বর্ণনায় এসেছেঃ কাপড়ে যদি দিরহাম পরিমাণ রক্ত লেগে থাকে তবে কাপড় ধৌত করে পুনরায় সালাত আদায় করতে হবে। (দার কুতনী। ইমাম বুখারী বলেছেন হাদীছটি বাতিল। ইমাম ইবনু হিব্বান বলেছেনঃ মাওদ্বু'। তিনি বলেছেন এটা কুফাবাসীর (হানাফীদের) রটনা। ইবনু-ল-জাওযীও হাদীছটিকে মাওদ্বু' বলেছেন।)

আসলে উপরে বর্ণিত হাদীছটি দলীল হবার যোগ্য নয়। তবে মুখতাস্বার আল-ত্বাহাওয়ী এবং কিতাবু-ল-আছার ইত্যাদি কিতাবের ব্যাখ্যাগ্রন্থে লিখা হয়েছেঃ দিরহামের পরিমাণ আসলে (হাদীছ থেকে নয় বরং) কিয়াস থেকে নেওয়া হয়েছে।
আর কিয়াসটি হলঃ পায়খানা করার পর পাথর বা মাটির ঢিলা দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করা যায় বলে হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। আর এমনভাবে পবিত্রতা অর্জন করলে মলদ্বারে অপবিত্রতার প্রলেপ বা চিহ্ন থেকে যায়। আর এ অংশটির আয়তন সাধারণত দিরহাম পরিমাণ হয়ে থাকে। যেমন..

في شرح مختصر الطحاوي للرازي وأما مقدار الدرهم فإنه تقدير لموضع الاستنجاء لأنهم كانوا يستنجون ويستبرؤن فقدروا الموضعين جميعا بالدرهم وهذا اجتهاد قال إبراهيم النخعي أرادوا أن يقولوا مقدار المقعدة فاستفحشوا فقالوا مقدار الدرهم (انتهى .بواسطة حاشية أبي الوفاء الأفغاني على كتاب الآثار لمحمد بن الحسن.(408 \1)

নাজাসাত হুকমীর বিধানঃ নাজাসাত হুকমী নিজে অপবিত্র হলেও অন্যকে অপবিত্র বানায় না অর্থাৎ জুনুবী ব্যক্তি আসল অপবিত্র নয় বরং শুধুই বিধানগত কারণে তাকে অপবিত্র ধরা হয়। তাই তাকে স্পর্শ করলে অন্য কেই বা অন্যকিছু অপবিত্র হবে না। যেমন আল্লাহ তায়া'লা বলেছেন..

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (28)

মুঅমিনগণ! (শোনো! কাফির) মুশরিকরা অবশ্যই অপবিত্র। তাই (তোমরা এমন ব্যবস্থা নেবে) যেন এ বছরের পর তারা আর মাসজিদ হারামের (তথা মক্কার) কাছে আসতে না পারে। আর তোমরা (যদি মনে কর এমন ব্যবস্থা নেওয়ার কারণে তোমাদের পর্যটন ও ব্যবসা-বানিজ্য কমে যাবে এবং এর ফলে তোমরা) অভাব-অনটনে পড়ে যাবে তবে (জেনে রাখো!) আল্লাহ ইচ্ছা করলে নিজ দয়ায় তোমাদেরকে ধনী বানিয়ে দিতে পারেন। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, মহাকৌশলী। (৯ তাওবাহঃ ২৮)

আইন ও বিধানঃ কাফির ও মুশরিকরা আইনগতভাবে এবং নীতিগতভাবে নাজাস তথা অপবিত্র। তাদের জন্য মসজিদু-ল-হারাম তথা মক্কার সীমানায় প্রবেশ করা নিষিদ্ধ এবং তাদেরকে মক্কার সীমানা থেকে ফিরিয়ে রাখা ইসলামী সরকার ও মুসলিম সমাজের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ঈমানী দায়িত্ব।
ফিক্বহ বিশ্লেষণঃ মুশরিকরা নাজাস হলেও তাদের এ নাজাসাত বা অপবিত্রতা শুধুই বিধানগত। তারা নাজাসু-ল-আইন বা নাজাসাত হাক্বিক্বী তথা বস্তুগত নাপাক নয়। তাই কোনো মুশরিকের সাথে করমর্দন অথবা কোনো মুশরিকের স্পর্শ বা ছোঁয়া আপনাকে অপবিত্র বা নাপাক বানাবে না।
জ্ঞাতব্যঃ আজকাল মুসলিম নামধারী অনেক ব্যক্তি বা দেশ দরিদ্রতার ভয়ে কাফির ও কুফরকে প্রশ্রয় দিয়ে থাকেন। আসলে তাদের উচিত ছিল শুধুই আল্লাহর উপর ভরসা করা।

কয়েকটি হাক্বিক্বী নাজাসাতঃ নিম্নে কয়েকটি হাক্বিক্বী নাজাসাতের তালিকা এবং বিধান উল্লেখ করা হল..
নাজাসাতঃ ১. রক্তঃ রক্ত বলে এখানে বুঝানো হয়েছে মানুষ অথবা পশুপাখির শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত রক্ত এবং এসবের মাংসের সাঙ্গে মিশে থাকা রক্ত। জলজ প্রাণী অথবা কীটপতঙ্গের দেহের রস আসলে রক্ত নয়।
রক্ত মুলত একটি অপবিত্র বস্তু তথা নাজাসাত হাক্বিক্বী। রক্ত বস্তুগতভাবে অপবিত্র এবং অন্য বস্তুকেও অপবিত্র করে ফেলে। শরীরে, কাপড়ে বা অন্যকিছুতে রক্ত লাগলে যে অংশে রক্ত লাগবে ওই অংশ অপবিত্র হয়ে যাবে এবং পবিত্রতা হাসিলের জন্য এ রক্ত ধোয়ে পরিষ্কার করতে হবে। তবে মূল রক্ত ধোয়ে ফেলার পর রক্তের দাগ লেগে থাকলে সমস্যা নেই। যেমনটি বলা হয়েছে একটু উপরে খাওলাহ বিনত ইয়াসার বর্ণিত আবু-দাউদ ও আহমদের হাদীছে।

নাজাসাতঃ ২. পেশাবঃ মানুষের পেশাব মুলত অপবিত্র বস্তু তথা নাজাসাত হাক্বিক্বী। এ ব্যাপারে বর্ণিত হচ্ছে..

وعن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله ﷺ استَنْزِهُوا من البول فإنَّ عامَّة عذاب القبر منه . رواه الدَّارقطني.وللحاكم: أكثر عذاب القبر من البول، وهو صحيح الإسناد.

আবু-হুরাইরাহ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেনঃ তোমরা পেশাব থেকে সাবধান থাকবে। কারণ সাধারণত এজন্য কবরে আযাব হয়ে থাকে। (দার কুতনী, হাকিম। হাদীছটি সাহীহ)
উল্লেখ্য হারাম প্রাণীর পেশাবকেও মানুষের পেশাবের মত নাজাসাত হিসেবে ধরা হয়।

প্রাসঙ্গিক বিষয়; পেশাব করার আদবঃ সাধারণত বসে পেশাব করতে হয়। এটা হচ্ছে পেশাব করার আদব। নবী সা. এবং সাহাবাগণ সাধারণত বসেই পেশাব করতেন। বর্ণিত হচ্ছে..

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها **قَالَتْ :مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺبَالَ قَائِمًا فَلَا تُصَدِّقُوهُ، مَا كَانَ يَبُولُ إِلَّا جَالِسًا** .رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا أَبَا دَاوُد، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ :هُوَ أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَصَحُّ.

আ'ইশাহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেনঃ কেও যদি বলে যে নবী সা. দাঁড়িয়ে পেশাব করেছেন তবে তাকে বিশ্বাস করবে না। তিনি কেবল বসেই পেশাব করতেন। (আবু-দাউদ ছাড়া বাকি ৫টি কিতাবে হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে)

তবে প্রয়োজনে দাড়িয়েও পেশাব করা যায়। যেমন বর্ণিত হচ্ছে..

وَعَنْ حُذَيْفَةَ :أَنَّ النَّبِيَّ ﷺانْتَهَى إِلَى سُبَاطَةِ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا، فَتَنَحَّيْتُ، فَقَالَ :ادْنُهْ، فَدَنَوْتُ حَتَّى قُمْتُ عِنْدَ عَقِبَيْهِ، فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ .رَوَاهُ الْجَمَاعَةَ.

হুজাইফাহ রা. থেকে বর্ণিত, নবী সা. একদা আবর্জনা ফেলার জায়গায় গেলেন এবং দাঁড়িয়ে পেশাব করলেন। (আমি পানির পাত্র নিয়ে পিছে পিছে যাচ্ছিলাম। তিনি দাঁড়িয়ে পেশাব করছেন দেখে) আমি একটু পিছনে চলে এলাম। (পেশাব শেষ করার পর) তিনি বললেনঃ কাছে আসো। আমি কাছে এসে উনার দুই গোড়ালির মধ্যখানে দাড়ালাম। (আমি পানি ঢেলে দিলাম) তিনি অযু করলেন এবং উভয় মোজা মাসেহ করলেন। (বুখারী, মুসলিমসহ প্রায় সকল কিতাবেই হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে)

নাজাসাতঃ ৩. পায়খানাঃ মানুষের পায়খানা মুলত হাক্বিক্বী নাজাসাত। পায়খানা করার পর এটাকে পরিষ্কার করার তাগিদ দিয়ে অনেক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে কুরআনেও আয়াত নাযিল হয়েছে। তাই কুরআন ও হাদীছের ইঙ্গিত থেকে এমনই বুঝা যায়।

নাজাসাতঃ ৪. মনি বা বীর্যঃ আসলে বীর্য পবিত্র না অপবিত্র এ ব্যাপারে আল-কুরআনে স্পষ্ট করে কিছু বলা হয়নি, নবী সা.র সুন্নাহ বা হাদীছ থেকেও স্পষ্ট কিছু পাওয়া যায়নি, এমনকি রাসূল সা. কোনো সাহাবাকে বীর্য ধোয়ে পাক করার আদেশ দিয়েছেন বলেও কোনো হাদীছে পাওয়া যায় না। এ ব্যাপারে সাহাবাদের থেকেও কোনো ঐক্যমত্য পাওয়া যায়নি। তাই বিষয়টি নিয়ে ফিক্বহী ইমামদের মাঝে দ্বিমত দেখা যায়।
ইমাম শাফিয়ী' ও ইমাম আহমাদ বীর্যকে পবিত্র বলেছেন। কারণ মহান আল্লাহ তায়া'লা বলেছেন..

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا (54)

আর তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন পানি (বীর্য) থেকে তারপর ঠিক করে দিয়েছেন রক্ত সম্পর্ক ও বৈবাহিক সম্পর্ক, তোমার প্রভু (সর্ববিষয়ে) ক্ষমতাবান। (২৫ ফুরক্বানঃ ৫৪)

বিশ্লেষণঃ এ আয়াতে এবং আরো অনেক আয়াতে বীর্যকে পানি বলা হয়েছে আর পানি সাধারণত পবিত্র বস্তু, তাই বীর্য পবিত্র। এছাড়া আল-কুরআনের কোথায় স্পষ্টভাবে বীর্যকে অপবিত্র বলা হয়নি, এমনকি রাসূল সা. থেকে বর্ণিত নির্ভরযোগ্য কোনো হাদীছেও স্পষ্ট করে বীর্যকে অপবিত্র বলা হয়নি এবং এ ব্যাপারে সাহাবাদের কোনো ইজমা ও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তাই বীর্য অপবিত্র নয়।

আর ইমাম আবু-হানীফাহ ও ইমাম মালিক রাহি. বীর্যকে অপবিত্র বলেছেন। তবে বীর্য লাগানো বস্তুকে পবিত্র করার মাধ্যম নির্ধারনে উনাদের মাঝে আবার দ্বিমত লক্ষ্য করা যায়।
ইমাম মালিকের মতে বীর্য ধোয়ে পাক করতে হবে, ধোয়ে সাফ না করলে বীর্যলাগানো বস্তু বা স্থান পাক হবে না। কারণ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে..

عن عائشة رضي الله عنها قالت :كُنْت أَغْسِلُ الْجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺفَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ وَإِنَّ بُقَعَ الْمَاءِ فِي ثَوْبِهِ (متفق عليه.

আ'ইশাহ রা. বলেনঃ আমি রাসূল সা.'র (কাপড় থেকে) জানাবতের চিহ্ন তথা বীর্য ধোয়ে দিতাম আর তিনি ওই কাপড় নিয়েই সালাতে চলে যেতেন। তখনো উনার কাপড়ে পানি গেলে থাকতো। (বুখারী ও মুসলিম)

আর ইমাম আবু-হানীফাহ রাহিঃর মতে কাপড়ে বা শরীরে তরল বীর্য গেলে থাকলে ধোয়ে পাক করতে হবে কিন্তু বীর্য শুকিয়ে গেলে আর ধোঁয়া লাগবে না বরং রগড়ে নিলেই পাক হয়ে যাবে। কারণ বর্ণিত হয়েছে..

عن عائشة رضي الله عنها قالت :لَقَدْ كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرْكاً، فَيُصَلِّي فِيهِ(مسلم).

আ'ইশাহ রা. বলেনঃ আমি রাসূল সা.'র (কাপড় থেকে) বীর্য ডলে দিতাম আর তিনি ওই কাপড় নিয়েই সালাত আদায় করতেন। (মুসলিম)

নাজাসাতঃ ৫. মাযীঃ মাযী বা মযী অপবিত্র বস্তু। তবে মযী বের হলে গোসল করতে হয় না, শুধু অযু করলেই হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে..

ما رواه أبو داود في سننه **عن سهل بن حنيف قال كنت ألقى من المذي شدة وكنت أكثر من الاغتسال فسألت رسول الله ﷺ عن ذلك فقال إنما يجزئك من ذلك الوضوء قلت يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي منه ؟ قال يكفيك بأن تأخذ كفاً من ماء فتنضح بها ثوبك حيث تُرى أي تظنّ أنه أصابه** ورواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح

সাহাল বিন হানীফ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমার খুব বেশী মযী বের হত এবং এজন্য আমি খুব বেশী গোসল করতাম। একদা এ ব্যাপারে রাসূল সা.কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেনঃ এজন্য অযু করাই যথেষ্ট হবে। আমি বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি কাপড়ে লেগে যায়? তিনি বললেনঃ যেখানে দেখবে বা

লেগেছে বলে মনে করবে একহাতে পানি নিয়ে সেখানে ছিটিয়ে দেবে আর এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে। (তিরমিযী। তিনি বলেছেন হাদীছটি হাসান, সাহীহ)

অনুচ্ছেদঃ ২৩. হাইদ্ব, নিফাস ও ইস্তিহাদ্বা

প্রাপ্ত বয়স্কা নারীর জড়ায়ু থেকে যোনি পথ দিয়ে মাঝে মাঝে রক্ত জাতীয় কিছু পদার্থ বের হয়। এটা আল্লাহ্ প্রদত্ব এক স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। এর মাধ্যমে নারী জড়ায়ু স্বয়ংক্রিয়ভাবে সন্তান ধারণের জন্য প্রস্তুত হয়।
নারীর যোনি পথ দিয়ে বের হওয়া এসব পদার্থ অপবিত্র হয়ে থাকে এবং শারীয়া'হ মতে ওই সময় নারীর জন্য বেশ কিছু কাজ করা নিষিদ্ধ হয়ে যায়। শারীরিক পবিত্রতা আবশ্যক এমন কাজকর্মের বিধান বর্ণনার সুবিধার্থে নারী পথ দিয়ে নির্গত এসব রক্তকে ৩ শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা হয়েছে। যথাঃ হাইদ্ব, নিফাস ও ইস্তিহাদ্বা।

হাইদ্ব পরিচিতিঃ নারী জড়ায়ু থেকে সাধারণত প্রতি মাসে পচা রক্তের মত এক প্রকার পদার্থের স্রাব বের হয়। এমন স্রাবকে আমরা বলি মাসিক স্রাব বা ঋতুস্রাব। আরবীতে এটাকে হাইদ্ব বলা হয় আর ইংরেজিতে বলা হয় ম্যান্স বা পিরিয়ড।

হাইদ্বের আসল রহস্যঃ পুরুষের প্রজনন যন্ত্রসমূহের মাঝে বিশেষ দুটি কোষ রয়েছে, যেগুলোকে অণ্ডকোষ বলা হয়। নারীর প্রজনন যন্ত্রসমূহের মাঝেও বিশেষ দুটি কোষ থাকে। নারীর কোষ দুটিকে বলা হয় ডিম্বকোষ।
পুরুষের অণ্ডকোষ যৌন উত্তেজনার সময় স্বয়ংক্রিয়ভাবে সচল হয় এবং বীর্য তৈরি করে। পুরুষের বীর্যে থাকে হাজার হাজার বীর্যকীট। সহবাসের সময় এ বীর্যকীটগুলো নারী জড়ায়ুতে প্রবেশ করে সেখানে অবস্থান নেয় এবং নারী ডিম্বকে খুঁজতে থাকে। পুরুষের এসব বীর্যকীট ৩/৪দিন পর্যন্ত নারী জড়ায়ুতে জীবিত থাকে।

আর নারীর ডিম্বকোষ দুটি সাধারনত প্রতি মাসের নির্ধারিত সময়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে একবার সচল হয় এবং হাজার হাজার ডিম্বাণু তৈরি করে বিশেষ রগের মাধ্যমে জড়ায়ুতে প্রেরণ করে। এসব ডিম্বাণু সঞ্চালনের সময় অনেক নারীরই পেটে প্রচন্ড ব্যাথা অনুভূত হয়। (উল্লেখ্য এ ব্যাথার কোনো চিকিৎসা নেই। একমাত্র পেইন কিলার ঔষধ সেবন করে এ ব্যাথার যন্ত্রণা থেকে সাময়িক পরিত্রাণ পাওয়া যায়।) নারীর এ ডিম্বাণুগুলো জড়ায়ুতে যাবার পর ৩/৪ দিন জীবিত থাকে।

একজন প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ পুরুষ যেভাবে নারীর প্রতি আসক্ত থাকে ঠিক তদ্রুপ পুরুষের বীর্যকীটও নারী ডিম্বাণুর প্রতি আসক্ত থাকে। তাই যৌন মিলনের পর পুরুষের বীর্যকীট নারী জড়ায়ুতে গিয়ে নারী ডিম্বাণু খুঁজতে থাকে এবং এর সন্ধান পাওয়ামাত্র আবরণ ছেদ করে সোজা ভিতরে ঢুকে যায়। নারীর ডিম্বাণু এবং পুরুষের বীর্যকীটের মিলনেই জড়ায়ুতে তৈরি হয় নতুন মানব ভ্রূণ। আবার এ মানব ভ্রূণকে জড়ায়ুতে সংরক্ষন করার জন্য প্রতি মাসে বেলুনের মত একটা পেকেট তৈরি হয়, কিছু দিন অপেক্ষা করার পর ভ্রূণ তৈরি না হলে এতাও পচে গলে যোনি দিয়ে বের হয়ে আসে। এসব-ই হচ্ছে মহান আল্লাহর এক নিপুণ কারিগরি।
পুরুষের বীর্যকিট না পেলে ৩/৪দিন পর এসব নারী ডিম্বাণু জড়ায়ুতেই মরে এবং পচে যায়।

এছাড়া নারী জড়ায়ু প্রতি মাসে সন্তান ধারণের জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে নতুন করে প্রস্তুত হয়। প্রতি মাসেই জড়ায়ুতে একটি শক্ত আবরণ তৈরি হয় যেন ভ্রূণ তৈরি হলে একে শক্ত করে ধরে রাখা যায় এবং জড়ায়ু ও সন্তানের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। মাস শেষে ভ্রূণ তৈরি না হলে ওই আবরণ ফেটে যায় এবং এর তরল ঝিল্লিসমূহ নষ্ট হয়ে স্রাবের সঙ্গে বের হয়ে আসে।
পরে এক সময় এসব পচা ডিম্বানুসহ আনুসাঙ্গিক আরো কিছু বস্তু স্রাব আকারে যোনিপথ দিয়ে বের হয়ে আসে। এটাকেই আমরা হাইদ্ব বা ঋতুস্রাব বলে থাকি।

হাইদ্বের সময়কালঃ হাইদ্ব বা ঋতুস্রাবের সময়কাল নিয়ে আল-কুরআনে সুস্পষ্ট কোনো বক্তব্য নেই। তাই এ বিষয় সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানার জন্য সঙ্গত কারণেই আমাদেরকে হাদীছ খুঁজতে হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ ব্যাপারে হাদীছের বর্ণনাও সুস্পষ্ট নয়। তাই শারীয়া'হর মূল দুটি উৎসে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট সমাধান না পেয়ে আমাদেরকে ফিক্বহের শরণাপন্ন হতে হয়।
যেহেতু কুরআন/হাদীছে বিষয়টি অকাট্টভাবে বর্ণিত হয়নি। তাই এ নিয়ে ভিন্নমতের সুযোগ তৈরি হয়েছে এবং ফিক্বহী ইমামগণের মাঝে ভিন্ন মতের সৃষ্টি হয়েছে। এ ব্যাপারে সাধারণত ৩টি অভিমত পাওয়া যায়। যেমন..
অভিমতঃ ১. হাইদ্বের সর্বনিম্ন সময় ৩দিন আর সর্বউচ্চ সময় ১০দিন। (এখানে দিন বলে ২৪ঘণ্টার দিন বুঝানো হয়েছে) এ অভিমতটি ইমাম আবু-হানীফাহ এবং উনার শিষ্যদের। যদিও উনার একশিষ্য আবু-ইউসুফ বলেছেন সর্বনিম্ন আড়াই দিনের বেশী সময়

স্রাব হলেই এটাকে হাইদ্ব হিসেবে ধরে নেওয়া হবে। হানাফী মতে উল্লেখিত সময়ের চেয়ে কম বা বেশী হলে এটাকে হাইদ্ব হিসেবে ধরা হবে না বরং ইস্তিহাদ্বা হিসেবে গণ্য করা হবে।

অভিমতঃ ২. হাইদ্বের সর্বনিম্ন সময় নির্ধারিত নেই। সময়মত অতি সামান্য স্রাব হলেও এটাকে হাইদ্ব হিসেবে ধরা হবে। আর হাইদ্বের সর্বউচ্চ সময় ১৫দিন। এ মতটি ইমাম মালিক রাহিঃর। ১৫দিনের বেশী স্রাব হলে অতিরিক্ত স্রাবকে ইস্তিহাদ্বা হিসেবে ধরা হবে।

অভিমতঃ ৩. হাইদ্বের সর্বনিম্ন সময় ১দিন আর সর্বউচ্চ ১৫দিন। ইমাম শাফিয়ী' এবং ইমাম আহমাদ এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। উনাদের মতে ১৫দিনের বেশী স্রাব হলে অতিরিক্ত স্রাবকে ইস্তিহাদ্বা হিসেবে ধরা হবে।

- হাইদ্ব তথা ঋতুস্রাবের সময়কাল নিয়ে ইমামগণের এমন ভিন্নমত আসলে সাহাবী ও তাবিয়ীগণ থেকে পাওয়া বিভিন্ন তথ্যের কারণে তৈরি হয়েছে।
- প্রায় মহিলাদেরই ঋতুস্রাবের একটা নির্ধারিত দিন থাকে। মানে সাধারণত প্রতিবারে এতোদিন স্রাব হয়ে থাকে। ফিক্বহী পরিভাষায় এটাকে বলা হয় স্রাব সম্পর্কে ওই নারীর আদত বা অভ্যাস। যে নারীর যতদিন আদত থাকে ওই নারী এতোদিনই হাইদ্ব ধরবে। মানে ওই নারীর যদি কখনো নির্ধারিত দিনে স্রাব বন্ধ না হয় তবে সে তার অভ্যাসগত দিনই হাইদ্ব হিসেবে ধরবে আর বাকি দিন ইস্তিহাদ্বা হবে।
- তবে অভ্যাস আবার পরিবর্তন হতে পারে এবং অভ্যাসে পরিবর্তন ঘটলে নতুন অভ্যাস ধর্তব্য হবে আর পুরাতন অভ্যাস বাতিল হয়ে যাবে।

ঋতুস্রাবের সময় নির্ধারন নিয়ে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাঃ হাইদ্বের সময় নির্ধারণ খুবই জটিল বিষয়। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানও এ বিষয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট সমাধান দিতে পারেনি। চিকিৎসা বিজ্ঞান মতে এ ব্যাপারে প্রত্যেক নারীই স্বতন্ত্র। এমনকি স্বাস্থ্য ও বয়স অনুপাতে একই মহিলার বিভিন্ন অবস্থা হতে পারে। তবে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান পূরা ঋতু চক্রকে সাধারণত ২৮দিনের একটি চক্র বলে সাব্যস্ত করেছে এবং সাধারনত এ ২৮দিনের মধ্যে নারী জড়ায়ুতে ৩ধরণের পরিবর্তন ঘটে। চিকিৎসা বিজ্ঞান মতে ঋতুচক্র বা মাসিকের এ চক্রের ৩টি স্তর বা ফেজ হয়ে থাকে। যথা..

১. মেন্সট্রুয়াল ফেজঃ এ সময় যোনিপথে রক্ত বের হয়। সাধারণত ৪-৭ দিন স্থায়ী এ রক্তপাতে ভেঙ্গে যাওয়া রক্তকনিকা ছাড়াও জড়ায়ুর ভিতরকার শ্বেত কনিকা, জরায়ুমুখের মিউকাস, জরায়ুর নিঃসৃত আবরণী, ব্যাকটেরিয়া, প্লাজমিন, প্রস্টাগ্লানডিন এবং অনিষিক্ত ডিম্বাণু স্রাব হিসেবে বেরিয়ে আসে। ইস্ট্রোজেন এবং প্রজেস্টেরন হরমোনের যৌথ ক্রিয়ায় এই পর্বটি ঘটে থাকে।

২. প্রলিফারেটিভ ফেজঃ এর সময়কাল ৮-১০ দিন স্থায়ী হতে পারে। শুধু ইস্ট্রোজেন হরমোনের প্রভাবে এমনটি হয়ে থাকে। এ সময় জরায়ু নিষিক্ত ডিম্বাণুকে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুতি নেয়।

৩. সেক্রেটরি ফেজঃ এটি হচ্ছে ঋতুচক্রের সবচেয়ে দীর্ঘ ফেজ, যা প্রায় ১০-১৪ দিন ব্যাপী স্থায়ী হয়। একে প্রজেস্টেরন বা লুটিয়াল ফেজ-ও বলা হয়। এটিও ইস্ট্রোজেন ও প্রজেস্টেরন উভয় হরমোনের যৌথ কারণে হয়। এ সময় নিষিক্ত ডিম্বাণুর বৃদ্ধির জন্য জরায়ু সর্বোচ্চ প্রস্তুতি নিয়ে থাকে। ডিম্বাশয়ের কোনো ডিম্বাণু শুক্রাণু দ্বারা নিষিক্ত না হলে জরায়ু আবার মেন্সট্রুয়াল ফেজ-এ চলে যায়। এভাবেই পূর্ণ বয়স্ক মেয়েদের ঋতুচক্র চলতে থাকে।

নিফাস পরিচিতিঃ উপরের আলোচনা থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে পুরুষের বীর্যকীট আর নারীর ডিম্ব একীভূত হয়ে নারী জড়ায়ুতে তৈরি হয় মানব ভ্রূণ। এ ভ্রূণ ক্রমে ক্রমে মানব শিশুতে রূপান্তরিত হয় এবং এক সময় জড়ায়ু থেকে বেরিয়ে আসে। আর এ বেরিয়ে আসাকে আমরা বলি সন্তান প্রসব।

সন্তান প্রসবের পর মায়ের জড়ায়ু থেকে এক প্রকার স্রাব শুরু হয়। সন্তান প্রসবের পর মায়ের জড়ায়ু থেকে বেরিয়ে আসা স্রাবকে বলা হয় নিফাস।

নিফাসের সময়কালঃ নিফাসের সময়কাল নিয়েও আল-কুরআনে স্পষ্ট করে কিছু বলা হয়নি। হাদীছেও বিষয়টি নিয়ে নির্ধারিত তেমন কোনো বক্তব্য নেই। তাই এ বিষয়টি নিয়েও ভিন্নমতের সুযোগ তৈরি হয়েছে এবং ইমামগণ থেকে ভিন্ন ভিন্ন মত পাওয়াও যায়।

নিফাসের সর্বনিম্ন সময় নির্ধারিত নয়। সন্তান প্রসবের পর যখনই স্রাব বন্ধ হয়ে যাবে তখনই ধরতে হবে যে নিফাস বন্ধ হয়ে গেছে। তবে নিফাসের সর্বউচ্চ সময়কাল নিয়ে ভিন্নমত পাওয়া যায়। যেমন..

ক. হানাফী ও হাম্বলীদের মতে নিফাসের সর্বউচ্চ সময় ৪০দিন। সন্তান জন্মের ৪০দিন পরেও স্রাব বন্ধ না হলে এটাকে নিফাস না ধরে হস্তিহাদ্বা হিসেবে গণ্য করতে হবে। উনাদের দলীল একটি হাদীছ যেখানে বলা হয়েছে..

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَتْ النُّفَسَاءُ تَجْلِسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً .رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ.

উম্মু সালামাহ (নবী সা.র স্ত্রী) বলেছেনঃ নবী সা.র যামানায় নিফাসের সময়ে মহিলারা ৪০দিন অপেক্ষা করতেন। (আবু-দাউদ, তিরমিযী। ইমাম নববী বলেছেন হাদীছটি দ্বাইফ আর আলবানি বলেছেন সাহীহ)

খ. শাফিয়ী ও মালিকীদের মতে নিফাসের সর্বউচ্চ সময় ৬০ দিন।

ইস্তিহাদ্বা পরিচিতিঃ হাইদ্ব ও নিফাস ব্যতীত (নারী যোনি দিয়ে বের হওয়া) অন্য সকল রক্তস্রাবকে ইস্তিহাদ্বা বলা হয়। অর্থাৎ হাইদ্বের মিয়াদ বহির্ভূত স্রাব, নিফাসের মিয়াদ বহির্ভূত স্রাব এবং হাইদ্ব ও নিফাসের সময় ছাড়া অন্য সময়ে সাদা স্রাব ব্যতীত অন্য সকল স্রাবকে ইস্তিহাদ্বা বলা হয়।

হাইদ্ব ও নিফাসের বিধানঃ হাইদ্ব ও নিফাস চলাকালীন সময়ে কয়েকটি কাজ নারীর জন্য নিষিদ্ধ থাকে। যেমন.
নিষিদ্ধঃ ১. সহবাসঃ হাইদ্ব ও নিফাস চলাকালীন সময়ে যৌন মিলন নিষিদ্ধ তাই এদিনগুলোতে স্বামী-স্ত্রী যৌন মিলন থেকে বিরত থাকবে। এ ব্যাপারে বিধান দিয়ে নাযিল হয়েছে..

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (222)

পটভূমিঃ ইয়াহুদ সমাজে ঋতুবতী নারী সম্পর্কে নানা কুসংস্কারের প্রচলন ছিল। কিছু মানুষ তাদেরকে সম্পূর্ণ আলাদা করে দিত আর কেউ কেউ পায়ুপথে সঙ্গম করত। সাহাবাগণ তাদের করণীয় সম্পর্কে জানতে চাইলে নাযিল হয়..

(হে নবী!) লোকজন তোমার কাছে ঋতুবতী নারী সম্পর্কে জানতে চায়, বলে দাওঃ এটা বড়ই নোংরা (অবস্থা।) সুতরাং স্রাব চলাকালীন সময়ে তোমরা নারী (সঙ্গম) থেকে বিরত থাকবে, (স্রাব থেকে) পবিত্র হওয়া পর্যন্ত (সঙ্গমের জন্য) তাদের কাছে যাবে না। তারা যখন (স্রাব থেকে) উত্তমরূপে পবিত্র হয়ে যাবে তখন তাদের সাথে সঙ্গম করবে আল্লাহর নির্দেশিত পথে (তথা যোনিপথে, পায়ুপথে নয়। আর স্রাব অবস্থায় সঙ্গম করে ফেললে তাওবাহ করবে) নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে পছন্দ করেন যারা তাওবাহ করে, আল্লাহ তাদেরকে পছন্দ করেন যারা পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন করে। (বাক্বারাহঃ ২২২)

আইন ও বিধানঃ ঋতুস্রাব চলাকালে যোনি নোংরা থাকে, এ অবস্থায় সঙ্গম করলে নানা রোগ সৃষ্টি হতে পারে। ঋতুবতী নারীর সাথে সঙ্গম করা বৈধ নয়। তবে সঙ্গম ব্যতীত অন্যসব (যেমন চুম্বন, আলিঙ্গন, ইত্যাদি) বৈধ। স্রাব পরিপূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে গেলে (তথা সাদা স্রাব দেখা গেলে) নারী প্রথমে গোসল করবে এবং এ গোসল নারীর ফরজ দায়িত্ব। গোসলের পর ওই নারীর সাথে সহবাস করা যাবে।
ঋতুবতী নারীর সাথে সহবাস করলে ১দিনার (৪.২৫ গ্রাম স্বর্ণ বা সমমূল্য) বা আধা দিনার সাদাক্বাহ দেওয়া উত্তম। স্বামী-স্ত্রী সহবাসকালে ইচ্ছামত নানা পদ্ধতি গ্রহণ করে আনন্দ করা অবৈধ নয়। তবে সঙ্গম করতে হবে যোনিপথে, পায়ুপথে সঙ্গম করা বৈধ নয়।

বিঃ দ্রঃ = আয়াতে শুধু হাইদ্বের কথা বলা হয়েছে। তবে হাদীছর নিফাসের বেলায়ও হাইদ্বের বিধান কার্যকর করার কথা বলা আছে।

পর্যালোচনাঃ এখানে স্বামী সহবাস বলতে শুধুমাত্র যৌন সঙ্গম বুঝানো হয়েছে। সঙ্গম ব্যতীত অন্যসব বৈধ আছে। অর্থাৎ স্ত্রীর যোনিপথ ব্যতীত অন্য সকল অঙ্গ ব্যবহার করে যৌবন উপভোগ করতে পারবে। এ ব্যাপারে বর্ণিত হচ্ছে..

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك : أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ مِنْهُمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا، وَلَمْ يُجَامِعُوهن فِي الْبُيُوتِ، فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺالنَّبِيَّ فَأَنْزَلَ اللَّهُ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ (البقرة 222) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺاصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ، وَفِي لَفْظٍ :إِلَّا الْجِمَاعَ .رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا الْبُخَارِيَّ.

আনাস বিন মালিক রা. বর্ণনা করেন, ইয়াহুদ সমাজের প্রথা ছিলঃ কোনো নারীর হাইদ্ব শুরু হলে তারা ওই নারী সাথে খাবার খেত না, এমনকি একত্রে বসবাসও করত না। সাহাবাগণ এ ব্যাপারে উনাদের করণীয় সম্পর্কে জানতে চাইলে নাযিল হল.. "তারা হাইদ্বরত নারী সম্পর্কে তোমাকে জিজ্ঞেস করবে, বলে দাওঃ এটা এক প্রকার অপরিচ্ছন্নতা/নুংরা অবস্থা। তোমরা এ অবস্থায় নারী সঙ্গম থেকে বিরত থাকবে। (বাক্বারাহঃ ২২২)
এ আয়াত নাযিলের পর নবী সা. ঘোষণা করলেনঃ তোমরা সঙ্গম ছাড়া আর সব করতে পারবে। (বুখারী ছাড়া বাকি অনেকেই হাদীছটি বর্ণনা করেছেন)

বিষয়টিকে আরো স্পষ্ট করে বর্নিত হচ্ছে..

وَعَنْ مَسْرُوقِ بْنِ أَجْدَعَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَرضي الله عنها مَا لِلرَّجُلِ مِن امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا؟ قَالَتْ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْفَرْجَ "رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي "تَارِيخِهِ."

(প্রসিদ্ধ তাবিয়ী') মাসরূক্ব বিন আজদা' রাহি. বলেনঃ একদা আমি (আমার শিক্ষিকা) আ'ইশাহ রা.কে জিজ্ঞেস করলামঃ স্ত্রীর যখন হাইদ্ব হয় তখন স্বামী তার সাথে কী কী করতে পারবে? তিনি বললেনঃ যোনিপথ ব্যবহার ব্যতীত অন্যসব করতে পারবে। (বুখারী ফী তারিখিহী)

وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺأَنَّ النَّبِيَّ ﷺكَانَ إِذَا أَرَادَ مِن الْحَائِضِ شَيْئًا أَلْقَى عَلَى فَرْجِهَا شَيْئًا .رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.

ই'করামাহ রা. নবী সা.র কোনো এক স্ত্রী থেকে বর্ণনা করেছেনঃ নবী সা. যখন হাইদ্বরত স্ত্রীর সঙ্গে কিছু করতে ইচ্ছা করতেন তখন উনার যোনিদ্বারে কোনো (কাপড় বা এ জাতীয়) কিছু রেখে দিতেন (অতঃপর অন্যঅঙ্গ নিয়ে খেলা করতেন) (আবু-দাউদ)

وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ :كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺأَنْ يُبَاشِرَهَا، أَمَرَهَا أَنْ تَأْتَزِرَ بِإِزَارٍ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا "مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

আ'ইশাহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমাদের কারো হাইদ্ব হলে নবী সা. যদি তার সাথে মুবাশারাহ (ঢলাঢলি/ঘষাঘষি/মর্দন) করতে ইচ্ছা করতেন তখন তার হাইদ্বের নির্গমন স্থানে কোনো কাপড় রেখে দিতে বলতেন এবং (এ ছাড়া অন্যত্র) মুবাশারাহ (ঢলাঢলি/ঘষাঘষি/মর্দন) করতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

হুঁশিয়ারিঃ তবে সাবধান! কখনো স্ত্রীর পায়ুপথে লিঙ্গ প্রবেশ করাবে না। এমন করা সর্বাবস্থায়ই নিষিদ্ধ। যে কথা বলা হয়েছে সূরাহ বাক্বারাহর ২২তম আয়াতে। হাদীছে বর্ণিত হয়েছে..

عن أبي هريرة رضي الله عنه **قال: قال رسول الله** صلى الله عليه وسلم **ملعون من أتى امرأة في دبرها** .رواه أحمد وأبو داود وهو حديث حسن.

আবু-হুরাইরাহ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেনঃ যে ব্যক্তি পায়ুপথে নারী সঙ্গম করল সে অভিশপ্ত। (আহমাদ, আবু-দাউদ। হাদীছটি হাসান)

নিষিদ্ধঃ ২. স্বালাতঃ শারীয়া'হ আইনে হাইদ্ব ও নিফাস চলাকালীন সময়ে মহিলাদের সালাত মাফ করে দেওয়া হয়েছে। তাই এ সময়ে তারা স্বালাত আদায় করবে না এবং এ স্বালাত পরেও পূর্ণ করতে হবে না। এ সম্পর্কে বিধান দিয়ে বর্ণিত হয়েছে..

وقوله صلى الله عليه وسلم **فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي.** متفق عليه واللفظ للبخاري.

(হাইদ্ব অবস্থার বিধান দিতে গিয়ে) রাসূল সা. বলেছেনঃ যখন হাইদ্ব আসবে তখন স্বালাত ছেড়ে দেবে আর হাইদ্ব বন্ধ হয়ে গেলে গোসল করে সালাত আদায় করবে। (বুখারী ও মুসলিম)

ফিক্বহ বিশ্লেষণঃ হাইদ্ব বা মাসিক স্রাব শুরু হয়েছি কি না? এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার জন্য অনেক মহিলা যোনিপথে আঙ্গুল ঢুকিয়ে পরীক্ষা করেন, অনেকে টিসু জাতীয় অন্যবস্তু ঢুকিয়ে পরীক্ষা করে থাকেন। আসলে এমন করার কোনো প্রয়োজন নেই। বরং যখন পরিধেয় পেন্টিতে বা প্যাডে স্রাবের রক্ত লেগে থাকবে তখন থেকেই হাইদ্ব গণনা শুরু হবে। এমনকি যে নারী রাতে পবিত্র অবস্থায় ঘুমিয়েছে আর সকালে ঘুম থেকে উঠে প্যাডে রক্ত দেখেছে উনি যখন রক্ত দেখেছে তখন থেকেই হাইদ্ব গণনা শুরু হবে। এটাই বিধান। (এ ব্যাপারে আরো বিস্তারিত জানতে "শারহ বিক্বায়াহ দেখে নিন।)

عن **عَائِشَةَ** رضي الله عنها **:كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة** .رواه مسلم

আইশা'হ রা. থেকে বর্ণিত, (রাসূল সা.র সময়ে হাইদ্ব ও নিফাস অবস্থায় আমরা স্বালাত আদায় করতাম না এবং সাওম পালন করতাম না।) আমাদেরকে আদেশ দেওয়া হয়েছিল যেন সাওমের কাযা আদায় করি তবে স্বালাতের কাযা আদায় করতে আমাদেরকে আদেশ করা হয়নি। (মুসলিম)

عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم **أليس اذا حاضت المرأة لم تصل و لم تصم ؟** (متفق عليه في حديث طويل)

আবু-সাঈদ আল-খুদরী রা. থেকে বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদীছে রাসূল সা. বলেছেনঃ মেয়েদের যখন স্রাব হয় তখন কী তারা সালাত ও সাওম ছেড়ে দেয় না? (বুখারী ও মুসলিম)

নিষিদ্ধঃ ৩. সাওমঃ হাইদ্ব ও নিফাস চলাকালীন সময়ে মহিলারা সাওম সাধন করবে না তথা রোজা রাখবে না। তবে হাইদ্ব বা নিফাস বন্ধ হওয়ার পর ছুটে যাওয়া এসব সিয়াম বা রোজা পূরা করতে হবে। দলীল স্বরূপ উপরে উল্লেখিত দুটি হাদীছ দেখে নিন।

নিষিদ্ধঃ ৪. তাওয়াফঃ হাইদ্ব বা নিফাস অবস্থায় তাওয়াফ করা যাবে কী না? আল-কুরআনে এ ব্যাপারে স্পষ্ট করে কিছু বলা হয়নি। তবে হাদীছে বর্ণিত হয়েছে..

روى البخاري (305)ومسلم (1211)عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها **أنها لما حاضت قبيل دخول مكة في حجة الوداع قال لها النبي ﷺافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي**

বিদায় হাজ্জের সফরে মাক্কাহ প্রবেশের আগেই আ'ইশাহ রা.র ঋতুস্রাব শুরু হলে রাসূল সা. বলেছেন "অন্য হাজীগণ যা করে তুমিও তাই করবে। তবে (স্রাব থেকে) পবিত্র হওয়া পর্যন্ত তাওয়াফ করবে না। (বুখারীঃ ৩০৫, মুসলিমঃ ১২১১)

হাজ্জের সময়ে যদি কোনো মহিলার হাইদ্ব শুরু হয় তখন উনি তাওয়াফ থেকে বিরত থাকবে এবং হাইদ্ব থেকে পবিত্র হওয়ার পর ইফাদ্বাহ (হাজ্জের ফরজ) তাওয়াফ করে হাজ্জ সম্পন্ন করবে। এ ব্যাপারে বর্ণিত হচ্ছে..

وروى البخاري (4401)ومسلم (1211)عن عَائِشَةَ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيّ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺحَاضَتْ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَحَابِسَتُنَا هِيَ ؟ فَقُلْتُ :إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺفَلْتَنْفِرْ

আইশাহ রা. থেকে বর্ণিত, বিদায় হাজ্জের সময়ে (এক পর্যায়ে) নবী সা.র স্ত্রী স্বাফিয়্যাহ বিনত হু'ইয়াই রা.র হাইদ্ব শুরু হয়ে গেল (নবী সা. ভাবলেন স্বাফিয়্যাহ ইফাদ্বাহ করেননি তাই) তিনি বললেনঃ তবে কী সে আমাদের জন্য (মদীনার পথে যাত্রা

(থেকে) বাঁধা হয়ে দাঁড়াবে? আমি বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে ইফাদ্বাহ (হাজ্জের ফরজ) তাওয়াফ করে ফেলেছে। তখন নবী সা. বললেনঃ সে যেনো (মদীনার পথে ফিরতি সফরে) বেরিয়ে পড়ে। (বুখারীঃ ৪৪০১, মুসলিমঃ ১২১১)

ফিক্বহ বিশ্লেষণঃ উল্লেখিত বিধান হচ্ছে হাজ্জের সময়ের সাভাবিক বিধান। স্বাভাবিক অবস্থায় এবং সাধারণ সময়ে সবাইকে এ বিধান মেনে চলতে হবে। তবে একান্ত নিরোপায় ব্যক্তি পবিত্রতা ব্যতীত তাওয়াফ করে নিলে তার হাজ্জ সম্পন্ন হয়ে যাবে এবং এ তাওয়াফ আদায় হয়ে যাবে। যেমন..

কোন মহিলা হাজ্জ করতে গিয়েছেন। মিনার দিনে তার ঋতু স্রাব শুরু হল। এখন তিনি দেখলেন স্রাব বন্ধ হবার আগেই তার কাফেলা ফিরে যাবে। তিনি একা থাকতে পারবেন না এবং থাকার কোনো সুযোগও নেই। আর একবার ফিরে গেলে পুনরায় এসে তাওয়াফ করাও তার জন্য খুবই কঠিন কাজ। এমত অবস্থায় ওই মহিলা ফরজ তাওয়াফ করে নেবেন এবং ওয়াজিব তাওয়াফ তার থেকে রহিত হয়ে যাবে। এজন্য তাকে কোনো প্রকার দিয়াত বা জরিমানাও দিতে হবে না। কারণঃ ইসলামী শারীয়া'হর বিধানসমূহের একটি মূল সূত্র হচ্ছে..

আল্লাহ সাধ্যের বাইরে কারো উপর দায় চাপান না (বাক্বারাহঃ ৮৬)	**لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا**

হাইদ্ব ও নিফাস অবস্থায় কুরআন পাঠের বিধানঃ হাইদ্ব ও নিফাস অবস্থায় নারীদের জন্য কুরআন পাঠ নিষিদ্ধ বলে কোনো বিধান আল-কুরআনে উল্লেখ করা হয়নি। এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট বর্ননার নির্ভরযোগ্য কোনো হাদীছও পাওয়া যায় না। তাই বিষয়টি নিয়ে ভিন্নমতের সুযোগ তৈরি হয়েছে এবং ভিন্নমত পাওয়াও যায়। যেমন..

ক. অনুমোদিতঃ কিছু কিছু ইমামগণের মতে হাইদ্ব ও নিফাস অবস্থায় নারীরা কুরআন তিলাওয়াত করতে পারবে। যেমন..

وذهب بعض أهل العلم إلى جواز قراءة الحائض للقرآن وهو مذهب مالك، ورواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية ورجحه الشوكاني.

কোনো কোনো আলিমের মতে হাইদ্ব অবস্থায় কুরআন পাঠ করা যাবে। এটা ইমাম মালিকের মযহাব, ইমাম আহমদ থেকেও এমন একটি অভিমত পাওয়া যায়। শাইখু-ল-ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ এ মতটিকে পছন্দ করেছেন এবং ইমাম শাওকানী এ মতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

وعند الحنابلة يباح للحائض أن تقرأ ما دون الآية القصيرة، أو قدره من الآية الطويلة ولها أن تأتي بذكر يوافق لفظ القرآن، كقولها عند ركوب الدابة أو السيارة "سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين."

হাম্বলীদের মতে হাইদ্ব অবস্থায় কুরআনকে ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়তে পারবে। যেমন ছোট বা বড় আয়াতকে ভেঙ্গে ভেঙ্গে অথবা যিকর (তাসবীহ, দোয়া) হিসেবে পড়তে পারবে।

খ. নিষিদ্ধঃ অনেক ইমাম ও আলিমের অভিমত হচ্ছে; হাইদ্ব বা নিফাস অবস্থায় বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত কুরআন পড়বে না। যেমন..

وعند الحنفية يحرم على الحائض قراءة القرآن إلا إذا كانت معلمة، فإنه يجوز لها أن تلقن تلميذاتها كلمة كلمة .بحيث تفصل بينهما، كذلك يجوز لها أن تقرأ الآية القصيرة بقصد الدعاء، أو الثناء على الله.

হানাফীদের মতে হাইদ্ব অবস্থায় কুরআন পাঠ করা নিষিদ্ধ। তবে শিক্ষিকা নারী তার শিষ্যদেরকে শব্দ শব্দ করে বলে দিতে পারবে। এ ভাবেই দোয়ার জন্য অথবা তাসবীহ হিসেবে ছোট ছোট আয়াত পড়তে পারবে।

أما الشافعية فيقولون :يحرم على الحائض قراءة القرآن ولو حرفًا واحدًا إن قصدت تلاوته أما إذا قصدت الذكر مثل أن تقول عند الأكل "بسم الله الرحمن الرحيم "أو جري لسانها بالقرآن من غير قصد لتلاوته فلا يحرم.

শাফিয়ীদের মতে হাইদ্ব অবস্থায় কুরআন পাঠ করা নিষিদ্ধ। এমনকি তিলাওয়াতের জন্য অক্ষর অক্ষর করেও পড়বে না। তবে যিকর বা দোয়া হিসেবে পড়তে পারবে এবং তিলাওয়াতের ইচ্ছা ব্যতীত মুখ দিয়ে কুরআনের আয়াত বের হয়ে এলেও কোনো সমস্যা নেই। (সূত্রঃ উল্লেখিত অভিমতগুলো "ইসলাম অনলাইন" থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে)

যারা হাইদ্ব বা নিফাস অবস্থায় কুরআন পড়তে নিষেধ করেন উনাদের কেউ কেউ দলীল হিসেবে আবু-দাউদে বর্ণিত একটি হাদীছ পেশ করে থাকেন। বর্ণিত হচ্ছে..

عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي ﷺأنه قال :لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن وهذا الحديث ضعيف عند أهل العلم، لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين، وروايته عنهم ضعيفة.

ইবনু উ'মার রা. থেকে বর্ণিত, নবী সা. বলেছেনঃ হাইদ্ব ওয়ালী নারী এবং জুনুবী ব্যক্তি কুরআন থেকে সামান্য কিছুও পাঠ করবে না। (আসলে হাদীছটি দ্বাইফ। তাই কোনো বিধান প্রমাণের জন্য দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়)

ইস্তিহাদ্বার বিধানঃ ইস্তিহাদ্বা আসলে একটি অসুস্থতা বা রোগ। তাই ইস্তিহাদ্বা অবস্থায় মহিলারা সালাত আদায় করবে, সাওম পালন করবে, স্বামী সহবাস করতে পারবে, কুরআন তিলাওয়াত করতে পারবে, তাওয়াফ করতে পারবে তথা পবিত্র অবস্থায় যা যা করা যায় ইস্তিহাদ্বা অবস্থায় এ সকল কাজ করা যাবে।
তবে এ অবস্থায় যেহেতু যৌনিপথ দিয়ে রক্তস্রাব বের হয় তাই অযু নষ্ট হয়ে যায় আর এ স্রাবকে চলমান রোগ এবং "হাদাছ আসগর" তথা ছোট অপবিত্রতা হিসেবে ধরা হয়। তাই এজন্য গোসল ফরজ হয় না, শুধু অযু নষ্ট হয়ে যায়। এ অবস্থায় পবিত্রতা হাসিলের বিধান কয়েকভাবে হতে পারে..

বিধানঃ ১. প্রত্যেক ফরজ সালাতের জন্য অযুঃ ইস্তিহাদ্বা অবস্থায় ওই মহিলা প্রত্যেক ফরজ সালাতের জন্য অযু করবে এবং এক অযু দিয়েই ওই ওয়াক্তের মধ্যে (সুন্নত ও নফল সালাত, তিলাওয়াতসহ) অন্যান্য ইবাদাত সম্পাদন করতে পারবে। এমন বিধান দিয়ে বর্ণিত হচ্ছে..

عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عن النَّبِيِّ ﷺقَالَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ :تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَتَصُومُ وَتُصَلِّي . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ :حديثٌ حَسَنٌ.

আ'দী বিন ছাবিত উনার বাবা থেকে এবং বাবা দাদা থেকে বর্ণনা করেন, (হাইদ্বের সাথে) ইস্তিহাদ্বারত নারী সম্পর্কে নবী সা. বলেছেনঃ সে তার হাইদ্বের দিনগুলোতে সালাত ছেড়ে দেবে। অতঃপর গোসল করবে এবং প্রত্যেক (ফরজ) সালাতের সময়ে অযু করবে। এভাবেই সে সালাত আদায় করবে এবং সাওম পালন করবে। (আবু-দাউদ, ইবনু মাজা, তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী বলেছেনঃ হাদীছটি হাসান।)

وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ :جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ :إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ لَهَا :لَا، اجْتَنِبِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ مَحِيضِكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ ثُمَّ صَلِّي وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ.

আ'ইশাহ রা. বলেনঃ একদা ফাতিমাহ বিনত আবু-হুবাইশ নবী সা.র কাছে এসে বললঃ আমার স্রাব চলমান থাকে, আমি পবিত্র হতে পারি না। আমি কী সালাত ছেড়ে দেবো? নবী সা. বললেনঃ না, তুমি তোমার হাইদ্বের দিনগুলোতে সালাত ছেড়ে দেবে। অতঃপর গোসল করবে এবং প্রত্যেক সালাতের জন্য অযু করবে। এভাবেই তুমি সালাত আদায় করবে যদিও রক্তের ফোটা তোমার ছাটাইয়ে প্রবাহিত হয়। (আহমাদ, ইবনু মাজা)

বিধানঃ ২. একত্রে দুই সালাতঃ ইস্তিহাদ্বারত অবস্থায় মহিলা দুই সালাত (জোহর ও আসর এবং মাগরিব ও ইশা) একত্র করে আদায় করবে। এমন বিধান দিয়ে নাযিল হয়েছে..

عن حَمْنَة بنت جَحش رضي الله عنها قالت كنت أُسْتَحَاض حَيْضَة كثيرة شَدِيدة فأتيت رسول اللهﷺ أَسْتَفْتِيه وأُخْبِرُه فَوجدْتُه في بيت أختي زينب بنت جَحش فقلت :يا رسول الله إني امرأة أُسْتَحَاض حَيْضَة كثيرة شديدة، فما تَرى فيها قد مَنَعَتْنِي الصلاة والصوم فقال :أَنْعَتُ لك الكُرْسُف فإنه يُذهِبُ الدَّم .قالت هو أكثر من ذلك قال فاتَّخِذِي ثوبا .فقالت :هو أكثر من ذلك إنما أَثُجُّ ثَجًّا قال رسول اللهﷺ سَآمُرُك بأمْرَين أيهما فَعَلْتِ أجْزَأ عَنْكِ من الآخر، وإن قَوِيتِ عليهما فأنتِ أعْلَم .قال لها :إنما هذه رَكْضَةٌ من رَكَضَات الشيطان فَتَحَيَّضِي ستَّة أيام أو سبعة أيَّام في عِلْم الله ثم اغْتَسِلِي حتى إذا رأيت أنك قد طَهُرْتِ واسْتَنْقَأْتِ فصلِّي ثلاثا وعشرين ليلة أو أربعا وعشرين ليلة وأيامها وصومي، فإن ذلك يُجْزِيكِ وكذلك فافْعَلِي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يَطْهُرْن مِيقَاتُ حَيْضِهِنَّ وَطُهْرِهِنَّ وإن قَوِيت على أن تُؤَخِّري الظهر وتُعَجِّلِي العصر فَتَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بين الصلاتين الظهر والعصر وتُؤَخِّرين المغرب وتُعَجِّلين العشاء ثم تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بين الصلاتين فافْعَلِي وَتَغْتَسِلِينَ مع الفجر فافْعَلِي وصُومي إن قَدِرت على ذلك، قال رسول اللهﷺ وهذا أَعْجَبُ الْأَمْرَيْنِ إليَّ . حسن- رواه أبو داود وأحمد والترمذي وابن ماجه

(রাসূল সা.র শালিকা) হা'মনাহ বিনত জাহাশ রা. বলেনঃ একদা আমার খুব বেশী পরিমাণে স্রাব শুরু হল। আমি ফতোয়া জিজ্ঞেস করতে রাসূল সা.র কাছে এলাম। আমার বোন যাইনাব বিনত জাহাশের ঘরেই রাসূল সা.কে পেয়ে গেলাম। আমি বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার খুব অধিক পরিমাণে ইস্তিহাদ্বা শুরু হয়েছে এবং এতে আমার সালাত ও সিয়ামে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হচ্ছে। এ ব্যাপারে আপনি কী বলেন?
রাসূল সা. বললেনঃ "কুরসুফ" (তূলা/প্যাড) ব্যবহার কর। এটা রক্ত চুষে নেবে।
আমি বললামঃ (এতে কাজ হবে না) এটা এরচেয়ে অনেক বেশী।
তিনি বললেনঃ তবে (এর উপর) আলাদা কাপড় ব্যবহার কর।
আমি বললামঃ এটা এরচেয়ে অনেক বেশী। অধিকহারে প্রবাহিত হচ্ছে।
তিনি বলেনঃ আমি তোমাকে দুটি কথা বলছি (তথা দুটি পদ্ধতি বাতলে দিচ্ছি।) এর যেকোনো একটি পালন করাই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে। তুমি যদি উভয়টি করতে সক্ষম হও তবে যেকোনো একটি বেছে নেবে। আসলে এটা (হাইদ্ব নয় বরং) সাধারণত শয়তানের আঘাতের ফলে এমনটি হয়ে থাকে। (এ ব্যাপারে হাইদ্ব ও ইস্তিহাদ্বা নির্ধারনের বিধান হল) তুমি প্রতি মাসে ৬দিন অথবা ৭দিন হাইদ্ব গণ্য করবে (আসলে আল্লাহই ভালো জানেন তোমার হাইদ্ব কত দিন) অতঃপর যখন মনে করবে (তোমার গণ্য করা হাইদ্বের দিন শেষ হয়ে গেছে এবং) তুমি (হাইদ্ব থেকে) পাক হয়ে গেছো তখন গোসল করে পবিত্র হয়ে

যাবে। এভাবেই মাসে ২৩/২৪দিন সালাত আদায় করবে, সাওম পালন করবে। প্রতি মাসেই এমন করবে। যেভাবে মহিলাদের হাইদ্ব হয় এবং পবিত্র হয় তুমিও তাই করবে।

আর (ইস্তিহাদ্বা অবস্থায় পবিত্রতা অর্জনের প্রথম পদ্ধতি হচ্ছেঃ তুমি প্রত্যেক সালাতের জন্য অযু করবে) এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে।

আর (ইস্তিহাদ্বা অবস্থায় পবিত্রতা অর্জনের ২য় পদ্ধতি হল) যদি পারো তবে জোহরকে দেরী করে আর আসরকে এগিয়ে এনে একবার গোসল করে জোহর ও আসর দুই সালাত একত্রে আদায় করবে। এভাবেই মাগরিবকে দেরী করে আর ইশাকে এগিয়ে এনে একবার গোসল করবে মাগরিব ও ইশা দুই সালাত একত্রে আদায় করবে। আর ফজরের জন্য আলাদা গোসল করবে। আমি মনে করিঃ উল্লেখিত দুটি পদ্ধতির মাঝে এটাই তোমার জন্য উত্তম হবে। আর যথারীতি সিয়াম পালন করবে। (আবু-দাউদ, আহমাদ, তিরমিযী, ইবনু মাজা)

স্রাব চলাকালীন সময়ের জন্য স্বাস্থ্যগত কয়েকটি উপদেশঃ

১. আসলে রক্তস্রাব একটি নুংরা বিষয় বা কষ্টদায়ক বিষয়।

২. হাইদ্ব ও নিফাস অবস্থায় অনেকের মন মানসিকতা খিটখিটে থাকে। অনেকের পেটে ব্যথাসহ নানা উপসর্গ দেখা দেয়।

৩. তাই এমতাবস্থায় শরীরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রেখে সুগন্ধি ব্যবহার করে উত্তম পোশাক পরিধান করে একটু সাজগোজ করা ভালো। এ সময়ে সুগন্ধি ব্যবহারের কথা হাদিছে বর্ণিত হয়েছে।

৪. স্রাবের সময় যোনিপথ, যোনিমুখ ও যোনিদ্বারে নুংরা রক্ত লেগে থাকে এবং এর থেকে নানা রোগব্যাধির সম্ভাবনা থাকে। তাই স্রাবের রক্ত এবং রক্ত লেগে থাকা অংশ এ্যন্টিসেপ্টিক দিয়ে উত্তমরূপে পরিষ্কার কথা উচিত। কারণ এসব নুংরা রক্ত থেকে নানা ধরণের ব্যক্টেরিয়া তৈরি হয় এবং এসবের প্রভাবে নানা প্রকার যৌনরোগ, চর্মরোগ, ইত্যাদি হয়ে থাকে।

৫. স্রাবের চলাকালীন সময়ে কোনো প্রকার সেন্যাটারী প্যাড ব্যবহার করা উচিত।

৬. যাদের প্যাড ব্যবহার করার সাধ্য নেই এবং যারা পুরাতন কাপড় ব্যবহার করেন তাদের উচিত স্রাবের সময় ব্যবহৃত কাপড়কে সাবান বা ডিটারজেন দিয়ে ধোয়ে উত্তমরূপে পরিষ্কার করা এবং ধোয়ার পর ডেটল, স্যাভলন বা কোনো প্রকার এ্যন্টিসেপ্টিক মিশ্রিত পানিতে ভিজিয়ে উত্তমরূপে শুকিয়ে পুনরায় ব্যবহার করা। ব্যবহৃত কাপড় ধোয়ে আবদ্ধ স্থানে বা সেতসেতা জায়গায় রেখে দিলে এতে ব্যক্টেরিয়া তৈরি হয় এবং এসব কাপড় পুনরায় ব্যবহার করলে রোগব্যাধি বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

৭. বালিগাহ মেয়েদের জন্য সব সময় পেন্টি পরিধান করা উত্তম এবং বিবাহিতা নারীদের জন্য এটা মুস্তাহাব বলে শারহি বিক্বায়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।